বারিদ বরণ ঘোষ সম্পাদিত

সমকালীন সাহিত্যে

বঙ্গ ভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ভারতের প্রথম ঐক্যবিধায়ক জনজাগরণ। নামে 'বঙ্গ' হলেও এটি প্রধানত ছিল পূর্বভারতকে জড়িয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ার সংগ্রাম। কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ছাত্র, তাঁতি, মজুর — সমাজের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিককে স্পর্শ করে এমন আন্দোলন ভারতে আগে হয়নি। শতবর্ষপূর্বে সংঘটিত সেই শিহরন পুনশ্চ অনুভূত হবে এই মহাসংগ্রহে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংগঠিত এই আন্দোলনে যে আবেগ ও মনন, উচ্ছ্বাস ও সমালোচনা, মৃত্যুপণ এবং জীবন গঠনের মতো বৈপরীত্য দেখা গিয়েছিল— তার লিখিত দলিলগুলি এখানে পরম যত্নে সংকলিত। দুষ্প্রাপ্য নানা নথি, যা সাহিত্যের সমস্ত শাখাকে — প্রবন্ধ- গল্প- উপন্যাস- নাটক-গান-কবিতাকে আশ্রয় করেছিল— তার দুর্লভতম আর শ্রমনিষ্ঠ এই সঞ্চয়নে আছে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় পরিচিতি এবং দুর্লভ চিত্রাবলি। বাঙালি শত বছর আগের বিন্দুতে ফিরে গিয়ে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করার স্বাদ এখানে পাবেন। শতবর্ষপূর্বে নির্মিত এই বঙ্গদর্শনটি বাঙালির সামনে স্বচ্ছাকারে উপস্থাপিত করেছেন কৃতবিদ্য সম্পাদক অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ।



সমকালীন সাহিত্যে
বঙ্গভঙ্গ

সমকালীন সাহিত্যে

বঙ্গভঙ্গ

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ



পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

SAMAKALIN SAHITYE BANGA BHANGA

Collection of the Contemporary literature
effected by the Partition of Bengal

Edited by
Barid Baran Ghosh

First Published
Book Fair, 2005

Price
Rs. 300/- Only.

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০৫

ISBN 81-7332-488-X

দাম
৩০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন,
ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

শ্রীশিলাদিত্য সিংহরায়
প্রীতিভাজনেষু

সূচিপত্র

ভূমিকা

শুরুতেই সলতে পাকানোর জন্য একটু অনুমতি চাইছি। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সুচতুর ইংরেজ সরকার এই 'ভাঙো আর শাসন করো' — 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসিটা মাথায় নিয়ে ঘুরছিল। আগে সেই কথাটা ছোট্ট করে বলি — তাতে বোঝা যাবে এর জট কত পুরনো।

১৮৬৮ সালে স্যার স্ট্যানফোর্ড নর্থকোট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন বঙ্গপ্রদেশ একটা অতিকায় ব্যাপার। একজন ছোটোলাটের পক্ষে তাকে শাসন করা দুরূহ। অতএব দাও আসামকে বাংলা থেকে হটিয়ে। দেওয়া হলও তাই। ১৮৭৪-এ আসামকে ছিঁড়ে নিয়ে এক আলাদা চিফ কমিশনারের হেফাজতে তুলে দেওয়া হল। নবগঠিত আসাম প্রদেশে সিলেট, কাছাড় আর গোয়ালপাড়া — তিন বঙ্গভাষাভাষী জেলাকে জুড়ে দেওয়া হল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সেই সূচনা ইংরেজ-কসাইয়ের।

বেশ চলছিল। আবার তার মাথার পোকা নড়ে উঠল। বাঙালিরা বড্ড বেড়ে উঠছে। দাও ওদের ডানা ছেঁটে। ১৯০৫-এর কসাইদের পাণ্ডার নাম কার্জন, গৌরব করে লোকে বলে লর্ড কার্জন। কিন্তু ১৯০১ সালেই তিনি কলকাঠি নাড়া শুরু করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব দিলেন উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ (তখন উড়িষ্যা-বাংলা এক ছিল) থেকে কেটে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে জোড় লাগাও। এ হল দ্বিতীয় ধাপ। তবে কার্যকরী হল না। দেশের লোকে কিন্তু সতর্ক হয়ে গেলেন। বিশেষ করে ১৯০২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে লর্ড চার্লস ন্যাথানিয়েল কার্জন যখন সমাবর্তন ভাষণে ছাত্রদের সাংবাদিকতা নেওয়ার আগে সতর্ক করে ভাষণ দিলেন, তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলো প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

আসলে তিনি বাঙালির নাড়ি টিপে দেখতে চাইছিলেন, তাঁরা কতখানি স্পর্শকাতর। সরলাদেবী চৌধুরানির উদ্যোগে বীরাষ্টমী, প্রতাপাদিত্য উৎসবে বাঙালি যে জাগছে তা বুঝতে পারছে ইংরেজ। তবুও কষ্টিপাথরে যাচাই করার জন্যে অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৩ সালে বাংলার ছোটোলাট হয়ে বঙ্গবিভাগের এক দীর্ঘ পরিকল্পনা ছকে বসলেন। তারই ভিত্তিতে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর হোম সেক্রেটারি হার্বার্ট রিজলে স্বাক্ষরিত বঙ্গ- ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবটি পেশ করা হল। ইলাহাবাদের 'Pioneer' পত্রিকাই প্রথম এর আভাস দিল। শুরু হল তুমুল বিক্ষোভ। কাগজে কাগজে প্রতিবাদ আর সভায় সভায় প্রতিরোধ। দেখেশুনে ভারতসচিব ব্রডরিখ্‌কে লিখলেন, 'বাঙালিরা নিজেদের একটা মহা জাতি বলে মনে করছে... তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে কোনও দিনই আর বাংলা ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না।' উনি বললে কি হবে, ঢাকা ময়মনসিংহ চট্টগ্রামের লোকজন একেবারে উন্মত্ত — দু মাসের মধ্যে ৫০০ প্রতিবাদ সভা হল। দেখেশুনে কার্জন গেলেন পূর্ববঙ্গে। সেখানে গিয়ে সুকৌশলে বঙ্গভঙ্গের কথা তুললেন। কিন্তু হতাশ হতে হল তাঁকে। এ দিকে কলকাতার টাউন হলে ১৮ মার্চ ১৯০৪ তারিখে এক অভিনব প্রতিবাদ সভা হল। সঞ্জীবনী লিখলেন, 'এমন সভা কেহ কখনও দেখে নাই।' টাউন হলের দোতলায় লোক সঙ্কুলান না হওয়ায় একই সঙ্গে একতলাতেই প্রতিবাদ সভা হল। একই সময়ে একই সভা এমন দুভাগে অনুষ্ঠিত হওয়া — লোকে কস্মিনকালেও শোনেনি, দেখেনি। কার্জন অবশ্য পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে যাতে হিন্দু-মুসলমানেরা এক হয়ে প্রতিবাদ করতে না পারেন সে জন্যে এক জঘন্য কৌশল নিয়ে বসেছিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে খুঁজে পেলেন এক পরম বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আর তাঁকে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউন্ড ঋণ দিয়ে এই মিল ভাঙার কাজটি করার ভার দিলেন।

এ দিকে ২৯ এপ্রিল ১৯০৪ তারিখে ক্ল্যাসিক থিয়েটারে 'প্রতাপাদিত্য' উৎসবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করে বসলেন সরলা দেবী। বেঙ্গলি কাগজে তার বিজ্ঞপ্তিও বের হল। ১৬ জুন ১৯০৪ তারিখে প্রকাশিত হল সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' (১৯১০-এ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে)। বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে ভারত সচিবকে রাজি করার জন্যে কার্জন ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে আবার স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করলেন, 'সত্যের আদর্শ প্রাচ্যে সম্মানিত হওয়ার অনেক আগেই পাশ্চাত্যে সম্মানিত হয়েছিল' — এমন হীনতর মন্তব্য করে। আবার প্রতিবাদের ঝড়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৪ তারিখে প্রকাশিত হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাগজ 'সন্ধ্যা'। অর্থাৎ ১৯০৫-এর সেই ভয়ংকর ঘোষণার আগে থেকেই ১৯০৩-৪ জুড়ে বাদ এবং প্রতিবাদের জমিনটা বেশ ভাল করেই আবাদ করা হয়ে গিয়েছিল। এই যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি কথা, ১৯০৫-এর মহা আন্দোলনের কথা আমরা সেই কবে থেকে শুনে এসেছি তা কি কেবল দু তরফের কিছু বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ছিল — না, দেশের সব ধরনের মানুষ এতে শামিল হয়েছিলেন। মিরজাফরদের কথাও বাদ যাবে কেন? তারাও তো আন্দোলন আর প্রতিবাদকে আরও বেগবান করে তুলেছিল। আমরা লক্ষ করেছি, দেশের সর্বস্তরের মানুষ কীভাবে এই আন্দোলনের শামিল হয়েছিলেন — বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, কৃষক, গাড়িচালক, তন্তুবায়, শিল্পীসংঘ, গায়ক, নট-নাট্যকার, ঘরের বধূ-মেয়েরা — সবাই। মনে আছে আমাদের অপ্রতুল যানবাহন যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা, প্রচারের ন্যূনতা, সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং পাঠকের সংখ্যার কথা — কতজনই বা শিক্ষিত তখন। বেতার নেই। তবুও এক জাগরণ — বাংলা এবং বাংলার বাইরে ভারতের সর্বত্র।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ বয়েছিল দুটি বিশিষ্ট ধারায়। ১৯০৫-এর অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাকে ভাগ করা নিয়ে আর কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। তিনিই তো এই আন্দোলনের হোতা ও অধ্বর্যু। ১৯০৫-এর অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ঠিক আগে কী ঘটেছে তার একটা দফাওয়ারি হিসেব নিয়ে নেওয়াটা বুঝি উচিত হবে।

কানাঘুষো চলছিলই। স্যার হেনরি কটন ছিলেন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পরম বিরোধী, ৫ এপ্রিল ১৯০৪-এর 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করে লিখলেন। পরে একাধিক সভায় সভাপতিত্ব করে ভারতীয় মনোভাবকে সমর্থন করেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরে বম্বে কংগ্রেসে তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হল। ৬ জুলাই ১৯০৫-এ ঘোষিত হল, ভারতসচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করেছেন। ৭ জুলাই সিমলা থেকে খবর এল — আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও দার্জিলিং ছাড়া সমস্ত রাজশাহি বিভাগ একত্রে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামে যে নতুন প্রদেশ হবে তার শাসনভার থাকবে একজন পৃথক ছোটোলাটের ওপর। নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা।

স্বভাবতই প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সঞ্জীবনী লিখল, 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালির চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালি শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। সমস্ত বাঙালি বিদেশি দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে' ইত্যাদি। অর্থাৎ বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল। ১৯ জুলাই, অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করল সরকার। ২০ জুলাই সঞ্জীবনী 'প্রতিজ্ঞাপত্র' প্রকাশ করে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের পুরো আহ্বান জানাল পুনশ্চ। জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, মাগুরা, বগুড়া, যশোহর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, রামপুরহাট — সর্বত্র সমস্ত সভায় বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হল। ৭ অগস্ট টাউন হলের দিকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে জনপ্রবাহ ধাবিত হল — সার্বজনিক সেই প্রথম 'বন্দেমাতরম্'-এর উচ্চারণ। ৭ অগস্ট কলকাতায় পালিত হল অঘোষিত হরতাল এবং টাউন হলের দুতলা ও বাইরে জুড়ে তিনটি সভা। এর মধ্যে ২ সেপ্টেম্বরের কাগজে সরকার ঘোষণা করে দিলে কার্জনের সেই বিচ্ছেদকারী আদেশ — ১৬ অক্টোবর কার্যকর হবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ; নতুন প্রদেশের নাম হবে ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম; ব্যামফিল্ড ফুলার হবেন নতুন প্রদেশের ছোটোলাট; নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহি,

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও আসাম। বাংলা হারাল ১৫টি জেলা। ৯০ লক্ষ মুসলমানসহ তার জনসংখ্যা এখন দাঁড়াল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াল ৩ কোটি ১০ লক্ষ, তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। কার্জন সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন। এরই বিরুদ্ধে উচ্চারিত হল ছাত্র সমাজের চার প্রতিজ্ঞা। ছাত্রদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তা জানাব। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১০ অক্টোবর ছাত্রদলের জন্যে জারি হল কার্লাইল সার্কুলার। গড়ে উঠল অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি ৪ নভেম্বর ১৯০৫-এ। ততদিনে অঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী হয়ে গেল।

কিন্তু এরই মধ্যে ২৬ অগস্ট ঢাকায় হয়েছে বিরাট জনসভা। ২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়া তিথিতে 'স্বদেশ-বন্দনা' হল। ভাইফোঁটা আসন্ন। মেয়েদের কাছে আবেদন জানানো হয় সহযোগিতার। ২৯ সেপ্টেম্বর ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড লাইব্রেরির সদস্যরা দরজায় দরজায় ঘুরে ন্যাশনাল ফান্ডের জন্য টাকা তুলতে লাগলেন — দীনতম ভিখারিও ভিক্ষার পয়সা ঝুলিতে তুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন, রাখিবন্ধনের প্রথম প্রস্তাব রাখলেন। 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন' (এটিই সঠিক কথা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি প্রচলিত শব্দবন্ধ মাত্র) তাতেই ভিন্নতর মাত্রা পেল।

তখনও ১৬ অক্টোবর এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামেগঞ্জে। সুদূর মুর্শিদাবাদের জেমোগ্রামের মেয়েরা ১৬ অক্টোবর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন — সংখ্যায় প্রায় ৫০০ হবে — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মা চন্দ্রকামিনী দেবীর আহ্বানে তাঁদের বাড়ির বিষ্ণুমন্দিরের উঠোনে সমবেত হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আহ্বানে এখানে বঙ্গবাসী অরন্ধন ব্রত পালন করেছিলেন। ব্রতধারিণী নারীরা উপস্থিত হলে রামেন্দ্রসুন্দরের ছোট মেয়ে গিরিজাদেবী রামেন্দ্রসুন্দরের সদ্য সদ্য লেখা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (*পৌষ ১৩১২ বঙ্গদর্শন — নব পর্যায়ে প্রথম মুদ্রিত*) পড়ে শোনান। এর প্রাসঙ্গিকতা এখনও হারিয়ে যায়নি।

রাখিবন্ধনের সেই দিনটি

শ্রাবণী একাদশীতে যার সূচনা, আর পূর্ণিমায় সমাপ্তি তারই নাম কৃষ্ণের ঝুলনবাসর। এই সদ্ভাবকে রক্ষাবন্ধন মন্ত্রে করা হয় আরব্ধ। একে অন্যের মণিবন্ধে পরিয়ে দেয় রক্ষাসূত্র। হরিদ্রা-রঞ্জিত মাঙ্গল্যসূত্রে ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধবের মধুর সম্পর্কে পড়ে গ্রন্থি। রাজপুতানায় এমনি করেই আগমন ঘটে রাখিবন্ধ ভাইয়ের। রানি কর্ণাবতী হুমায়ুন বাদশাকে রাখি পাঠিয়ে দিয়ে দেশের সম্মান বাঁচিয়েছিলেন, হুমায়ুন স্বীকার করে নিয়েছিলেন সে অসম ভ্রাতৃত্ব।

একশোতম বছর আগে এই রাখির সুতো এক নতুনতর তাৎপর্য নিয়ে বাঙালির জীবনে দেখা দিয়েছিল। সে দিন না ছিল ঝুলনোৎসব, না ছিল পূর্ণিমা। ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সোমবার ছিল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথি। তিরিশে আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দ। এ দিনেই বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী হয়েছিল। অক্টোবরে শুরুতেই এর বিরুদ্ধে জনমত একেবারে তুঙ্গে উঠেছিল। পুজো এসে গেছে। বন্দেমাতরম্ ভিক্ষু সম্প্রদায় পুজোর তিনদিন ভিক্ষে করে ৭৫৭ টাকা তুললেন। মাতৃপুজোর সঙ্গে দেশমাতৃকার পুজোয় জনসাধারণ শামিল।

অনেক আগে থেকেই দিনটি উদ্‌যাপনে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। অগস্ট মাসে মহিলার জবানিতে ব্রতধারণ প্রবন্ধে তিনি বিলিতি দ্রব্য বর্জনকে নীতিগতভাবে সমর্থন করেছিলেন। স্বদেশি গান লিখেছেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' — ৭ অগস্ট টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় গানটি গীত হল। ১ সেপ্টেম্বর সিমলা থেকে ঘোষণা করা হল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের। ৩ সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ারের সভায় ঠিক হল পাদুকা-চাদর বর্জন করে বাঙালি তিনদিন জাতীয় শোক পালন করবে। গিরিডি বাসকালে গান লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলার চারণকবির ভূমিকা নিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরির সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন রাখিবন্ধনের প্রস্তাব — রচিত হল বিখ্যাত রাখিসংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'বিজয়া সম্মিলন' প্রবন্ধ আরও একগুচ্ছ গানের সঙ্গে।

১৫ অক্টোবরের সকাল থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটা চাপা উত্তেজনা। উদ্‌যাপিত হবে অরন্ধন। মেয়েরা দেশবিদেশ থেকে কবিকে রাখি পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ঘোষণা

করেছিলেন, 'আগামি ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহার বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় পর পর তিনটি চিঠি পাঠালেন ভারতের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু। স্বাগত জানালেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও। রাখিবন্ধন, অরন্ধন ছাড়া আরও দুটি কার্যক্রম গৃহীত হল — একটি মিলন মন্দির ও একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হবে। দোকান-পসার বন্ধ রাখার আবেদনও করা হয়েছিল (মাড়োয়ারি সম্প্রদায় সাড়া দেননি)। কলকাতার গোরুর গাড়ির হিন্দুস্থানি মালিকেরা কিছু জানতেন না। তাঁদের কাছে গেলেন নিবারণচন্দ্র দত্ত ও চারুচন্দ্র মিত্র। তাঁরা সব কথা শুনে ৩০ আশ্বিন গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে সম্মত হলেন। প্রস্তুত রাখা হল লক্ষাধিক রাখিসূত্র। ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর বাতলে দিলেন রাখিবন্ধনের বিধি।

ক্রমে তিরিশে আশ্বিনের সূর্য পূর্ব গগনে উদ্ভাসিত হল স্বদেশের নবরাগে রঞ্জিত হয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশভাগী অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'-তে এ দিনের কথা সুন্দর করে লিখেছেন : "ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব — রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। কী বিপদ আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি — রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম — যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল —

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

এই গানটি সে সময়ে তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল — সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখি, সবাই এ ওর হাতে রাখি পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখি পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখি পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ...রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব।" অবনীন্দ্রনাথ চলে এলেও সুরেন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিৎপুরের মৌলবি ও সাধারণ মুসলমানদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন — ওঁরা হেসে গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও গান লিখেছিলেন। 'দ্বিজেন্দ্রলাল'-এর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর বই থেকে গান লেখার ইতিহাসটি তুলে দিই :

'সেদিন সকালবেলায় সাড়ে নয় কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে 'কুন্তলীনের' '' হেমেন্দ্র বসু' (এইচ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া 'ব্যস্তসমস্ত' ভাবে তাঁহাকে বলিলেন — "আজ বিকালে গোলদিঘিতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্যে একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই — ছাপতে হবে।" বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য রকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ উহা 'কুন্তলীন' প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে এ দিন বিকেলে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। এ দিনে গোলদিঘির সভাতে ব্রাহ্মপ্রচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

মিছিল এগিয়ে চলেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। নানা শ্রেণির, নানা বয়সের হিন্দু-মুসলমান সেখানে উপস্থিত — এমনকি সাহেবেরাও। পুরুষ এবং মহিলারা। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গঙ্গার ঢেউয়ে অজস্র কম্পন। উন্মাদ-করা গান গাইতে গাইতে কতজন কেঁদে অস্থির। ললিতকুমার সরকার নামে একটি ছেলের দুঃখদায়ক স্বদেশি গান শুনে সেন্ট্রাল কলেজের রাশভারী অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু পর্যন্ত কাঁদতে লাগলেন। সকলেই নগ্নপদ। স্নান সেরে উঠে এসে অন্যকে রাখি পরাচ্ছেন। মুখে তাদের বন্ধনমন্ত্র 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।'

এবার মিছিল এগিয়ে চলল বিডন স্কোয়ার আর সেন্ট্রাল কলেজের দিকে। অবশ্য সারা পথেই চলে এই রাখি পরানো। পঞ্চাশ হাজার লোকের মিছিল। সার্কুলার রোড ধরে মিছিল পৌঁছল সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনন্দমোহন বসুকে সভাপতি করা হল। গণদাবি মেনে ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে সভাস্থলে নিয়ে আসা হল একটি আরামকেদারায় শুইয়ে। এমন সভায় মৃত্যুও যে বরণীয় — মনে হল আনন্দমোহনের। অর্ধ লক্ষ কণ্ঠ তাঁকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে স্বাগত জানাল — 'রোগশীর্ণ মুখে বিদ্যুতের জ্যোতি' উঠল ফুটে। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন — অমনি পুনশ্চ উঠল গগনপ্লাবী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। আনন্দমোহন রচিত ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনালেন ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী।

Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us. পরমুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠে এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করে শোনালেন, 'যেহেতু বাঙালি জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, যেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিবে এবং বাঙালি জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালি জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহা সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।'

আনন্দমোহনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। তারপর সেই পঞ্চাশ হাজার মানুষ নগ্নপদে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির উচ্চারণ করতে করতে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির দিকে শোভাযাত্রা করে এগোতে লাগলেন। পথে যোগ দিলেন আরও ৫০ হাজার মানুষ। সারাক্ষণ শোভাযাত্রায় উপস্থিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সহস্রকণ্ঠে গীত হয়ে চলেছে তাঁর নবরচিত গান 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে...', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'...।

পশুপতিবাবুর বাড়ির সামনে সমবেত সাধারণকে 'এক অখণ্ড বঙ্গ রাজ্যের অধিবাসিগণ, হিন্দু ও মুসলমান প্রিয় সুহৃদ্‌গণ' সম্ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাখলেন তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ। বললেন, 'বন্ধুগণ, আবার বলুন, হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে আবার বলুন, আমরা সকলে আমাদের চিরপ্রিয়, চির গরীয়সী জননী জন্মভূমি এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান।' রাখিবন্ধনের এই ইতিবৃত্ত স্মরণ করে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী পরামর্শ দিয়েছিলেন —

সেদিন স্মরণ করে
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে
ঘরে পরে সমাদরে করহ প্রেরণ — সুপবিত্র স্নেহ সূত্র — রাখীর বন্ধন।

কবিতা লিখলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখও।

আগের সভার শেষে সভাপতি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তার নীচে একটি কাচের আধারে প্রচলিত মুদ্রা এবং ইন্ডিয়ন মিরর, বেঙ্গলি, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, টেলিগ্রাফ, ইন্ডিয়ান নেশন, নিউ ইন্ডিয়া, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী পত্রিকা রক্ষিত হয়েছিল। এর পরেই শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় — কার্লাইল সার্কুলার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে।

সংঘ-সমিতির ভূমিকা : এই আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে বেশ কয়েকটি সংঘ গড়ে ওঠে। যেমন বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়, অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি, স্বদেশবান্ধব সমিতি, গায়কদল প্রভৃতি স্বদেশি দল। এদের ভূমিকাও ছিল খুব উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মতো কলকাতায় গান গেয়ে ভিক্ষা সংগ্রহকারী একদল স্বদেশি 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় গঠন করেন। এর সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনজন সহ-সভাপতি — রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস এবং দিঘাপতিয়ার শরৎকুমার রায়; কোষাধ্যক্ষ, অমৃতলাল মিত্র এবং দুই যুগ্ম-সম্পাদক নন্দকিশোর মিত্র ও হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,/তোমার গান গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।' গানটি এঁদের দেখাদেখি শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত একটি বৈতালিক দল রোজ সকালে গান গেয়ে জাতীয় তহবিলের জন্য টাকা তুলতে লেগেছিলেন। রাস্তার পানওয়ালা, ফেরিওয়ালারা যখন ভিক্ষে দিতেন — রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন — তাঁদের বড়ো ভালো লাগত। গিরিডিতেও এমন স্বদেশি ভিক্ষুর দল গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পরে এই National Fund ইংরেজি নামটি বদলে 'বঙ্গ ভাণ্ডার' নামের প্রস্তাব রাখেন। ওই বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ১২১/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে এঁদের কার্যালয় ছিল। এঁদের দেখাদেখি ভবানীপুর ও কালীঘাটের তরুণেরা গড়ে তোলেন 'সন্তান সম্প্রদায়'। 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় যে গান গাইতেন, এক সময়ে তাঁদের গানের রেকর্ড বের করেছিলেন কুন্তলীন-খ্যাত এইচ বসু। এর অনেকগুলি গান লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। এইচ বোসের রেকর্ডের তালিকা থেকে সিদ্ধার্থ ঘোষ এর উল্লেখ করেছেন —

'বন্দেমাতরম্। Sung by the well-known Bande Mataram Sampradaya of Calcutta. National Song composed by Pandit Kaliprasanna Kabyabisarad'.

১। দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে।
২। ভাই সব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে।
৩। নবীন এ অনুরাগ রেখ রেখ মনে রেখ।
৪। আমরা স্বদেশবাসী যতই দোষী।
৫। আমার যায় যাবে জীবন চলে

And many others.

এই 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় সাদা পোশাকে ভিক্ষা সংগ্রহ করতেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে। ২১ জানুয়ারি ১৯০৬ অবধি তাঁরা পাঁচ হাজার ছশো সাতানব্বই টাকা পাঁচ আনা নয় পাই পরিমাণ টাকা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। ৪ মার্চ তাঁরা চলে এসেছিলেন বেলুড় মঠ এবং তার পাশাপাশি অঞ্চলে। এঁরাই ১০ জুন তারিখে গান গাইতে গাইতে দশহরার স্নান করতে যান গঙ্গার প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাটে — সামনে নিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি, সঙ্গে চলেছেন হাজার তিরিশেক লোক — সে এক লোমহর্ষক উদ্দীপক দৃশ্য!

বরিশালে গড়ে উঠেছিল স্বদেশবান্ধব সমিতি — অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এর সভাপতি। ডা. নিশিকান্ত বসু যেচে এর প্রচারপদ গ্রহণ করেন। পরে এর দুজন মুসলমান ও একজন হিন্দু প্রচারক নিযুক্ত হন। হাটেবাজারে যাতে বিলিতি জিনিস বিক্রি না হয়, বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের মতো এঁরাও তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। প্রায় ৮০টি গ্রামে এর শাখা বিস্তারিত হয়। প্রত্যেকটিতে গড়ে ৫০জন করে স্বেচ্ছাসেবক থাকতেন। একবার জনৈক গ্রামবাসী এঁদের একজনকে জিগ্যেস করেন, 'বাবু, আমাদের বাড়িতে একটা বিলাতি আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কেটে ফেলবো কি?' প্রসঙ্গত এ সময়ে ঝালকাঠি বন্দরের ব্যবসায়ীরা টাকা প্রতি আধ পয়সা 'বন্দেমাতরম্ বৃত্তি' দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনকে বেশ কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

এমনি করেই গড়ে উঠেছিল সেবক সম্প্রদায় এবং অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি। যে কোনও বড়ো আন্দোলনের শরিক থাকে সেই দেশের ছাত্রদল। তাদের দলন দমন করার জন্যে অতএব ব্রিটিশ সরকার ১০ অক্টোবর কুখ্যাত ও গোপন কার্লাইল সার্কুলার জারি করে তাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়। ২২ অক্টোবর স্টেটসম্যান-এ এর ধারাগুলি প্রকাশিত হয়। এরই প্রতিবাদে ৪ঠা নভেম্বর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও জাপান-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায়ের উদ্যোগে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। এর আগে ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ডন সোসাইটি। ছাত্ররা পিকেটিং করে বড়োবাজারে বিলিতি জিনিস বিক্রি বন্ধ করছে — পুলিশ দিয়ে তাদের উপর নির্যাতন ঘটানো হল। ছেলেরাও বড়োবাজার থানার ইন্সপেক্টর ক্যারলকে প্রহার করতে ছাড়েনি। পুলিশ নানা জায়গায় স্বদেশি করার অপরাধে ছাত্রদের অর্থদণ্ড করতে থাকে, বের করেও দেয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী দরকার হলে ছাত্রদের এক বছরের জন্যে পড়াশুনা বন্ধ রাখতে আহ্বান জানালেন। অনেক পি আর এস ও এম এ পরীক্ষার্থী আহ্বানে সাড়া দিয়ে পড়া বন্ধ রাখলেন। অতএব 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রচুর টাকা সংগৃহীত হতে থাকল। অনেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' বলতে লাগলেন। কতকগুলি ছেলে একখানি কাগজে মোটা মোটা করে "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে" লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে টাঙিয়ে দিয়ে এলেন।

ছাত্রদলনের চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে ৮ নভেম্বর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার পর। মার খেয়েও সদস্য ছাত্ররা 'বন্দেমাতরম্' বলতে ছাড়ে না দেখে বরিশালে ছাত্ররা গেয়ে উঠেছিল।

মাগো, যায় যাবে জীবন চলে।
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্ বলে।
মোদের বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমরা কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?

লাল টুপি আর কালো কোর্তা
জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমরা মায়ের সেবায় রইব রত
ওরা পাশব বলে দিক জেলে।

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হল ১৯০৬-এর এপ্রিলে। সেই উপলক্ষে কলকাতা থেকে নেতৃবৃন্দ গেছেন। সমস্ত শহর, স্টিমার ঘাট, সভামঞ্চ নিত্য 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির ভীমনাদে পূরিত। ১৫ এপ্রিল ইংরেজের পুলিশ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। রজনীকান্ত গুহ, কৃষ্ণকুমার মিত্র কাউকে লাঠি মারতে তারা ইতস্তত করল না। সবচেয়ে প্রহার করল তারা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ছেলে চিত্তরঞ্জনকে। মারতে মারতে পুলিশ তাকে পাশের নর্দমায় এবং পরে একটা পুকুরে ফেলে দেয়। তখনও চিত্তরঞ্জন বুক-জলে দাঁড়িয়ে বলছেন 'বন্দেমাতরম্'। মৃতপ্রায় অবস্থায় এক কনস্টেবল তাকে তুলে ধরে। অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয় পুলিশ কমিশনার কেম্প সাহেব। তিনিও সামলাতে না পেরে চাপে পড়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে বাধ্য হলেন! সে এক অভিনব দৃশ্য। তাতেই অবশ্য অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়। এই অত্যাচারের একটি ছবি প্রবাসী পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদেশের দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এইরকম সভাসমিতি গড়ে ওঠে। তিলকের মতো সর্বভারতীয় নেতারা এই আন্দোলনকে অনেকখানি বেগবান করে তুলেছিলেন। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী এবং আর্যসমাজের কর্মী টহলরামের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

সাধারণ মানুষের ভূমিকা

এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন, তাতে একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের মধ্যে কি কোনও সাড়া জেগেছিল? এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সবশ্রেণির সাধারণ মানুষ কখনওই পুরোপুরি এগিয়ে আসেননি — আসা সম্ভবও ছিল না। সেই রকম রাজনৈতিক শিক্ষায় তখনও দেশের সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠেননি।

তবুও যেটুকু তথ্য পেয়েছি তাতে বুঝতে পেরেছি সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা সাড়া অবশ্যই জেগেছিল। না হলে প্রতিটি সভায় এত মানুষ উপস্থিত হতেন কীভাবে?

মহালয়ায় কালীঘাট মন্দিরে ৫০ হাজার, টাউন হলের সভাগুলোতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম একটা স্বতঃস্ফূর্ততার আবশ্যিক লক্ষণ ছিল। ১৭ অক্টোবর ১৯০৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে জেনেছি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিনে ছেলেরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন — তাঁরা বাজারে মাছ আনবেন না। মুচিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা সাহেবের জুতো পর্যন্ত সারিয়ে দেবেন না। প্রায় ১১ হাজার গাড়োয়ান এদিন গাড়ি বন্ধ রেখেছিলেন। ১২টি পাটকল, একটি বন্দুক তৈরির কারখানা, একটি গালার কারখানা এবং প্রায় ৭০টি ধানকল এ দিন বন্ধ ছিল। সারা বাংলার সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এমনকি সরকারি বন্দুক কারখানার শ্রমিকেরা বাইরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনেই কাজ বন্ধ করে বাইরে চলে আসেন। সর্বত্র পালিত হয়েছে অরন্ধন — বাঙালির অন্দরমহলে যে ঢেউ পৌঁছে গেছে। সাধারণ মানুষ শোভাযাত্রার শামিল হয়েছেন স্বেচ্ছায় — সঙ্গে নিয়ে গেছেন খোল-করতাল। দেশীয় ক্রিশ্চানেরা এগিয়ে এসেছেন, এমনকি সাহেব পুলিশের একাংশ খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে রাখি পরেছে। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয়েছে রাখি। গ্রামগঞ্জের বালক-বালিকারা রাখি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রাখি পরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে, সাহায্য চেয়ে বলে উঠেছে 'বন্দেমাতরম্'।

তাঁতির বন্ধ হওয়া তাঁতে আবার উঠেছে ঠক-ঠক ধ্বনি। তাঁদের জাগিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা সংগীতে আহ্বান জাগিয়েছেন :

ওরে তাঁতী ভাই, একটি কথা তোরা
মন লাগিয়ে শুনিস।
তোদের ওই পুরনো তাঁতে
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে
আমি মাথায় করে নিয়ে যাব রে—
তুই ঘরে বসে টাকা গুনিস।
রজনীকান্ত চাষিদের ডেকেছেন,
মোটা ধান ফলাও—
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড়ো অপমান;
মোটা হোক, সে সোনা মোদের মায়ের
খেতের ধান
মাঠে মাঠে জেগেছে চাষি, কারখানায় শ্রমিক
আর খেটে খাওয়া মানুষ ভিখারিও যায়নি
বাদ। নৌকোর মাঝি বদর পির নাম তুলে।
রেখে গেয়ে উঠেছে বন্দেমাতরম্।
জাগেনি দেশের মানুষ।

এই আন্দোলনের শরিক মেয়েরা

শিবনাথ শাস্ত্রী একদা লিখেছিলেন, 'না জাগিলে ওগো ভারত ললনা/ভারতযে আর জাগে না জাগে

না।' বঙ্গব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে নারীজাগরণ দেখা দিয়েছিল — তার ছবিও কম উদ্দীপক নয়। আগেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' কীভাবে মুর্শিদাবাদের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের প্রায় পাঁচশো মহিলার উপস্থিতিতে পঠিত হয়েছিল তা বলা হয়েছে।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষিত হলে স্বদেশি নেতৃবৃন্দ মেয়েদের কাছে একটি অভিনব আবেদন রাখলেন সমাগত ভাইফোঁটা উপলক্ষে তাঁদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে। তাঁদের কাছে ২৯ অক্টোবর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রাক্কালে জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করার জন্য একটি আবেদনপত্র প্রচারিত হল — যার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হয়তো এই আবেদনপত্রের রচয়িতাও তিনি। The Bengalee কাগজের ২৫ অক্টোবর তারিখে এটি প্রচারিত হয়। সেটি তুলে দিই :

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও ধনভাণ্ডার।

বন্দেমাতরম্।

ভগিনীগণ, ভাইদ্বিতীয়ার আর বিলম্ব নাই।

ঈশ্বরের কৃপায় এই বৎসর হইতে তোমাদের ভাই দ্বিতীয়ার যজ্ঞ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে। এবার রাখীসূত্রে সমস্ত বাঙ্গালি ভাই হইয়া মিলিয়াছে। এবারে তোমরা ভাইকে নিমন্ত্রণ করিবার বেলায় দেশভাইকে ভুলিও না। ভগিনি! আমরা তোমাদের দেশভাই, সেই শুভদিনে সমস্ত বঙ্গরমণীর কোমল-হৃদয়ের কল্যাণ-কামনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব। সেদিন তোমাদের ঘরের ভাইয়ের অন্নের থালায় যখন অন্ন পরিবেশন করিবে, তাহাদের বস্ত্রের থালায় যখন বস্ত্র সাজাইয়া রাখিবে তখন হে কল্যাণি মনে রাখিও, ভাই তোমাদের একটি দুটি নহে — সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া বহু কোটি তোমাদের ভাই; তাহাদের অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, তাহাদের শরীর রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানের বস্ত্রটুকু সমুদ্র পার হইতে আহরণ করিতে হয়। তাহারা অন্নবান হউক, তেজস্বী হউক, নীরোগ হউক, তাহারা নিজের দুঃখ নিজে মোচন করিবার শক্তি লাভ করুক, এই কামনা করিয়া, ভগিনীগণ সেই দেশ-ভাইদের অন্ন ও বস্ত্রের উদ্দেশ্যে সেদিন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিও। তোমাদের কল্যাণ কামনায়, তোমাদের মঙ্গলদানে আমাদের দেশের সমস্ত ভ্রাতৃগণের ললাটের তিলক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, যমের দ্বারে যথার্থই কাঁটা পড়িবে — এবং যে বিধাতা তোমাদিগকে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়া বাঙ্গালীর ভগিনী করিয়াছেন তিনি প্রসন্ন হইবেন। তাঁহার প্রসাদেই তোমাদের দেশের ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরের ভাইদেরও যথার্থ মঙ্গল হইবে, ইতি।/শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ,/" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,/" আনন্দমোহন বসু,/" জগদিন্দ্রনাথ রায়,/" নলিনবিহারী সরকার,/" মতিলাল ঘোষ,/" ভূপেন্দ্রনাথ বসু,/" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আবেদনপত্রটি একাধিকবার প্রচারিত হয় এবং পরে সূর্যকান্ত সাবর্ণচৌধুরী, নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সংযুক্ত হয়। ১ নভেম্বর অমৃতবাজার লিখছে, এই আবেদনে মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে জাতীয় তহবিলে ভাইফোঁটার খরচ বাঁচিয়ে প্রচুর টাকাকড়ি দান করেন। এরই মধ্যে প্রচারিত হল রাখিবন্ধনের আবেদনও। মেয়েরা অন্দরমহলে বসে সন্ধ্যাপ্রদীপের সলতে পাকানোর মতো রাখি তৈরির পবিত্র কাজে রত হলেন। প্রবাসী পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে (কার্তিক ১৩১২) দেখছি জনৈক লেখক লিখেছেন, 'সেই রাখীবন্ধন দিবসে উষাকালে যখন আমার পূজনীয়া জননী রাখি প্রস্তুতকরণোদ্দেশে কতকগুলি উপবীতসূত্র লইয়া হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল সদ্যপ্রস্তুত সূত্র দ্বারা এ রাখী প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তাঁর মাকে একথা জানাতেই তিনি টাকু বের করে সুতো তৈরি করলেন। প্রস্তুত রাখী পাড়ার ছোট ছেলেরা আকাশ-ফাটনো 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে পূর্ণ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিয়ে এল।

চারণ-কবি মুকুন্দদাস আহ্বান করেছেন —

ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি — বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পোরো না
কাঁচের মায়াতে ভুল — শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পোরো না।।

কলকাতার এক নারীসভায় নাটোরের মহারানি সভানেত্রী হয়ে বক্তৃতায় বর্জন-নীতি সমর্থন করলেন। প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে বেশ কয়েকটি মহিলা সভা সংগঠিত করলেন। নদিয়া-মঙ্গলগঞ্জের জমিদার লক্ষ্মণচন্দ্র আশের বিধবা পত্নী, জলপাইগুড়িতে অম্বুজা-সুন্দরী দাশগুপ্তা, ময়মনসিংহে পুণ্যলতা গুপ্তার প্রযত্নে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একদিন সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করলেন, এমনকি কাশীতে এর প্রতিবাদ-সভায় বক্তৃতা করেন সুশীলা বসু।

১৯০৭ সালে যখন 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ইংরেজ সরকার দণ্ডিত করে, তখন কলকাতার শিক্ষিতা নারীরা একত্রিত হয়ে ১১ অগস্ট নীলরতন সরকারের হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ভূপেন্দ্র-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীকে সংবর্ধিত করেন। এই ঘটনা লক্ষ করে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ১৩ অগস্ট সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন — The ladies gathering at the house of Dr. Nilratan Sircar to do honour to the aged mother of Sriman Bhupendranath Dutt, who has heroically faced bureaucratic persecution in the cause of the country, is a fresh proof of awakening of Indian Womanhood.

এই নারী জাগরণের সেরা সাক্ষ্যটি এবারে তুলে ধরি। গৃহবধূ তারাপ্রসন্ন বসুর স্ত্রী সরোজিনী বসু বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে এই চিঠিটি লিখে পাঠান :

বন্দেমাতরম্।

পূজ্যপাদ — শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু

শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামণিকে দিয়া ডাইন হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্যন্ত "বন্দেমাতরম্" বলা নিষেধী সার্কুলার রহিত না হইবে সে পর্যন্ত ঐ হাতে সোনার বালা পরিব না। বন্দেমাতরম্।

সেবিকা—
শ্রীসরোজিনী বসু।

অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে একজন বিদেশিনী, স্বদেশিনীদের চেয়েও অনেক বেশি ভারতীয়, তিনি নিবেদিতা — এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগের ইতিহাস একটি পৃথক অধ্যায় রচনার অপেক্ষা রাখে।

ব্যবসায়ী মহলে প্রতিক্রিয়া

১৯০৫-এর আন্দোলনের একটা বড়ো আহ্বান ছিল বিলিতি দ্রব্য বর্জন আর দেশি জিনিসের কদর। স্বভাবতই এই আহ্বান ব্যবসায়ী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। যা কিছু বিলিতি — তাই ত্যাগ করতে হবে। এই তালিকায় প্রসাধন দ্রব্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল লবণ, চিনি, পরণের কাপড়ের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও। বেশি ধাক্কাটা লাগল কাপড়ে। রজনীকান্ত সেন ডাক দিয়েছেন — 'মিহি কাপড় পরব না আর যেচে পরের কাছে;/মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পরলে কেমন সাজে'। অতএব 'ঘরে বসে কযে মাকু' চলতে লাগল। 'বিশ' কাপড় ছেড়ে 'উনিশ' কাপড়ের কদর চাই। অতএব, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' কারণ 'ওই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ' জড়িয়ে। সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালে দ্য স্টেটসম্যান দেখিয়ে দিলে, এই আহ্বানে বিলিতি কাপড়ে বাজার বাংলায় পতনের মুখে। ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বরে একা যশোর জেলায় ৩০ হাজার টাকার কাপড় বিক্রি হয়েছিল, এক বছর পরে সেই বাজার এসে ঠেকেছে মাত্র এক হাজারে। বরিশাল কুমিল্লায় এই গতি আরও নিম্নমুখী। ১ সেপ্টেম্বর মাড়োয়ারি চেম্বার অফ কমার্স বিলেতে টেলিগ্রাম করে জানায় যে কলকাতায় বিলিতি কাপড়ের বিক্রি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব তুলে না নিলে আসন্ন পুজোয় বিলিতি কাপড় বিক্রি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ এ দিনেই সিমলায় বঙ্গভঙ্গের নির্দেশ জারি হয়ে যায়। সত্য কথা বলতে সে সময়ের মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়িক কারণে অন্তত বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের

বিরোধী ছিলেন। বড়োবাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার জন্যে তাদের প্ররোচনায় পুলিশ পিকেটার ও ছাত্রদের উপর কম নির্যাতন চালায়নি। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে লিখে গেছেন, "মাড়োয়ারিরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর বিশেষ শত্রুতা করিয়াছিল। এমনকি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গলার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই।"

কলকাতায় সে-সময়ে দেশজ জিনিসপত্রের দু-একটি মাত্র ভাণ্ডার ছিল। মনোহর দাস কাটরায় কুঞ্জবিহারী সেন কলকাতায় দেশি মিলের কাপড়ের একমাত্র আমদানিকারক ছিলেন। জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় একদল তরুণকে সঙ্গে নিয়ে এঁর দোকান থেকেই দেশি কাপড় মাথায় নিয়ে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গাইতে গাইতে দুয়ারে দুয়ারে ফেরি করতেন। দেখাদেখি বড়োবাজারের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী দুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু ও কুবেরজি ভোজাও স্বদেশি কাপড় আমদানি করতে লাগলেন। সিটি কলেজের অধ্যাপক কালীশঙ্কর সুকুলের বড়োবাজারে দুটি দোকান ছিল। এই দুটি দোকানের নাম ছিল — ক্রস স্ট্রিটের 'কালীশঙ্কর দুলিচাঁদ' ও পগেয়াপট্টির 'কালীশঙ্কর রামেশ্বর'। এরাই প্রথম দেশি সুতোয় তাঁদের কাপড় বুনিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করলেন এবং মফস্‌সলে তাঁতে বোনানোর জন্য তাঁতিদের দেশি সুতো সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার দেখাদেখি মফস্‌সলেও 'স্বদেশী ভাণ্ডার' স্থাপিত হল — সবার আগে বীরভূমের রামপুরহাট ও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে।

বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসবে

অন্যদিকে বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব চারদিকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ তারিখে গোলদিঘিতে প্রকাশ্যে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হল। এত কাপড় জড়ো করা হয়েছিল যে পোড়াতে ষোলো সের কেরোসিন লেগেছিল। আড়াই ঘণ্টা ধরে কাপড় পুড়েছিল। পরের দিন বিডন স্কোয়ারে একই ব্যাপার। ৪ মার্চ কলকাতার ২০ জায়গায়। দেখাদেখি ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহের মতো মফস্‌সল শহরে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু দেশি কাপড়ের প্রয়োজন মতো জোগান কই! তা ছাড়া চটের মতো কাপড়ে বাবুদের গোসা; গিন্নিদের মুখভার। 'স্বদেশী ভাণ্ডার' এঁদের মুখে হাসি আনতে পারে না। এই আন্দোলনের অনেক আগে ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ অম্বিকাচরণ উকিলকে নিয়ে যে 'স্বদেশী ভাণ্ডার'-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন প্রথম (তার মস্ত সাইনবোর্ড ছিল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ঘুরে ঘুরে পায়ের আলতা বেচে মেয়েদের পায়ের স্বদেশি জুতো সব স্টক করার ব্যবস্থা করতেন)। তাঁর দেখাদেখি ১৯০১ সালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী স্থাপন করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান স্টোর্স', আর ভাগ্নী সরলাদেবী প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯০৩ সালে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশি সামগ্রীর বিপণি। এ সবের পিছনে এক তরুণ স্বদেশির নাম অনেকেই ভুলে গিয়েছেন — স্বদেশি কেদারনাথ দাশগুপ্ত — যাঁর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দোকান থেকেই ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকা। বউবাজারের মোড়ে আব্দুল হালিম গজনাভি প্রতিষ্ঠিত 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স'ও স্বদেশি ভাণ্ডারের একটা বড়ো আশ্রয় ছিল। ডন সোসাইটির 'স্বদেশী স্টোর্স' শুধু ১৯০৩-৪ সালেই প্রায় ১০ হাজার টাকার মতো স্বদেশজাত জিনিসপত্র বিক্রি করে। বন্ধ হওয়া তাঁতে আবার করে ঠকঠকানি শব্দ শোনা যেতে লাগল গ্রামেগঞ্জে। শুধু কাপড় নয়, লবণের মতো অতি প্রয়োজনীয় জিনিসও স্বদেশিদের তালিকায় এসে গিয়েছিল। বিলিতি নুন বিক্রি বন্ধ। বিলিতি কাপড়ের মতো বিলিতি নুনও গুদামজাত হতে থাকল। বরিশালের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একবার বাজারে গিয়ে বিলিতি কাপড় চাইলে দোকানিরা সাফ জবাব দিয়েছিলেন, 'অশ্বিনীবাবুর (দত্ত) হুকুম ছাড়া বেচতে পারব না।' পিকেটিংয়ের লোকেরা লবণের নৌকো দিল ডুবিয়ে। শুধু বরিশালে নয় — উজিরপুর, মহিলাড়া, বাটাজোড়, গৈলা, ভোলা — অজ পাড়াগাঁয়েও স্রোত গিয়ে লেগেছে। বিলিতি ব্যাপারটাতেই এমন এলার্জি হয়েছিল সেকালে যে, নানা কাগজে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত রচনা কালো বর্ডার দিয়ে ছাপছিলেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সম্পাদক মহাশয়, তোমাদের কাগজ হইতে এই কালিমা মুছিয়া ফেল... দেশের অঙ্গে বিদেশী

কালী দিয়া নূতন কলঙ্ক আর লেপন করিও না।' এমনকি টাউন হলের একটি সভায় শোকজ্ঞাপনে কালো কাপড় টাঙানো হয়েছিল — তা 'বিলিতি' ছিল বলে একদল ক্ষোভ প্রকাশ করায় টেনে ফেলে দেশিয় কৃষ্ণবস্ত্র নিয়ে আসা হয়। শুনতে ভালো লাগছে এই উদ্দীপনার কথা। কিন্তু এর জোয়ার বাংলাকে যতখানি ভাসিয়েছিল। তা অন্য প্রদেশে ততখানি সমস্যা সৃষ্টি করে না। প্রবাসী পত্রিকার ৫ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'দেশী জিনিস ব্যবহার' নামে সেই সময়েই যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাতে তো ভিতরের অনেক কথা বলা হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুস্থানিরা বিলিতি নুনের পরিবর্তে সৈন্ধব লবণ অথবা করকচ ব্যবহার অভ্যস্ত। যুক্তপ্রদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা বিলিতি চিনি ব্যবহার করতেন না — যে সব ময়রার দোকানে বিলিতি চিনি ব্যবহার হয় — সেখান থেকে মিঠাই পর্যন্ত তাঁরা কিনতেন না। তবে কি সমস্যা বাংলাতেই বেশি ছিল? প্রবন্ধ লেখক বাঙালিদের বিলিতি ছাতার পরিবর্তে 'ফিট' ব্যবহার করতে বলেছেন, নিদেনপক্ষে জাপানি ছাতা। বিলিতি দেশলাই না পেলে জাপানি (এখানে বিলিতি বলতে ইংল্যান্ডজাতকেই বোঝানো হয়েছে) দেশলাই, জাপানি ল্যাম্প ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, "বোম্বাই ও কানপুরের কলে, হস্তনির্মিত বিস্তর জুতা পাওয়া যায়। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুদের ডসন্ ও নর্ম্যান্ না হইলে পদদ্বয় সুশোভিত হয় না।"

আসলে সরষের মধ্যে ভূত ছিল। প্রবাসী তাই 'স্ব ও দেশ' নিবন্ধে রঙ্গ করে লিখেছিল — 'স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কোন কোন কাগজে একটা প্রস্তাবের কথা পড়িয়াছিলাম যে, যাহারা মদ খায় তাহারা যেন বিলাতী মদ ছাড়িয়া দেয়। অর্থাৎ খারাপ কাজটা না করিয়া উপায় নাই, সুতরাং দেশী রকমে কর।" এই বিষয়টির সুযোগও কিন্তু সে সময়ের ব্যবসায়ীরা কম নেয়নি। 'আমরা চাই দেশী চিনি, কিন্তু ব্যবসাদারেরা বিদেশী চিনিকেই মাড়িয়া নানা উপায়ে তাহার রং দেশীয় মত করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া আমাদিগকে ঠকাইতেছেন। ...আমরা চাই দেশী কাপড়। ব্যবসাদারেরা সুযোগ পাইয়া দেশী কাপড়ের খুব দাম চড়াইয়া লাভ করিতেছেন। ইহাতে তবু প্রতারণা নাই, কিন্তু কোন কোন ব্যবসাদার বিলাতী কাপড়ে দেশী ছাপ মারিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইতেছেন। ...স্বদেশী বলিয়া যেসকল জুতা পরিতেছি, তাহা ভারবর্ষে ইংরাজ পরিচালিত কারখানায় নির্মিত।' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই নেতিবাচক দিকটাও তো লক্ষ করার মতো। সবাই খারাপ এমন ভাবার কারণ নেই। ২৩ জানুয়ারি ১৯০৬ তারিখে বড়োবাজার 'শিল্পনিকেতন' পয়সায় যে দুটি ম্যাচ বাক্স বিক্রি করা শুরু করেছিলেন — তা বাস্তবিকই দেশি ছিল।

১৯০৫ সালের পুরনো অমৃতবাজার পত্রিকায় ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনের ভাষায় ব্যবহার করেছেন 'স্বদেশি' উচ্চারণ। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের 'কেশরঞ্জন তেলের' বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

THE PARTION QUESTION

AND

All its accompanying evils

notwithstanding

The World is steadily moving on and on,

with its recurring joys and sorrows.

Mother Bengal is in deep mourning.

মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়ম এ সময়ে বিজ্ঞাপনে লিখেছে :

NATIVES OF INDIA

Be Loyal

Purchase goods made in your own

country

Purchase goods made by your own
countrymen.
Encourage Native Industry

BUY ALUMINIUM MADE BY
THE INDIAN ALUMINIUM CO.LTD
MADRAS

দেখেছি Brief price List-সহ 'Sudeshi Winter Clothes'-এর বিজ্ঞাপন, মল্লিক ব্রাদার্সের 'Purery Indian materials'-এ তৈরি জিনিসের বিজ্ঞাপন এবং যাঁরা বঙ্গমাতা জ্যাকেট বা বঙ্গমাতা শাড়ি এনে বিক্রি করতেন সেই 'Phenomenal store of Swadeshi goods'-এর মালিক Sen & Co.-এর বিজ্ঞাপন। পুজোর জন্যে এদের আয়োজন ছিল বিপুল।

কুন্তলীন-কেশতৈল খ্যাত এইচ বোস — হেমেন্দ্রমোহন বোসের স্বদেশিয়ানা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর কথা বলব। বেঙ্গল কেমিক্যাল অথবা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অনেক আগেই তিনি রাখিবন্ধনের দিনটিতে তাঁর ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, এ সময়ে ছাপা অনেক প্রচারপত্র, পুস্তিকা, ছবিপত্র তাঁর কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হয়েই প্রচারিত হত। রাধাবাজারের চণ্ডীচরণ ঘোষ ১০ নভেম্বর তাঁর দোকান থেকে 'ভারতমাতা'র ছবি ছেপে চার আনা দামে বিক্রি করে তা ন্যাশনাল ফান্ডে জমা দেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে 'রাখিবন্ধন' কার্ড ছেপে বিতরণ করা হয়েছিল। এই প্রেসটিকেই রমেশচন্দ্র চৌধুরী নামের এক যুবক জাতীয় নেতাদের ছবি ছাপিয়ে বিক্রি শুরু করেছিলেন এই সময়। এই রমেশচন্দ্র ছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের স্বগ্রামবাসী। প্রতিটি ছবির দাম নিতেন এক আনা। এমনি করেই ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী মনস্করা ১৯০৫-এর আন্দোলনে শামিল হয়ে পড়েছিলেন।

সাহিত্যে ১৯০৫

সেই পুরনো কথা — অসির চেয়ে মসীর ধার বেশি। বাংলা সাহিত্যের সর্বশাখায় এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করল। সাহিত্য যে সমাজের দর্পণ। সবচেয়ে বেশি লিখেছেন এ সময়ে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধ, গান, উপন্যাস (গোরা বা চার অধ্যায় রচনার পিছনে এর প্রভাবকে তো কোনও ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না), কবিতায় তিনি দেশকে জাগিয়েছেন উদ্বোধনী মন্ত্রে। রাখিবন্ধনের পরিকল্পনা তো তাঁরই। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একটি গ্রন্থ রচনার অপেক্ষা রাখে। প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল, সরলাদেবী চৌধুরানী, প্রমথ চৌধুরী, রাধাকান্ত বসু, রমেশচন্দ্র বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ; প্রবন্ধ পুস্তক 'দেশের কথা'য় সখারাম গণেশ দেউস্কর (পরে ১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত) প্রমুখ; ছোটোগল্পেও পেয়েছি আমরা এই আন্দোলনের উল্লেখ। কুন্তলীন পুরস্কার যোগেশচন্দ্র মজুমদারের 'রাখীবন্ধন' গল্পে পেয়েছি এ দিনে গঙ্গাস্নানের কথা অথবা যশোমালিনী দেবীর 'পূজার চিঠি'তে শুরুই দেখেছি 'বন্দেমাতরম্' দিয়ে এবং স্বদেশি আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে মনোরম কাহিনি রয়েছে। উপন্যাস লিখেছিলেন গঙ্গাচরণ নাগ — 'রাখিকঙ্কণ'। নাটকের কথা আগেই বলে এসেছি।

কবিতায় স্বদেশিভাব প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এতে আবেগের একটা বড় জায়গা থাকে। খুচরো কবিতা লেখকের তালিকা করা দুঃসাধ্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'স্বদেশিনী' কাব্যগ্রন্থ (১৩১২); নলিনীরঞ্জন সরকারের বন্দনা প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এর ৫ সেপ্টেম্বর সখারাম গণেশ দেউস্করের ভূমিকাসহ স্বদেশি কাগজে ছেপে — এক মাসের মধ্যেই তিনটি সংস্করণ হয়। এর প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায় মাত্র ৯ দিনের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিহারীলাল রায়ের 'স্বদেশগাথা' (১৩১৩), দুর্গাদাস সিংহের 'বঙ্গবিলাপ' (১৩১২)-ও উল্লেখযোগ্য। তবে সাড়া জাগিয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

স্বদেশি কবিতার সংকলন 'বন্দেমাতরম্'। মাত্র চার আনা দামের এই বইটিও রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর অজ্ঞাত অনুবাদক কর্তৃক যে ইংরেজি অনুবাদটি আছে — তা এক কথায় অপূর্ব।

সঙ্গীতে ১৯০৫

তবে এ সময়ের গান যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তার তুলনা নেই। রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের প্রাণমাতানো গানে বাঙালি মাতোয়ারা হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ কতবার সভাসমিতিতে নিজে গান করেছেন। বিনয় সরকার সাহায্য দিয়েছেন তিনি ডন সোসাইটির সভায় শুধু গানই করেননি — 'সেই সঙ্গে ডন সোসাইটির ছোকরাদের গানের সাকরেত করে নিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি স্বদেশি গান শেখাবার ব্যবস্থা করা হল। কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর অন্যতম বড় চেলা অজিত চক্রবর্তী নিয়মিত এসে আমাদের গান শিখিয়ে যেতেন।

মেট্রোপলিটান কলেজে চোআঁড় গলায়, গাধার গলায়, ফাটা গলায়, মিহি গলায়, সর্দি গলায় অ-সুরেরা সুর সাধনা করত।'

মুকুন্দ দাস গাইলেন, 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমররঙ্গে' এবং "রাখিস রে মনে/হিন্দু-মুসলমান ভাই দুজনে এক হয়ে আজ নাবতে হবে/লাগতে হবে মা'র সেবায়।।

চরকার ঘর ঘর শব্দে তিনি শুনতে পান 'স্বরাজ রথের আগমনী'।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রচনা করলেন সেই বিখ্যাত সংগীত —

মাগো যায় যেন জীবন চলে
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে।

এই গানটি দিয়েই ১৯০৬-এর বৈশাখে প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধন ঘটেছিল।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের গান পূর্ববঙ্গে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর গানের দুটি কলি —

ঐ শোনো আজ বিধাতার ভেরী, বাঁধ কটিতটে শাণিত ছুরি,
দানবদলনী সাজ গো জননী। বাঙালিনী বেশ ছাড়গো।

এমনকি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় করালী ছদ্মনামে,অশ্বিনীকুমার দত্ত-ও গান লিখেছেন আবেগমথিত হয়ে। এছাড়া কত যে অজানা গীতকার তত গান লিখেছেন — তা হিসেব রাখা দুষ্কর। 'পেটের খিদায় জইলে গো মইলাম' কিংবা 'কিবা হইল গো নানি' প্রভৃতি জনপ্রিয় গান এখন কোথায় হারিয়ে গেছে। বিশেষ করে যেসব গানের সঙ্কলন সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন — তার অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। রজনীকান্তের বিখ্যাত গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' যে দিন ছাপা হয়, সে দিনই সন্ধের সময় সেই গান রাস্তায় গাইতে শোনা গিয়েছিল — স্বয়ং জলধর সেন এ কথা বলে এর জনপ্রিয়তার কথা তুলে ধরেছেন। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা' ব্যঙ্গ সঙ্গীতটির কথা কাউকে বলতে শুনি না। গোরাচাঁদ ইংরেজ আর শ্যামা মা বঙ্গজননীকে নিয়ে এই গান তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

আন্দোলনে ইস্তেহার

এ সময় যে কত প্রচারপুস্তিকা, প্রচারপত্র,অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল তার হিসেব করে ওঠা দুরূহ। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানী মন্দির' এমন একটি পুস্তিকা। এতে প্রস্তাব ছিল, একটি নির্জন পরিচ্ছন্ন জায়গায় শক্তিদায়িনী দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে দেশব্রতী তরুণেরা দেশের জন্য আত্মবলিদানের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। এই ১৯০৫-এর আন্দোলনই অরবিন্দকে পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত করে। এ বছরের জুলাই মাসের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গে 'সোনার বাংলা' নামে একটি পুস্তিকার অভাবনীয় প্রচার হয়। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এটি বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, পরে জানা যায় এর লেখক

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এতে বিদেশি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে দাঁড়াবার খোলাখুলি আহ্বান ছিল।

বরিশালে প্রচারিত হয়েছিল একটি উত্তেজক প্রচারপুস্তিকা। অশ্বিনীকুমার দত্ত সহ পাঁচ নেতার স্বাক্ষরিত এই পুস্তিকা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়। তাতে বিলিতি জিনিস বর্জন করে দেশি জিনিস ব্যবহারের আবেদন ছিল। ছোটোলাট ব্যামফিল্ড ফুলার 'রোটাস' জাহাজে চড়ে বরিশালে এসে পাঁচজনকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিয়ে বললেন — You are playing with fire. তারপর তাঁদের পুস্তিকা প্রত্যাহারের জন্যে আবেদন করলে তা প্রত্যাহৃত হয়। অশ্বিনীকুমারকে এ জন্যে নিন্দিত হয়ে হয়েছিল। তবে ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক সাহেব রং চড়িয়ে যখন বলেন যে এটি রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা ছিল বলেই ভয়ে তাঁরা প্রত্যাহার করেছেন — তখন তাঁরা প্রতিবাদ করেন এবং জ্যাক সাহেবকে ১০১ টাকার জরিমানা দিতে হয়েছিল। আর জাতীয় গ্রন্থাগারে রাখিবন্ধন উৎসবের একটি দুষ্প্রাপ্য ছোটো অ্যালবাম রয়েছে। ৫"×৪" আকারের এমন ধরনের অ্যালবাম বাংলাতে সম্ভবত এই একটি। এর প্রচ্ছদে মোটা কাগজে ছাপা চিত্র — রাখি-সংক্রান্তি ৩০শে আশ্বিন সোমবার, ১৩১২ সাল। শুরুতেই 'বন্দেমাতরম্' লেখার পর রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' মুদ্রিত। অবশ্য গান রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ কোথাও নেই। ভিতরে ছটি ছবি : দুটি ফোটোগ্রাফের বিষয় 'বন্দেমাতরম্', সম্প্রদায়ের স্নানযাত্রা, দুটির বিষয় গঙ্গাতীরে রাখি-স্নান, একটি করে রয়েছে স্নানশেষে রাখিবন্ধন উৎসব, মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানে যাত্রা, মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠাস্থানে লোক জমায়েত এবং মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার শেষে জাতীয় ধনভাণ্ডারে দানার্থে যাত্রার ফোটোগ্রাফ। নীলরঙে ছাপা এই অ্যালবামটির শেষ গানটিও রবীন্দ্রনাথের — 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে'। গানটির শিরোনাম 'বাণ' (বানান লক্ষণীয়)। অ্যালবামের চতুর্থ প্রচ্ছদে লেখা আছে — 'শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী প্রণীত'। ইনি নিশ্চয়ই সুখ্যাত শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এটি ছাপা হয়েছিল মহিলা প্রেসে, বিলি করতেন ৫৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটস্থ সি কে দত্ত এবং ২৯-২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের 'বন্দেমাতরম্' এজেন্সি। ছবিগুলির ব্লক তৈরি করেছিলেন জি এন মুখার্জি এন্ড ব্রাদার্স। সিদ্ধার্থ ঘোষ অনুমান করেছেন এগুলির আলোকচিত্রী কুন্তলীন-খ্যাত হেমেন্দ্রমোহন বসুই। তাঁর পৌত্র ডাক্তার সুগত বসুর সংগ্রহেও এ ধরনের কিছু স্টিটিওস্কোপিক নেগেটিভ ও স্লাইড এখনও রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে আরও একটি সুদুষ্প্রাপ্য বিচিত্র ফোল্ডার। এটিও রবীন্দ্রনাথ শিবনাথ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। এর সূচনাতেই রয়েছে ভারতমাতার একটি মূর্তি। সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রের বুকে চতুর্ভুজা রাজলক্ষ্মী বরাভয় মূর্তিতে দণ্ডায়মান। পাশে সুনীল সাগর। অঙ্কুশধারিণী এই মূর্তি তাঁর পরিধেয় নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধেছেন। এই ছবিটি ছেপেছিলেন DAS & DAS কম্পানি। চার পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে সেই মায়ের বিবরণ। খুব মজার ব্যাপার, এই তৃতীয় পৃষ্ঠার মুদ্রাকর ভিন্ন প্রতিষ্ঠান — ন্যাশনাল এম্পোরিয়াম এবং প্রকাশক সতীশচন্দ্র ঘোষ। আসলে প্রতিটি পৃষ্ঠার মুদ্রাকরই ভিন্ন ভিন্ন, এমনটি আমি কোথাও আগে দেখিনি। মাতৃবন্দনা-বিষয়ক কবিতাটির পাঠ এই প্রকারের :

মায়ের
পায়ে অলঙ্কার—লঙ্কার কমল
মুকুতা-কিঙ্কিণী ঝলে ঝলমল
মোহিনী মেখলা-বিন্ধ্য-নীলাচল
শোভিছে ঘরে
শুভ্র শৈল শৃঙ্গে — অচল চূড়ায়
হিমাদ্রি যাহার কুন্তল উড়ায়
শ্রান্ত তনু যার মলয় জুড়ায়
বীজন করে
ক্ষরিছে মর্মে মর্মে

গোদাবরী-গঙ্গা-কাবেরী নর্মে;
প্রাচী পশ্চিমে করাচি ব্রহ্মে
অঞ্চল উড়ে;
এস মা এস মা ভারতে ভারতি!
মিলিত বঙ্গে আজি যে আরতি
পুণ্য স্নান করি হে এক মতি
রাখীর ডোরে।

কে এই কবিতার লেখক? এটি কি গান নয়? এটিই কি দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা? পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের রাখি-সংগীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। কিন্তু রাখিবন্ধনের মূল মন্ত্রটির সম্পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমি অন্তত এই পুস্তিকাটি দেখার আগে জানতে পারিনি :

ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই।
এক দেশ এক ভগবান এক জাতি এক মন
প্রাণ।।

এখানেই মুদ্রিত আছে রাখিবন্ধনের সেই আশ্চর্য সংস্কৃত মন্ত্রটি।

রাখী-বন্ধন মন্ত্র।
সংযোজয়তু সখ্যেন চিত্রং সূত্রং করে ধৃতম্।
স্নাত্বেদমঙ্গচ্ছেদে পি বঙ্গ মাতুঃ পরস্পরম্।

এই মন্ত্র কে রচনা করেছিলেন? ক্ষেত্রমোহন কথক। অথবা অন্য কেউ?

পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ

সংবাদপত্র সমাজের মুখপাত্র চিরকালই। ১৯০৫-এ দেশব্যাপী যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল তার বাণী দেশবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে দেখাবার জন্যে এবং একটি জনমত গঠনের জন্যে এ সময়ে বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকার জন্ম হয়েছিল। তাদের পৃষ্ঠা থেকেই আমাদের এই নিবন্ধ রচনার মুখ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

১৯০১ সালে বের হয়েছিল ইংরেজি বিপিনচন্দ্র পালের New India, ১৯০৪ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা আর করালী, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ভাণ্ডার, স্বদেশী, সুমতি, ইন্দিরা, ১৯০৬-এ যুগান্তর, ইংরেজি বন্দেমাতরম্; স্বরাজ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে কুমুদিনী মিত্রের সুপ্রভাত (১৯০৭) বিশেষ উল্লেখনীয়। মফসস্‌ল থেকেও অনেক স্বদেশি কাগজ বের হয়েছিল — যশোর থেকে কল্যাণী, মেদিনীপুর থেকে তমালিকা, বরিশাল থেকে বরিশাল হিতৈষী, তো ময়মনসিংহ থেকে চারুমিহির প্রভৃতি। এদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন কমলা (১৯০৩), Industrial India (১৯০৪), ব্যবসাবাণিজ্য, Industry প্রভৃতি কাগজ। আগে থেকেই ছিল প্রবাসী,ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকা, ভারতী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকা। সঞ্জীবনী, বেঙ্গলি মোহাম্মদী, সোনার বাংলা, নবশক্তি, পল্লীচিত্র, দেশবার্তা, কর্মযোগিন্, ধর্ম, বিশ্ববার্তা, সুরভি প্রভৃতি পত্রিকা এই আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছিল।

হিতবাদী লিখেছিল, "গত দেড়শ' বছরে বাঙালির বুকে এত বড় মৃত্যুবাণ আর বাজেনি।" সুরেন বাড়ুজ্জের 'বেঙ্গলি' বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে বলেছিল — 'A great national disaster'। এমনকি সাগরপারের 'লন্ডন ডেইলি' লিখেছিল — 'ভারতবাসীর কাছে এই ঘোষণা খুবই বেদনাদায়ক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কার্জনের প্রিয় পত্রিকা টাইমস পর্যন্ত বাঙালির প্রতিবাদকে সমর্থন বা সহানুভূতি না জানিয়ে উপায় নেই বলে মন্তব্য করেছিল।

এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সব রচনা সঙ্কলিত ও বিশ্লেষিত হয়ে যদি একটি গ্রন্থ রচিত হয়, তবেই এই আন্দোলনের সঠিক ছবিটি আঁকা যেতে পারে। আমরা শুধু একটা খসড়া করার সুযোগ নিলাম। একটি

পত্রিকার কথা আমি ছাড়া কেউ উল্লেখ করেননি, এটি কিশোরপাঠ্য পত্রিকা ছিল বলেই সম্ভবত। কিন্তু সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কিশোরদের কাছেও এই আন্দোলনের বার্তা প্রচারের আয়োজন হয়েছিল এখানে। 'প্রদীপ' পত্রিকার কার্তিক ১৩১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রাখিবন্ধনের দিন পশুপতিনাথ বসুর প্রাঙ্গণে যে সভা বসেছিল তাতে পশুপতিবাবু প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম এবং বিবরণ। কিন্তু বক্তৃতার শেষে শিখগুরু কুঁয়ার সিংহ কয়েকজন শিখকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলেন 'বাঙ্গালীর পশ্চাতে সমস্ত পঞ্জাব বিদ্যমান আছে'। সমবেত অর্ধ লক্ষ মানুষ জয়ধ্বনি করে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে শিখগুরুর হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন।

নাটকে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপায়ণ

সেকালে জনজাগরণের দুটি বড়ো মাধ্যম ছিল — সংগীত আর অভিনয়। ১৯০৫-এর আন্দোলন অভিনয় জগতেও ছাপ কম ফেলেনি। বিশেষ করে নাটকে সন্নিবেশিত গানগুলি। গিরিশ ঘোষের 'সোনার বাংলা'র আবেগময় গানগুলিতে; য্যায়েসা কি ত্যায়সায় উল্লিখিত নিচের গানটিতে; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস নাটকে; অমৃতলাল বসুর 'সাবাশ বাঙালী' (১৯০৬) প্রহসনে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (ইনি বহুবার এই আন্দোলন প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন) 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩-র) নাটকে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সোজাসুজি বিষয়টি নিয়ে লেখা 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নাটকগুলিতে ১৯০৫-এর চেহারা নানাভাবে ফুটে উঠেছিল। ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব বন্দেমাতরম্ মঞ্চ বানিয়ে ১৯ নভেম্বর অভিনয় করল গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক। 'ভিক্ষা' নাম দিয়ে টিকিট বিক্রি করে সেই টাকা জমা পড়ল ন্যাশনাল ফান্ডে।

'সাবাশ বাঙালী' অভিনীত হয়েছিল প্রথম স্টার থিয়েটারে ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৫ তারিখে — দেশ তখন ভাবাবেগে ফুটছে। অবশ্য এক শ্রেণির স্বদেশপ্রেমিক থিয়েটার হলের গ্র্যান্ড, ক্লাসিক, স্টার — এই যে সব বিলিতি নাম — তা বর্জন করার জন্যেও আন্দোলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্যে প্রধান। এরই ফলে শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাট্যমঞ্চের দেশি নামকরণ হয়েছিল 'নাট্যমন্দির'। এইসব নাটকের অভিনয়ে দর্শকেরা হল ভর্তি করে উপস্থিত থাকতেন। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার কালে চারণকবি মুকুন্দদাস লিখলেন মাতৃপূজা (১৯০৬)। এই নাটক লেখা এবং যাত্রাভিনয়ের জন্যে তাঁকে জেলে যেতে হয় তিন বছরের জন্য আর 'মাতৃপূজা'র পাণ্ডুলিপি হয় বাজেয়াপ্ত। রাজরোষের ভয়ে প্রথমে তাঁর পক্ষে কোনও উকিল দাঁড়াতে চাননি। 'প্রতাপসিংহ', 'পদ্মিনী'-র মতো তাঁর যাত্রাপালাগুলিও জনজাগরণ তোলার এক অমোঘ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখন য্যায়সা কি ত্যায়সা-র গানটি উদ্ধার করে দিই :

কাঙ্গালী বাঙালীর মেয়ে, কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিঠে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডির মুখে ছাই।।
এখন চলছে কস্‌তা পেড়ে শাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী
ভেঙ্গে কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি, ঘুচেছে কাঁচের বালাই।

রং-তুলির লিখনে

যাঁরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন তাঁরাও শামিল হয়েছিলেন এই আন্দোলনে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কলকাতার বাঙালি শিল্পীরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় গড়ে তুললেন 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তার আহ্বায়ক। ১০ জুন ১৯০৫ তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরিতে এ জন্যে যে সভা হয়, তাতে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। পরে আরও দুটি সভা হয় — সভাপতি হন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জলধি মুখোপাধ্যায়। জলধি মুখোপাধ্যায় ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার স্বনামধন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র এবং স্বয়ং শিল্পী। বঙ্গীয় কলাসংসদ-এর প্রথম অধিবেশন হল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বাড়িতে। এর সহ-সভাপতি হলেন জলধিবাবু এবং যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। এই অধিবেশনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। অবৈতনিক সম্পাদক অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর বাড়িতেই এর কার্যালয়টি অবস্থিত ছিল। তিনি সরকারি আর্ট স্কুলে যোগ দিলে বঙ্গীয় কলাসংসদ উঠে যায়। শিল্পীদের একটি পত্রিকা ছিল — 'শিল্প ও সাহিত্য'। এর আশ্বিন ১৩১২ সংখ্যায় দেখেছি 'আগমনী' নামে একটি কবিতা। লেখক শ্যামলাল চক্রবর্তী। এই কবিতায় দেখি বঙ্গভঙ্গের রোল :

আজি এ শরতে এস মা শারদে,
ছিন্নভিন্ন করা বঙ্গের মাঝারে।
কি ছিল কি হল পরে লুটে নিল,
আছি পরভরে তার মা বিপদে।।

সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'বন্দেমাতরম্'। তাতে দেখি দ্বিধাগ্রস্ত মুসলমানদের মোহমুক্তির সংবাদ — "মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। সেদিন কলেজ স্কোয়ারের সভায় সে সন্দিগ্ধতা ও সঙ্কোচভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন হইতে বন্দেমাতরম্ হিন্দু-মুসলমান সকলের নিজ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। শিল্প পত্রিকা শুধু সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধান করার ভূমিকা পালন করেনি। এখান থেকে জানতে পেরেছি এই আন্দোলন উপলক্ষে বন্দেমাতরম্-এর সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমার গায়ে এবং পটে-চালচিত্রে চিত্রিত হয়েছে বন্দেমাতরম্। প্রতিমা বিসর্জনে উচ্চারিত হয়েছে 'বন্দেমাতরম্'। হরি সংকীর্তনে গীত হয়েছে ওই ধ্বনি। অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতমাতা' ছবি। ঘরোয়াতে তিনি লিখেছেন — 'আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্নবস্ত্র বরাভয় — এক জাপানি আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে। ...রবিকাকা গান তৈরি করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল।'

ছবিটির প্রথমে নাম ছিল বঙ্গমাতা। সিস্টার নিবেদিতা এর নামকরণ করলেন ভারতমাতা। নন্দলাল বসুও লিখেছেন — 'ভারতমাতা নাম দিয়ে সে ছবি তখন সিল্কের পতাকার উপর করে প্রোসেশন করা হত সেই স্বদেশী আমলে।' লিথোগ্রাফে বহুবর্ণে মুদ্রিত হয়ে এই ছবি সে সময়ে সুপ্রচারিত হয়েছিল। মূল ছবিটি রবীন্দ্রভারতী সমিতির সংগ্রহে রয়েছে এখন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এর একটি বিশাল রেখানুকৃতি তাঁর ঘরে স্থাপন করেছিলেন — সেই কক্ষটিকে এখনও তা অলংকৃত করে আছে।

লোকমান্য টিলককে এ সময়ে বরণ করে মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সে দিন ছিল ১০ জুন ১৯০৬। টিলক গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন, ৩০ হাজার লোক সঙ্গে গিয়েছেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গঙ্গাতীর প্লাবিত। আর সেই মিছিলে পুরোভাগে বাহিত হয়ে চলেছে অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা। শিল্প সৃষ্টির এমন উন্মাদিনী প্রভাব কে কবে দেখেছে।

আন্দোলন ও চলচ্চিত্র জগৎ

বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ বলে তখন কিছুই ছিল না। কিন্তু চলচ্চিত্রের জগতে বাঙালিদের আগমনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এসে গিয়েছেন কৃতী পুরুষ হীরালাল সেন। ৭ অগস্ট এবং ২২ সেপ্টেম্বরে টাউন হলে দুটি মহতী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। হীরালাল ৭ অগস্টের সভাটির ছবি তুলে উঠতে পারেননি। কিন্তু ২২ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এই সভা এবং কলেজ স্কোয়ার বা গোলদিঘিতে যে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল, তার ছবি তুলে ফেললেন। ভাবছেন কোথায় একে প্রদর্শন করবেন। সুযোগ পেয়ে গেলেন যখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারে ২১ অক্টোবর তারিখে 'পৃথ্বীরাজ' নাটকে স্বয়ং নাম—ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁরই উদ্যোগে এ দিন ক্লাসিক থিয়েটারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হল। বাংলা সংবাদচিত্রেরও সেই প্রথম মুক্তি দিবস। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কয়েকটি আকরগ্রন্থে এর উল্লেখই নেই। একজন তো এই কৃতিত্ব জ্যোতিষ সরকারের উপর অর্পণ করেছেন। প্রয়াত বন্ধুবর সিদ্ধার্থ ঘোষ আমাদের সব

সন্দেহের নিরসন ঘটিয়েছেন। ১৩৯২-এর এক্ষণ শারদীয় সংখ্যায় ১৯ অক্টোবর তারিখে 'দ্য বেঙ্গলী' কাগজে মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন তুলে দিয়ে। প্রথম পেশাদারি বাঙালি চলচ্চিত্র প্রদর্শন এইচ এল সেন অ্যান্ড ব্রাদার্স-এ ধরনের বায়োস্কোপ কম্পানির উদ্যোগেই ঘটেছিল।'১৯০৫-এর ২২ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতের ফেস্টুন হাতে শোভাযাত্রার ও টাউন হলের জনসভার দৃশ্য সংবলিত এই সংবাদচিত্রটি দেখানো হল ক্লাসিক থিয়েটারে ২২ অক্টোবর রবিবার সন্ধের সময়। একটি দেখানোর পরেই হরিরাজ ও আলিবাবা মঞ্চস্থ হয়। ২৫ অক্টোবরও এখানে রাত ৯টায় দেবী চৌধুরাণী ও মজা অভিনয়ের সঙ্গে প্রদর্শিত হল 'monstrous meeting at the Town Hall'। ১১ নভেম্বর থেকে বেশ কটা দিন 'হল কি' নাটকের সঙ্গে হীরালালের ওই ছবি দেখানো হয়। একদিন হলে বসে দেখলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, জগদিন্দ্রনাথ রায়, পশুপতিনাথ বসু, কুমার মন্মথ মিত্র প্রমুখ দেশীয় নেতৃবৃন্দ। সুরেন্দ্রনাথ নিজের ছবি নিজেই দেখে উদ্ভাসিত হলেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন অন্যেরাও। এখন আমরা ওই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধার করে দিই সিদ্ধার্থকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে :

JUST READY
Genuine Swadeshi film of our own make
THE
ROYAL BIOSCOPE CO.
Props : H.L.Sen & Bros.
Pioneers and specialists in the field of
animatography. Exhibitors before H.E.
The Viceroy and Lieutanant Governors
of Bengal. Patronised by the nobility and
aristocracy of the country.
Awarded 4 Gold Medals.
Sensation of the day.
GRAND PATRIOTIC FILM
Anti Partition Demonstraion
and
SWADESHI MOVEMENT
At the Town Hall, Calcutta
on the 22nd Sept. 1905.
The great International gathering at the
College Square, the mammoth procession
of students, carrying black flags with
patriotic mottos, the magnificient view of
the TOWN HALL, the vast concourse of
peopleon the stairs of the great Historic
Hall, closing with some of the leaders of
the memorable crusade against the
dismemberment of Bengal and a series of
current appeals to Indians to

Support the SWADESHI movement
BANDE-MATARAM
Faithfully animatographed by
H.L.Sen & Bros.
The only Makers of Bioscope Film
Subjects in India.
H.L.Sen & Bros.
Masjid Baree St. Calcutta.
off 151, Cornwallis Street.''

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন দেশকে অনেক কিছু দিয়েছে। দিয়েছে জাতীয় চেতনা, সংগঠন শক্তি, গড়ে উঠেছে জাতীয় শিক্ষালয়, এনেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কিন্তু সব কি সফলভাবে উদ্‌যাপিত হল? জাতীয় তহবিলের (রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিতে চেয়েছেন বঙ্গভাণ্ডার) বিপুল পরিমাণ অর্থের কি সদ্ব্যবহার হল, কোথায় পাব তার অনুপুঙ্খ হিসেবপত্র। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথমদিনের আবেগে এসেছিল ভাটার টান। নেতাদের অনেকের সাহসে দেখেছি কম্‌তি পড়তে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বয়কট' চাইছিলেন না, সঞ্জীবনী বলল, 'রাখিবন্ধন অর্থহীন'। রাখি যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার সাধনা — সে কথা অনেকেই মানতে পারছিলেন না। এক সময়ে পাঁজিতে রাখিবন্ধন একটা উৎসব বলে পরিগণিত হয়ে বছর বছর উল্লিখিত হচ্ছিল। ১৬ অক্টোবরে — তা-ও ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেল।

১৯১১ সালে 'ছেঁড়া কাপড়ে তালি' পড়েছিল। ভাঙা বাংলা জোড়া লেগেছিল। কিন্তু সালিমুল্লাদের বিদ্বেষের বীজ কি মন থেকে সত্যিই উপড়ে ফেলা গিয়েছিল? গেলে তো ১৯৪৭ হত না। অবনীন্দ্রনাথ একে একসময় 'হুজুগ' বলেছিলেন — সত্যিই কি তাই? এটা কি ন' দিনের তামাশা ছিল? বিনয় সরকার যে বলেছিলেন — 'বাঙালির বাচ্চা আমি, বাঙালির চোখে দুনিয়া দেখি। আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এ একটা খাঁটি যুগান্তর।' এই দেখাটাই আবার সত্যি হয়ে উঠতে পারে না!

বইমেলা
২০০৫

হরিদবরণ ঘোষ

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলনের

অ্যালবাম



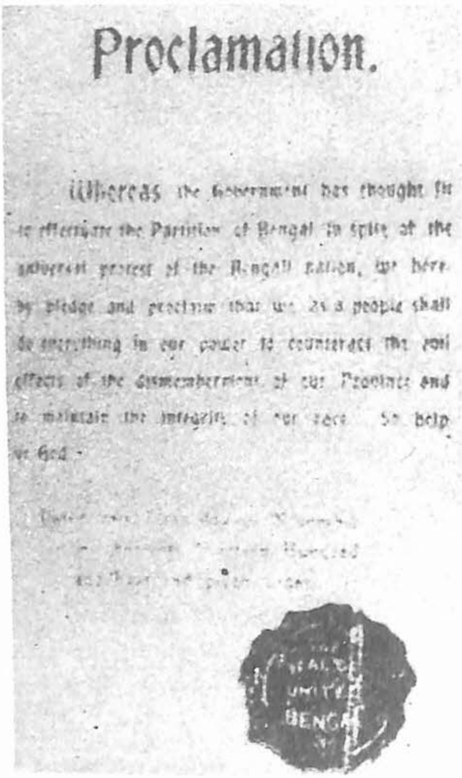
পুলিনবিহারী দাস



লর্ড কার্জন



'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম রেকর্ড



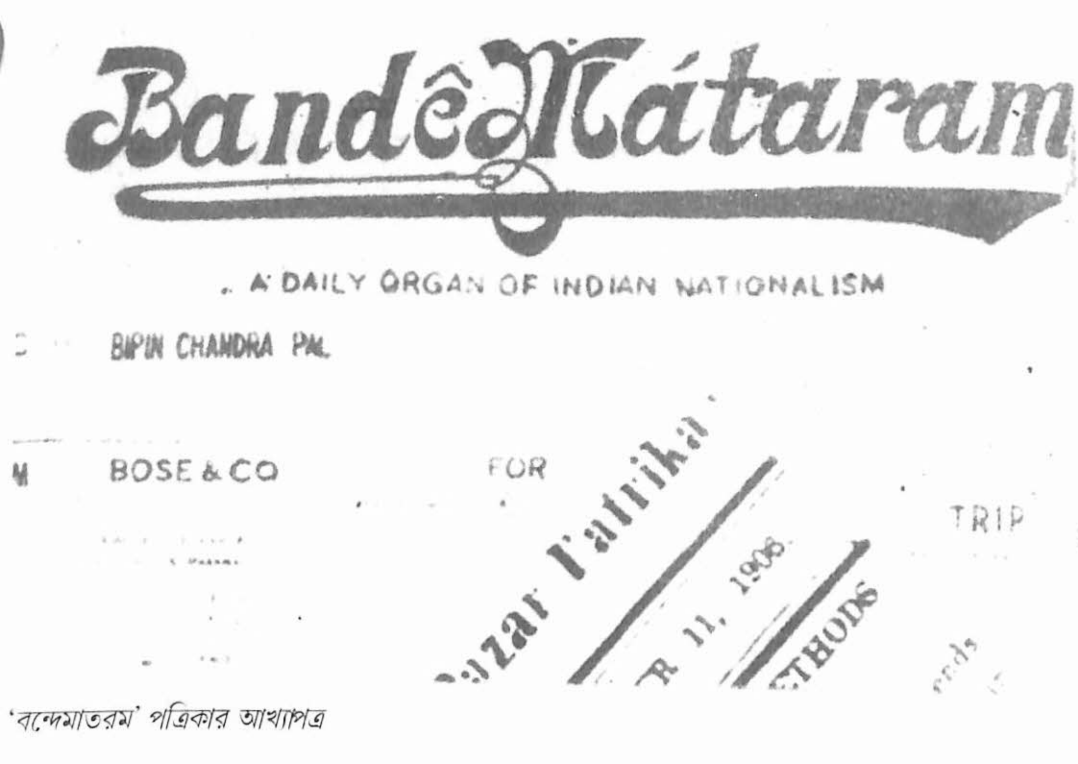
Proclamation.

Whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God.

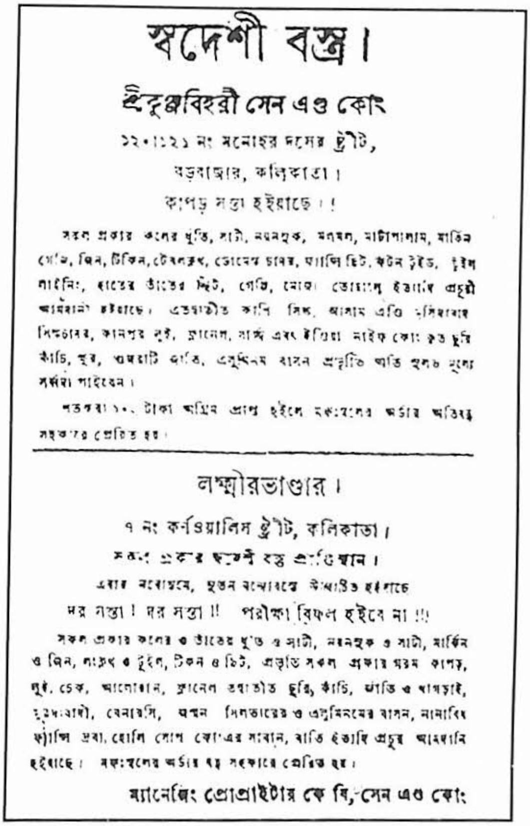
'বঙ্গভঙ্গের' ঘোষণাপত্র



চারণকবি মুকুন্দ দাস



'বন্দেমাতরম' পত্রিকার আখ্যাপত্র



স্বদেশী বস্ত্র।

হিন্দুস্থবিহারী সেন এণ্ড কোং

১২০।১২১ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট,

বড়বাজার, কলিকাতা।

কাপড় সস্তা হইয়াছে।!

সকল প্রকার কলের ধুতি, সাড়ী, নয়নসুক, মলমল, মাটীপালাম, মার্কিন গেঞ্জি, জিন, টিকিন, টেবলক্লথ, তোয়ালে চাদর, ফ্যান্সি ছিট, কটন টুইড, টুইল শার্টিং, হাতের তাঁতের ছিট, গেঞ্জি, মোজা তোয়ালে ইত্যাদি প্রচুর আমদানী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাশি সিল্ক, আসাম এণ্ডি ... সিল্কচাদর, কানপুর বুট, ফ্লানেল, সার্জ এবং ইণ্ডিয়া নাইফ কোং কৃত ছুরি কাঁচি, ক্ষুর, অমরাটি কাঁচ, এলুমিনম বাসন প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা পাইবেন।

শতকরা ১০. টাকা অগ্রিম প্রাপ্ত হইলে মফঃস্বলের অর্ডার অতিত্বর সহকারে প্রেরিত হয়।

লক্ষ্মীরভাণ্ডার।

৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সকল প্রকার স্বদেশী বস্ত্র প্রাপ্তিস্থান।

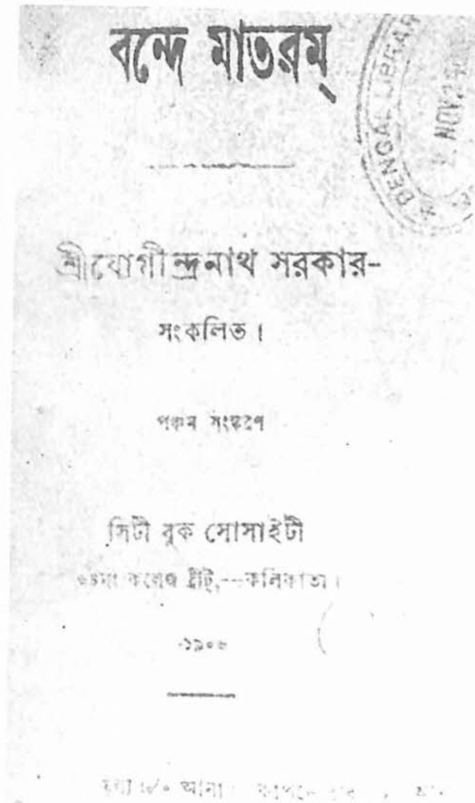
এবার নবোদ্যমে, নূতন বন্দোবস্তে উৎপাদিত হইয়াছে

দর সস্তা! দর সস্তা!! পরীক্ষা বিফল হইবে না!!!

সকল প্রকার কলের ও তাঁতের ধুতি ও সাড়ী, নয়নসুক ও সাটী, মার্কিন ও জিন, লংক্লথ ও টুইল, টিকন ও ছিট, প্রভৃতি সকল প্রকার গরম কাপড়, বুট, চেক, আলোয়ান, ফ্লানেল তদ্ব্যতীত ছুরি, কাঁচি, জাঁতি ও বাগচাই, দুগ্ধপাত্রী, বেনারসি, বম্বে সিলকোরের ও এলুমিনিয়মের বাসন, নানাবিধ ফ্যান্সি দ্রব্য, বেঙ্গল সোপ কোং-এর সাবান, বাতি ইত্যাদি প্রচুর আমদানি হইয়াছে। মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন সহকারে প্রেরিত হয়।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার কে বি,-সেন এণ্ড কোং

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন



বন্দে মাতরম্

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

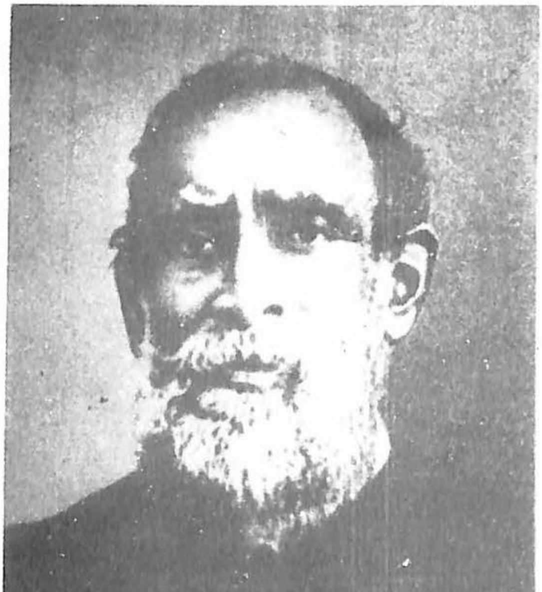
পঞ্চম সংস্করণ

সিটী বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,---কলিকাতা।

১৯০৮

'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থের ৫ম সংস্করণের নামপত্র



সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়



অশ্বিনীকুমার দত্ত



'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যাম্‌ফিল্ড্‌ ফুলারের শাসন-সম্বন্ধীয় ব্যঙ্গচিত্র



'এন্টি সার্কুলার সোসাইটির' সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু



বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চার প্রতিবাদী যুবক।

১. চিত্তরঞ্জন গুহ ২. ব্রজেন্দ্রকিশোর গাঙ্গুলী ৩. মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ৪. জনৈক স্বেচ্ছাসেবক



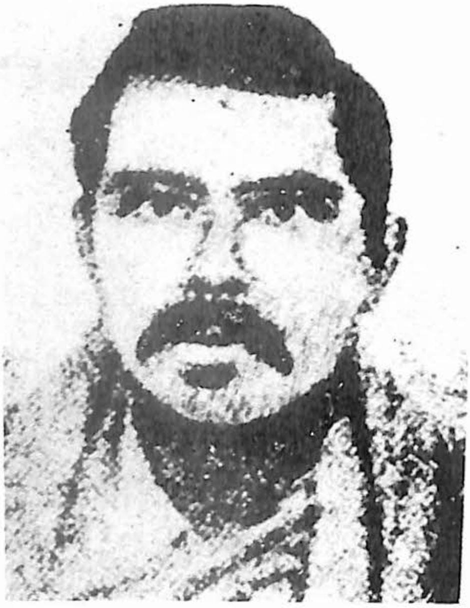
'যুগান্তর'- সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত



মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী



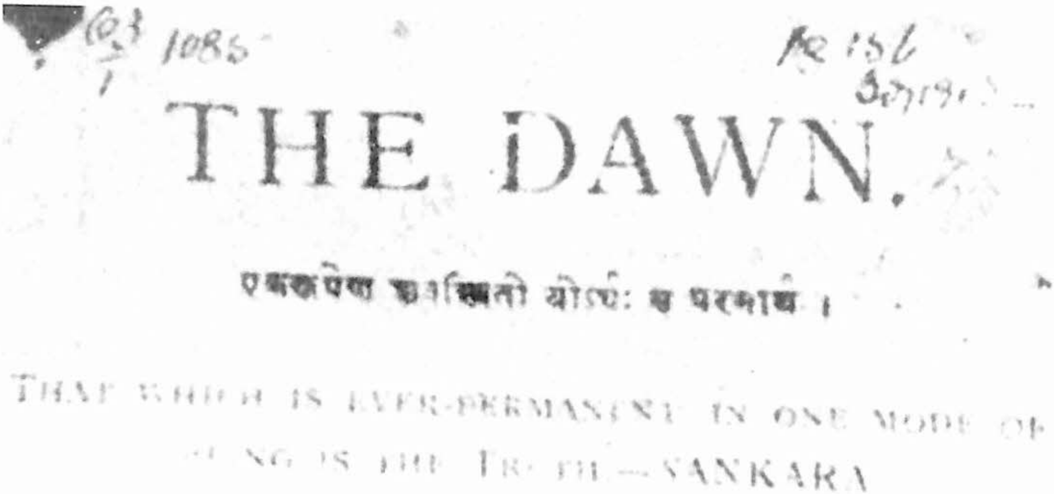
জাতীয় পতাকা (১৯০৬)



উল্লাসকর দত্ত



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



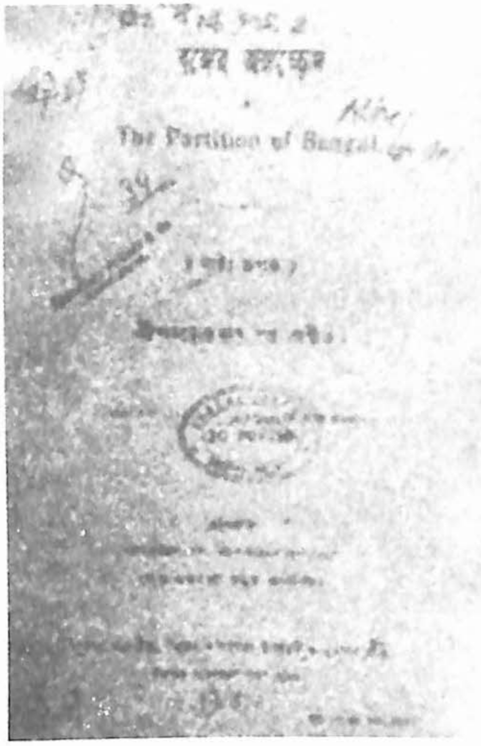
THE DAWN.

THAT WHICH IS EVER-PERMANENT IN ONE MODE OF BEING IS THE TRUTH.—SANKARA

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'ডন' পত্রিকার আখ্যাপত্র



অরবিন্দ ঘোষ



বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে রচিত পুস্তিকা



রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী



রজনীকান্ত সেন



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



অতুলপ্রসাদ সেন



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ



ভগিনী নিবেদিতা



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



সরলা দেবী



মাতঙ্গিনী হাজরা



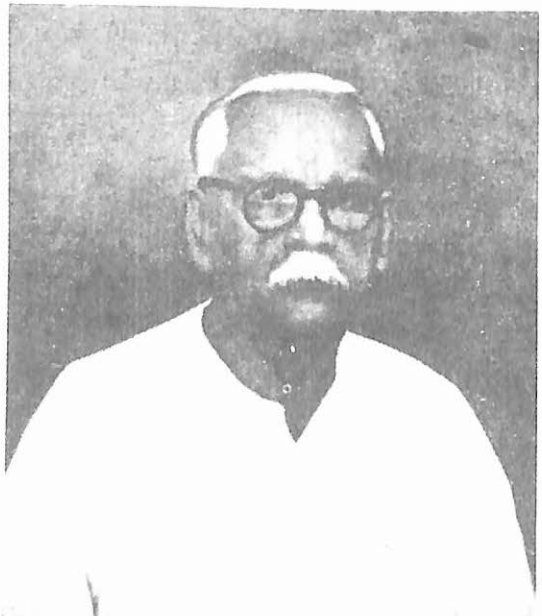
অন্তিম শয়ানে সখা গণেশ দেউস্কর



দেশনায়ক আবদুল রসুল



ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বিপ্লবীনায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ



দেশনায়ক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



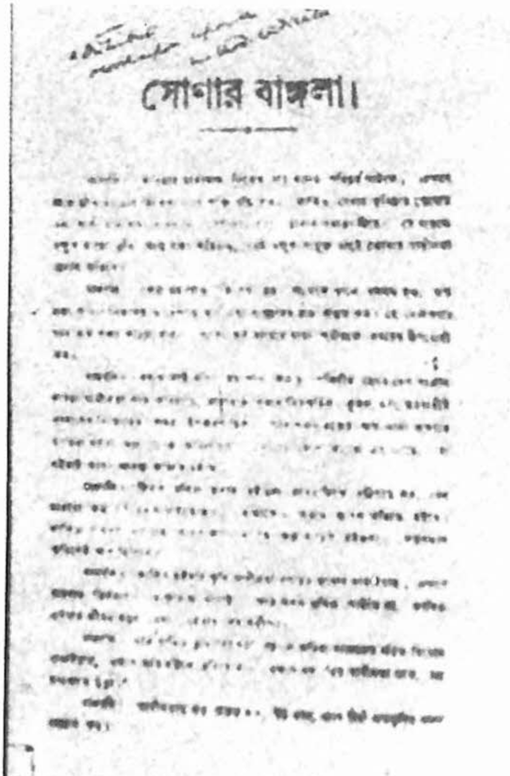
দেশনায়ক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা



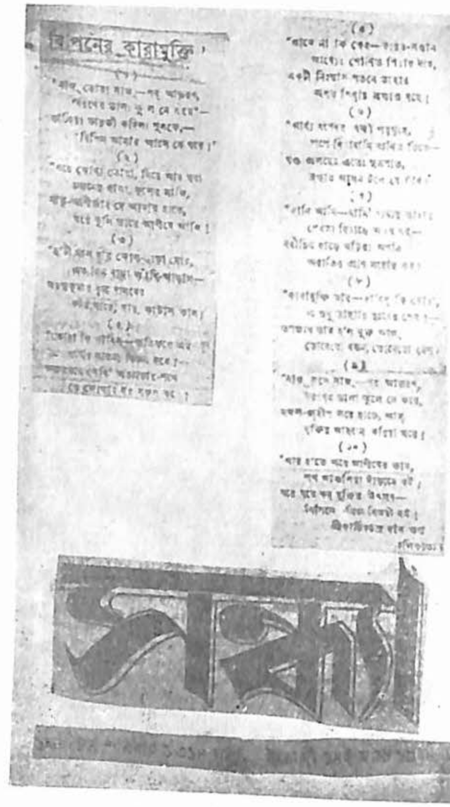
বিপিনচন্দ্র পাল



দেশভক্ত রাজা সুবোধ মল্লিক


সোনার বাঙ্গলা।

নিখিলনাথ রায়ের বইয়ের একটি পৃষ্ঠা


বিপিনের কারামুক্তি

সন্ধ্যা

'সন্ধ্যা' পত্রিকার কাটিং

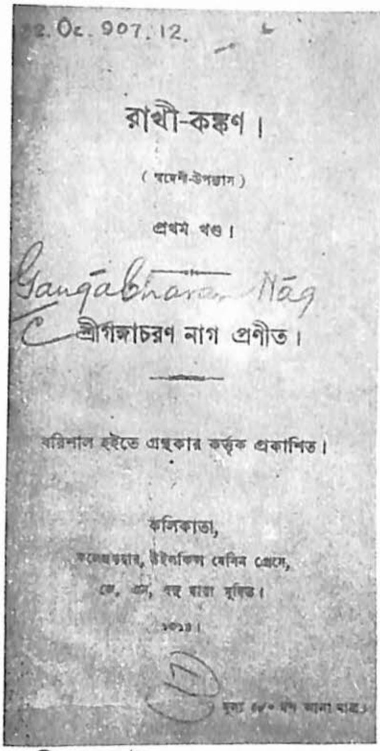

নির্যাতিতে আশীর্ব্বাদ।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত মূল তৈল চিত্র হইতে।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

পুলিশ চিত্তরঞ্জনকে প্রহার করছে, উপরে সিংহবাহিনী ভারতমাতা। 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা' অবলম্বনে 'দেশ' পত্রিকার প্রচ্ছদ



রাখী-কঙ্কণ।

(স্বদেশী-উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড।

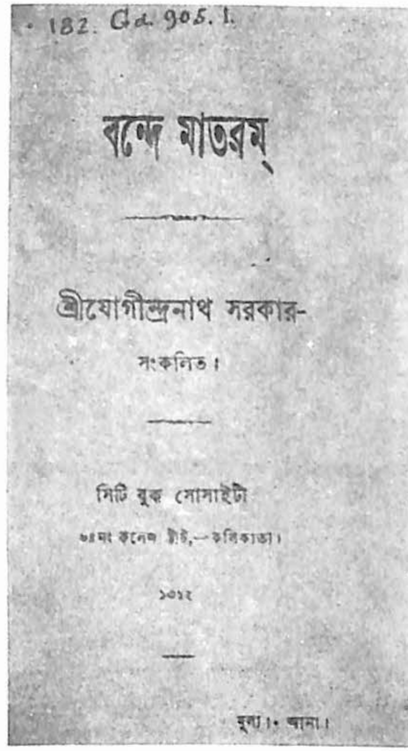
Gangacharan Nag

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত।

বরিশাল হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

'রাখী-কঙ্কণ' উপন্যাসের ১ম খণ্ডের
১ম সংস্করণের নামপত্র



বন্দে মাতরম্

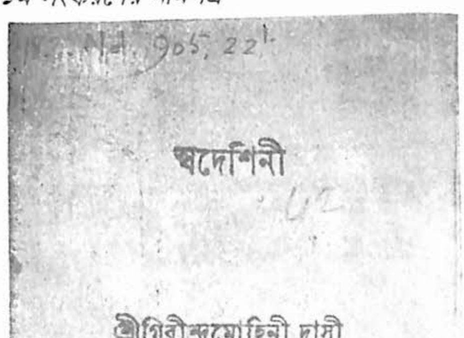
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-
সংকলিত।

সিটি বুক সোসাইটী

১৩১২

মূল্য ।০ আনা।

'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থের ১ম সংস্করণের নামপত্র

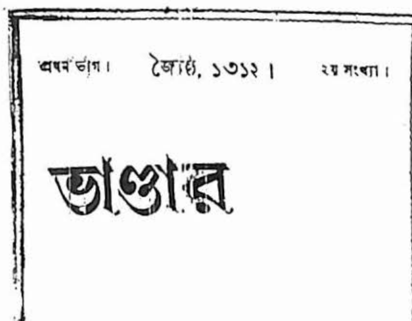


স্বদেশিনী

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

'স্বদেশিনী' কাব্যগ্রন্থের ১ম সংস্করণের নামপত্র


প্রথম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২। ২য় সংখ্যা।

ভাণ্ডার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,
৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

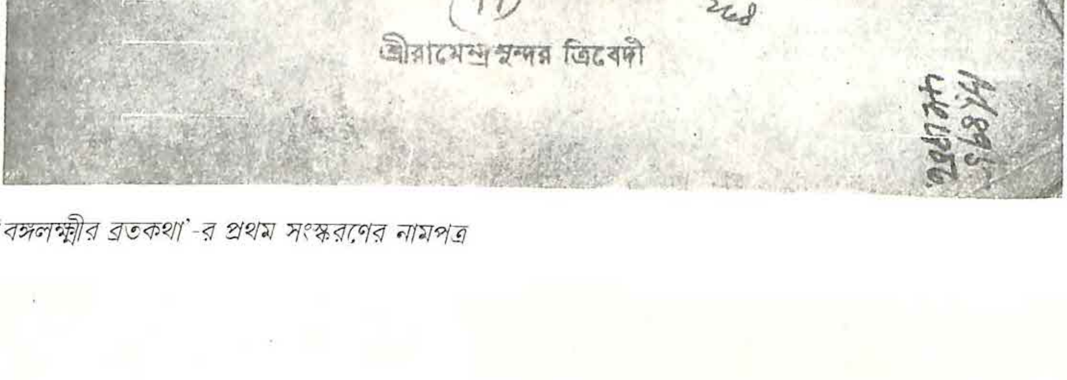
'ভাণ্ডার' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যার
আখ্যাপত্র



বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে প্রকাশিত ফটো-অ্যালবামের প্রচ্ছদ



'যুগান্তর'-এর স্বরাজ সাধনা



'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'-র প্রথম সংস্করণের নামপত্র

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলনের

কবিতা ও গান

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে —
তবে একলা চলরে!
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
~~যদি~~ সবাই করে ভয় ~~(ওরে ওরে ও অভাগা)~~
তবে পরাণ খুলে
ও তুই ~~ওরে~~ মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলোরে!
যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ (না) ফিরে চায় ~~(ওরে ওরে ও অভাগা)~~
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলরে!
যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলরে!

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগীত, ১৯০৫(১৩১২) সালে রচিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে —
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে —
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি।
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে —
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, তোমার কোলে ছুটে আসি।
ধনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিক কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষি।
ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে —
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে —
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।

২.

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি —
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা —
হাতে নাই রে কড়াকড়ি।

ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে —
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।

৩.

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় —
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় —
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে —
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।

৪.

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুই এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি —
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি!
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী —
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

৫.

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে —
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে?
কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে —
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে।
নেব গো মেগে পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে —
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।

৬.

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না।
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে —
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী —
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে —
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না।

৭.

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল —
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ —
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা —
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন —
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

৮.

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান —
তুমি কি এমনি শক্তিমান!

আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান —
তোমাদের এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে —
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান।
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।

৯.

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর —
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার —
তোমারে করি নমস্কার।
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার —
তোমারে করি নমস্কার।
আমার কে-বা আপন, কে-বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার —
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার —
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার —
তোমারে করি নমস্কার।

১০.

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

আজকে যে তোর কাজ করা চাই,   স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই —
এখন   ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের   তন্দ্রা ততই ছুটবে।
ওরা   ভাঙতে যতই চাবে জোরে   গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা   যতই রাগে মারবে রে ঘা   ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা   ভরসা না ছাড়িস কভু,   জেগে আছেন জগৎ-প্রভু —
ওরা   ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের   ধুলায় ধ্বজা লুটবে।

১১.

আজ   সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে —
এবার   যার খুশি সে বাঁধন কাটুক আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা   পরাণ দিয়ে আপন করে   বাঁধব তারে সত্যডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে।
আজ   ধনী গরিব সবাই সমান   আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্, আয় রে লাখে লাখে।
আজ   দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে —
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে।

১২.

ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না।
হবার নয় যা কোনোমতেই হবে না সে, হতে দেব না।
পড়ব না রে ধুলায় লুটে,   যাবে না রে বাঁধন টুটে — যেতে দেব না।
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না।
দুঃখ আছে   দুঃখ পেতেই হবে —
যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হবে।
উপর-পানে চেয়ে ওরে   ব্যথা নে রে বক্ষে ধরে — নে রে সকলে।
নিঃসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তাঁরে তোদের বেদনা।

১৩.

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে।
জানি নে তোর ধনরতন   আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল   গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো   প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

১৪.

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমরা নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব ‘জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ’ —
তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠবে আপনি বেজে সুধামধুর
মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে।

১৫.

ও আমার দেশের মাটি, তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।
তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার ’পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা —
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে —
ও মা বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।

১৬.

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে — ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে — ওরে ভাই।
যা তোমার আছে মনে সাধো তাই পরানপণে,
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে — ওরে ভাই।
একই পথ আছে ওরে, চল সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারই পিছে চলিস নে — ওরে ভাই!
থাক্-না তুই আপন কাজে, যা খুশি বলুক-না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় জ্বলিস নে — ওরে ভাই।

১৭.

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে।
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে নড়ে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে।
সময় হল, সময় হল — যে যার আপন বোঝা তোলো;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে —
একসাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে।

১৮.

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই।
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক —
বারেক এদিক বারেক ওদিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই।
মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন —
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা —
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই।

১৯.

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে —
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে —
সহজ পথে চলব ভেবে পাঁকের 'পরে পড়ব না।
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে —
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না।

২০.

এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ।
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে —
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য।
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে —
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো।

স্বদেশিনী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১.

আশীর্বাদ

এস শিরে লয়ে আশিস মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।
ভেরি শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি
জাগায়ে নিদ্রিতে কাঁপায়ে অবনী
নবীন আশার রোলে
দ্রুত আয়-আয়-আয় চলে —
যেমন ঝটিকা ধায়।
(নহে মলয়ার বায়)
যেমন জ্বলিয়া শিখা
মুহূর্ত-মাঝে বিনাশে নগর-গ্রাম ;—
শুধু ধূমে হয়নাকো কাম।
তাই এতদিনে যদি ফুটেছে নয়ন
মনের মাহাত্ম্য কর না নিধন
কারো কাছে প্রভু;— প্রাণ কিবা ধন —
যদি স্থাপিবে জগতে বাঙালি নাম।

২.

রাখী-সংক্রান্তি

আজি কি শুভদিন আইল
চির মনোরথ পূরিল;
মা তোমার কোটি-কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ-নিদ্রাভরে বিচেতন
আজিকার নব-তপন-কিরণে
সবে আঁখি মেলি জাগিল।
পূজিতে তোমার পুণ্য-চরণে
সমবেত সবে দেখ একসনে
মা-মা-মা-মা বলে বিদারি গগনে
হের আঁখি নীরে ভাসিল।
কই মা কোথা মা রাজ-রাজেশ্বরী

কি ভ্রমে আছিনু তোমারে পাসরি —
কোলে নে মা নে মা আর ভুলিব না
বলিয়া চরণে লুটিল।

৩.

অঙ্গচ্ছেদ

কে বলে ভেঙেছে অঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা, —
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ-হৃদয়ে তরুণ আশা।
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর
নিরাশ বিলাস-চোর
ঐ উদিত সুখের ভোর — কাকলী নবীন ভাষা,
কে বলে ভেঙেছে বঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা।
তবে ঘৃণিত বিলাসবাস চরণে দলিয়া সই
কল্যাণী নবীন সাজে সাজালো মঙ্গলময়ি।
দাও প্রবাহিত ক্ষতে অমৃত-প্রলেপ-স্নেহে,
কোমল শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে;
ধোয়াও নয়ন-নীরে মায়ের বেদনা অই,
দেহ শক্তি সঞ্চারিয়া অঙ্গে-অঙ্গে শক্তিময়ি!
দেহ-দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ-প্রাণে নব বল,
দুখিনীর দুখনীর মুছাইতে চল-চল।
শুত সুত শত সুতা
হইলে সেবা-নিরতা
মুহূর্তে দূরিবে ব্যথা, আসিবে নবীন বল,
মায়ের আশিসে হবে গৃহে-গৃহে সুমঙ্গল।

৪.

রাখীমন্ত্র

(১)

আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ,
হরিষে-বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গল-রাখী ;
পূতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভুজমূল,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে; হিন্দু-মুসলমান ভুলি;
যে আশায় — দৃঢ়তম — অটুট রহুক
সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন; এ প্রার্থনা চির, —
কর্মক্ষেত্রে যেন এই পবিত্র বন্ধন
দানে সদা বজ্র-শক্তি ও বাহুযুগলে।

(২)

অনুপমা আর্যবামা করহ স্মরণ!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ।
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমনে জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন;
ব্রতশীলা আর্যবালা আছিল কেমন!
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
ফেরে শুনে আর্যসতী
করেছিল পুরদ্বারে অর্গলযোজন!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ!
সেদিন স্মরণ করে
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে,
ঘরে-পরে সমাদরে করহ প্রেরণ
সুপবিত্র স্নেহসূত্র রাখীর বন্ধন।
ভুলি হিন্দু-মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান;
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র-মূলে বিরাট জীবন।
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ!

৫.

বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান

ঐ ভরা গাঙে এসেছে জোয়ার
ও ভাই ঝট চলে আয়, আয় কে যাবি পার।
ওঠে উঠুক বাতাস ভয় কি তাতে
এবার পাকা মাঝি আছে সাথে
তার আশার পশরা মাথে ওরে দুগুণো ব্যাপার —
ঝট চলে আয় — আয় কে যাবি পার।
'বদর' বলে নৌকা খুলে সাহস-পালে যাব চলে
দাঁড়িয়ে আর থাকব না কূলে লেগেছে বেজার।
ওরে দুপুর-রোদে ফাটিয়ে মাথা সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা
মরে অনাহারে বৃদ্ধা মাতা — বলবো কত শুনবি কি আর;
ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে ঘুরে বেড়াই দুয়ার-দুয়ার।
এবার পণ করেছি শোনরে মিতে ঘুরব না আর পথ-বিপথে
পাবই অন্ন আধেক রাতে — চিনির বলদ নয়কো এবার!

মুকুন্দ দাস

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।।
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী,
জগৎ ভ'রে আছে জানা।
চটক্‌দার কাঁচের বালা ফুলের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।।
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,
কোটী টাকার কম হবে না।
পুঁতি কাঁচ ঝুটো মুক্তায় এই বাংলায়,
নেয় বিদেশী কেউ জানে না।।
ঐ শোন্ বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যা।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।।
আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না।
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা যে তোরা চিনলি না।।

বঙ্গ—৫

রজনীকান্ত সেন

১.

সংকল্প

মুলতান — গড় খেম্‌টা

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, — তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই;
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

২.

তাই ভালো

জংলা—কাহারোঁয়া

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নেই, সে বড় অপমান;
মোটা হোক, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় পরব না আর যেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পরলে কেমন সাজে;
দেখ্‌ত পর্‌লে কেমন সাজে!

ও ভাই চাষি, ও ভাই তাঁতি, আজকে সুপ্রভাত;
কসে লাঙল ধর ভাই রে, কসে চালাও তাঁত।
কসে চালাও ঘরের তাঁত!

৩.

আমরা

মিশ্র বারোঁয়া — কাওয়ালী

আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে পর্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেন্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা রব কি উপোসি ঘরে শুয়ে?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন;
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙে,
কিন্‌ব না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙে;
থাক্‌লে, গরিব হয়ে, ভাই রে, গরিব চালে,
তাতে হবেনাকো মান খাটো।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

১.

প্রসাদী সুর

এস দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।
সবার, আহার বিহার বিলাস বেশে।।
দেখ দেখি, মীলে আঁখি, যত ভিন্ন দেশী এসে,
দেশের যা ছিল ধন কচ্চে হরণ, জাহাজভরে এক নিমেষে।।
গৃহ ধনধান্যে ভরা, আমরা মজি নিজের দোষে।
আমরা, কিছুই না পাই, হেলায় হারাই নয়নজলে বেড়াই ভেসে।।
সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি, অনভিজ্ঞ ধল্লে ঠেসে।
আসে ত্যাগ স্বীকারের নামেই বিকার, দংশে যেন আশীবিষে
বসন ভূষণ, যা প্রয়োজন, পান ভোজন নয় আত্মবশে!
যেমন বাসা থাকতে বাবুই ভিজে, নিজের উপায় দেখে না সে।।
ধূতি চাদর ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে দেখ্ সব সর্ব্বনেশে।
ভরে, জাহাজগুলো তোদের তুলো তোরাই কিনিস সেই জিনিষে।।
যাদের তুলো তাদের দিয়ে লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।
আমরা অলস হয়ে চেয়ে আছি বিদেশবাসীর দয়ার আশে।।
লজ্জা বারণ শীতের দমন, রেশম পশম পাট কাপাসে।
বল, কিসের কসুর, খাবার প্রচুর, কি না ফলে ক্ষেতের চাষে
মাছ মাংস ফল, আছে সকল, সব পাওয়া যায় বিনা ক্লেশে
নদী সরোবরে স্নিগ্ধ করে, মিষ্ট জলে তৃষ্ণা নাশে।।
গুড় চিনি আর মধু ফেলি লোফ সুগারের মজি রসে!
আছে গোয়াল পোরা বোকনা গাভী, কৌটাতে দুধ তবু আসে
বিশকোটী শ্রমজীবী হেতা, পশু পুষ্ট মাঠের ঘাসে।
লোকে অল্পে তুষ্ট, সহে কষ্ট, বাঁকায় না মুখ অসন্তোষে
তবু কেন ভিক্ষা করি বিদেশবাসীর দ্বারদেশে?
কেবল স্বভাব দোষে অভাব ভাবি, নাহি দেখি কি হয় কিসে
কাঞ্চন বিলায় দিয়ে, কাচ খুঁজি হায় পরের বাসে।
পরে, নাহি দিলে, মুখে তুলে, দিন কেটে যায় উপবাসে।।
দিয়ে, সোনা হীরের খনি আমদানি কাচ রাঙ্গতা সীসে।
যত, বিদেশবাসী নেযায় শস্য, আমরা আছি সমান বসে
চারিদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যাও আবেগ বশে।
সবে করিলে পণ অধঃপতন হবে দমন অনায়াসে।
নিজের বলে হওনা বলি আসিবে অরি কোন সাহসে?
যখন ঘরের পেলে কার্য্য চলে, কেন যাবে পরের পাশে।।
হ'য়ে যদি লুপ্ত শক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে।
জেনো, সবার দুঃখে অধোমুখে শিয়াল কুকুর কাঁদবে শেষে।।

আশার আলো, সামনে জ্বাল, তুচ্ছ ভাব ভোগ বিলাসে।
আজি, কয় বিশারদ, যাবে বিপদ হতাশবাণী উড়াও হেসে।।

২.

বাউলের সুর — আড়খেম্‌টা

আমার স্বদেশবাসী, যতই দোষী, বলুক পরে।
উচাটন, তবু মন, তারই তরে।।
ও তার, মধুর বচন — (ভাইরে) করিলে শ্রবণ
শিহরে শরীর পুলক ভরে।। (ওরে ও ভাই)
তার — শয়ন, স্বপন — চাহনি, চলন
মনে হয় যেন নিজের মত —
হেরি, শিরায় শিরায় রুধির ধারায়
বহে একই স্রোত — স্তরে স্তরে।।
তার, নদী জল স্থল অনিল অচল
জনম অবধি আমার আছে —
তবে, তার দোষ দেখে তারে ফেলে রেখে
থাকিব কি সুখে জীবন ধরে'। (ওরে ও ভাই)
আমার, হোক্ মত ভেদ — বাস-ব্যবচ্ছেদ
ভবনে বিরোধ — পদে পদে —
তবু, তারে প্রাণ চাবে, জীবন জুড়াবে
সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে। (ওরে ও ভাই)
যদি, দূর দেশে যাই — দেখিবারে পাই
না চিনেও তায় সুধাই কথা —
তাই বিশারদ কয় সেকি পর হয়
যারে দেখে মন এমন করে।।

৩.

হাম্বির — কাওয়ালি

(অস্থায়ী)

নবীন এ অনুরাগ রাখ রাখ মনে রাখ।
উঠেছ আবেগ ভরে দুদিনে তা ভুলো না কো।।

(অন্তরা)

খুলিয়া মুদিত আঁখি, নবভাব মনে রাখি
বারেক জেগেছ যদি — এই ভাবে জেগে থাক।।

(সঞ্চারী)

যে শিখা জ্বলেছে প্রাণে বিন্দু বিন্দু স্নেহ দানে
দীপ্ত রেখো — সুপ্ত হয়ে নিবায়োনা তায় —

(আভোগ)

এ শিখা নিবিলে পরে, জ্বলিবেনা যুগান্তরে
বিশারদ অন্ধকারে তাহারে আলোকে ডাক।

৪.

গৌরী-ঝাঁপতাল

আমার বঙ্গের ফুল শোভার আধার।
কি ফুল পরের লব ভুলে আপনার?
আমারে ভুলাতে তোরা ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা
তুলে এনে কত শোভা দেখাইবি আর?
কত ফুল্ল শতদল নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল
বিদেশের কোন ফুল সমতুল্য তার?
মল্লিকা মালতি গন্ধ মকরন্দে অলি অন্ধ
ডেলিয়া কি পল্‌নিরো কে তুল্য তাহার?
সাজাইয়া থরে থরে অর্কিড কাচের ঘরে
টবে ফুটাইয়া ফুল দেখ কি বাহার?
নীল চন্দ্রাতপ তলে কৌমুদী মাখিয়া দলে
মৃদুল সমীরে দোলে কুসুম আমার।
অশোক বকুল মম সুধাময় নিরুপম
কামিনী চম্পক কুন্দ কুমুদ কহ্লার।
আমার ফুলের কাছে পরের কি ফুল আছে?
কেন তবে হবে মনে লোভের সঞ্চার?

৫.

বাউলের সুর

ঐ যে জগত জাগে স্বদেশ-অনুরাগে।
কে আর, ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গভিন্ন নিদ্রামগ্ন দিবা ভাগে?
ভাঙবে নাকি এ কালনিদ্রা, রইবে এ ভাব যুগে যুগে?
পেয়ে পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ,
এ অবসাদ কোন্ বিয়োগে?
থাক্‌তে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ দাগা বুলায় পরের দাগে,
করে গৃহশূন্য পরের জন্য লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে!
স্নিগ্ধ কর্‌তে দগ্ধ উদর গোলামী চায় সবার আগে,
সদা গোরার দু'পায় তৈল যোগায়, তাও বাঙালীর ভাল লাগে!
আর কি কারণ জীবন-ধারণ, প্রাণ ধরে ত কুকুর ছাগে,
যদি দেশের দশা এমনি থাকে, বিলম্ব কি তনু ত্যাগে?
দেশের শিল্পে জলাঞ্জলি, ভেকের ভোজ্য যোগায় নাগে!
চলে ব্যবসা অবাদ, নইলে বিবাদ, কতই দ্রব্য দেয় সোহাগে!
পরের পদে তোষামোদে মর্মব্যথা কর্মভোগে,
বল কোন্ দেশের আর দশা এমন জীবন ধারণ যুগে যুগে!
এ বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে আমরা অন্ধ নেত্ররোগে!
ও ভাই! আশার পথে যেতে নারি, আর সকলে চল্‌ছে বেগে!
সমুন্নত সর্বজাতি, আমরা কেবল অধোভাগে,
এবার মন্ত্রসাধন করেছি পণ ছাড়্‌ব না তা প্রাণ বিয়োগে।
প্রাণে যখন আবেগ আসে, শত্রু ভাযে "হুজুগ চাগে,"।
বিশারদ কয় সেই ত সময়, কার্য সার সেই সুযোগে!

৬.

বাউলের সুর

মাগো! যায় যেন জীবন চলে।
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম্" বলে!
(আমার) যায় যেন জীবন চলে।

(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে —
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

(আমার) মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণতলে।
যদি, সইতে নারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হব কোন্‌কালে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

লালটুপি কি লালকোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত,
পাশব বলে দিক্ জেলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

আমায় বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে,
ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে!

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।

বল,　　লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
　　　　সে মায়ের নাম স্মরিলে?
(আমার)　যায় যাবে জীবন চলে।

বিশারদ কয়, — বিনা কষ্টে
　　　　সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত,　　অধম হয়ে সইতে রাজী
　　　　উত্তমে চাও মুখ তুলে।
(আমার)　যায় যাবে জীবন চলে।

৭.

বাহার — ধামার

দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি! যুগান্তরে,
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে।
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি, শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি!
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড দৈত্যপদ-দম্ভ-ভরে!
এ যুগে আবার মা গো! দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে!
এস মা! ত্রিতাপহরা! স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা,
শুম্ভ নিশুম্ভের দম্ভে সর্বনেত্রে অশ্রু ঝরে।
দশ দিকে হর-প্রিয়া! দশ ভুজ প্রসারিয়া —
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে!
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি —
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে।
শুনে ভয়ঙ্কর শব্দ ত্রিভুবন হ'ক্ স্তব্ধ,
বিশারদ ওই পদ কাতর হৃদয়ে স্মরে।

৮.

বাউলের সুর

শুন্‌রে　　ভাই দেশের দশা কি দুর্দ্দশা
　　　　গেল রে দেশ রসাতলে।
হয়েছে　　দারুণ আকাল নাই কালাকাল
　　　　ফরিদপুর আর বরিশালে।।
শিশুরা　　দারুণ ক্ষুধায় কেঁদে লুটায়
　　　　কি খাব কি খাব বলে।
হারায়ে　　বুদ্ধি শুদ্ধি ইমানদ্দি
　　　　কেটেছে তার কোলের ছেলে।।
ঘরেতে　　নাইকো মুঠি দিবে দুটি
　　　　পরিজনের মুখে তুলে।

করেছে আত্মহত্যা হায় অগত্যা
কৈলাস এক কামারের ছেলে।।
উঠেছে ঘোর হাহাকার রক্ষা নাই আর
মরবে কত দলে দলে।
ওরে ভাই যার আছে প্রাণ দাও কিছু দান
দেশের এমন বিপদ কালে।।

৯.

বাউলের সুর

ভাই সব দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হ'তে।
আমাদের বেচাকেনা, পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে।।
আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন এনামেলে, মাথা খেলে
কলাই করার ব্যবসাতে।।
এখানে পরশ পাথর পায় না আদর
চটা উঠ্‌ছে পেয়ালাতে।
যত ঠুনকো পলকা, দরে হালকা
দ্বিগুণ মূল্য পালটে নিতে।।
ঘরে, নাইকো আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে।।
ছেড়ে, পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে মরে,
কার্য সারে কোন মতে।।

১০.

কালাংড়া — কাওয়ালি

(অস্থায়ী)

নয়ন মুদিত মোহে ঘুমঘোরে অচেতন।
সহসা কেমনে আজি; করি আঁখি উন্মীলন।।

(অন্তরা)

অলস অবশ অঙ্গ হবে না এ মোহ ভঙ্গ —
কে যেন স্বপনে শুনি, করিতেছে আবাহন।

(সঞ্চারী)

আঁধারে আবৃত বিশ্ব, অবনী না হয় দৃশ্য
"জাগ জাগ দেখ চেয়ে" — কে বলিছে অই —

(আভোগ)

কেন মা জনমভূমি　　অরোধে জাগালে তুমি
ছিন্নভিন্ন কুসন্তানে কেন কর সম্ভাষণ।

(সঞ্চারী)

স্বপনে শুনিয়া স্বর　　শিহরিল কলেবর
শিরায় শোণিতধারা বহিল আবার —

(আভোগ)

ঘুমের এ ঘোর হ'তে　　জাগাইলে যদি সুতে
শক্তি দেহ সুপ্ত দেহে কর মৃত-সঞ্জীবন।।

১১.

ললিত — যৎ

এই দ্বারদেশে　　এসেছে ভিখারী
কহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়।
স্বদেশ-সেবক　　এ সব যাচক
বঞ্চিত কোরো না করুণা-কণায়।।

ভ্রমে ভিক্ষা করি এ সব পথিক
সামান্য কামনা — চাহে না অধিক
ধন রত্ন আশে আসেনি সকাশে
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায়।।
শক্তি অনুসারে পুরাইও সাধ
নাহি জুটে যেন হরিষে বিষাদ
বড় আশা ক'রে আসিয়াছে দ্বারে
করিলে হতাশ যাইবে কোথায়?
তব দেশবাসী এ যাচকগণ
নগরে নগরে করিবে ভ্রমণ
পুরালে বাসনা বিফল হবে না
হইও সুজন সুপথে সহায়।।
চারু কারুকার্য তব পরিজ্ঞাত
স্বদেশ-সম্ভূত শিল্প কৃষিজাত
সে সব সন্ধান করিলে প্রদান
করিব প্রচার তোমারি কৃপায়।।
প্রতিবেশী শিল্পী যদি কেহ থাকে
কহ কি উপায়ে পালিবে তাহাকে
কি ধন সে জন করে উপার্জন
কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায়।।
এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার

বিদেশীয় কিছু কোরো না গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়।।
বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও
কোরো না বিমুখ মুখ তুলে চাও
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ
না করিলে বল কি হবে উপায়।।

১২.

ভৈরব — একতাল

সেই ত রয়েছ মা তুমি।
ফল-ফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি।।
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী।।
তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ-ঝঙ্কার;
সেই ত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন
অধঃপথগামী।।
কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন।
ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি।।
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পরপদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধুলাতে লুটায়।
বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে
তার আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী।।

১৩.

আশোয়ারি — ধামার

(অস্থায়ী)

ছিন্নঅঙ্গ হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল,
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল।

(অন্তরা)

কি ফল বিফলে কাঁদি,
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল।

(সঞ্চারী)

খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এ দেশ
হউক ভূধরে সিন্ধু সন্নিবেশ,
কীর্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ)

মিলাইতে পারি যদি মনে মন
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন?
পর-করুণার আশায় আশায়
জীবন যাপনে ফলিবে কি ফল?

(সঞ্চারী — ফেরতা)

বলিব বদনে — জয় জন্মভূমি
শুনিব স্বপনে — জয় জন্মভূমি
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে আগ্নেয় অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া — জয় জন্মভূমি!

১৪.

কীর্তনের সুর

এক দেশে থাকি, এক মাকে ডাকি
এক সুখে সুখী ছিলাম সবে।
আজি অকস্মাৎ অশনি সম্পাত!
সমান বিষাদে কাঁদিতে হবে।
কে করে শ্রবণ, অরণ্যে রোদন?
কে চাহে তুষিতে তাপিত জীবন?
ব্যথিত-বেদন সমান রবে।।
কিন্তু ব্যবচ্ছেদে করিব না খেদ
মিলালে হৃদয় কি হবে প্রভেদ?
মনের মিলন কে ভাঙ্গে কবে?

রাজবলে যদি নাম ভিন্ন হয়
সে ভেদে কি আর ভাঙ্গিবে হৃদয়,
মিলে ভাই ভাই রহিব ভবে।।

১৫.

যোগিয়া-ভৈরবী — একতালা

আসিলে কি অন্নপূর্ণা অন্নহীন দেশে?
মা তোমার একি রঙ্গ,
যাতায়াতে ছত্রভঙ্গ
দেখা দিলে দয়াময়ি! কেন হেন বেশে?
অন্তরে কি ভয় পেয়ে
আছি তব মুখ চেয়ে
কাতর হৃদয়ে কাঁদি কিসের উদ্দেশে,
সে সব মনের কথা
সে সব প্রাণের ব্যথা
অন্তর-যামিনী তুমি জান সবিশেষে।
তবে মাগো কেন আজ
হেন ভয়ঙ্কর সাজ?
ভীত চিত্তে এ আশঙ্কা সঞ্চারিলে এসে?
শক্তিরূপা! দেহ শক্তি
ভক্তিহীনে দাও ভক্তি
অধীর কোরো না আর শক্তি সমাবেশে।

১৬.

সংকীর্তন

(বল) ভায়ে ভায়ে মিলবে কবে?
শুধু বিবাদে কি কাল কাটাবে?
এক রাজার যে সবাই প্রজা।
দণ্ডবিধি সবাই সবে।
[বিধি ভিন্ন নয় — বিধি সবার সমান]
সবার সমান স্বত্ব সমান স্বার্থ
জেনেও মত্ত ভিন্নভাবে।। (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্ন জনের ভিন্ন রুচি,
এ কথা কয় সব মানবে।
[এ ত সবাই বুঝে, সবাই জানে]।
ও সেই ভিন্নরে অভিন্ন কোরে
মিলায় যে সেই মানুষ তবে।। (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন কর্মী
সবাই সমান প্রজা-ভাবে।
[রাজার কাছে নাই ত প্রভেদ]।

শিখ স্বদেশ-ভক্তি অনুরক্তি
সমান শক্তি সবাই পাবে।। (ওরে ওরে ও ভাই)
মিলন হলে জন্মভূমির
এ দশা আর কদিন রবে?
[যদি সবার মনে ঐক্য থাকে]।
রাখে, মত্ত করী বদ্ধ করি
তৃণের মিলে দেখ ভেবে।। (ওরে ও ভাই)
মিলনের বিলম্ব হলে
কুফল ফলবে দেখতে পাবে।
[বিলম্বে হয় কার্যহানি]।
জেনো — আবাদ নইলে সোনার জমি
কাঁটায় কাঁটায় ভরে যাবে।। (ওরে)
অন্ন বিনা শীর্ণ তনু
কেবল তোদের মিল অভাবে।
[ও তাই নিত্য অভাব নিত্য দুঃখ]।
এখন্ অন্নশূন্য হিন্দুস্থান এই
পূর্ণ যে "হা অন্ন' রবে।। (ওরে)
অত্যাচারে নাইকো বিচার
করের ভারে কাতর সবে।
[করভার কি আর সওয়া যায়]।
ও ভাই, হবে কি আর এর প্রতিকার
এ সব যদি সও নীরবে? (ওরে)
নিজে না মিলিলে কিরে
দুখের কথা পরে কবে?
[পর কি জানে পরের বেদন]।
মিল্‌লে — যাবে কষ্ট, বিপদ নষ্ট
ন্যায়ের রাজ্যে হবেই হবে।। (ওরে)
দ্বন্দ্বে বাড়ে নিরানন্দ
জেনে কেন ভুলচো তবে?
[ঘরে ঘরে বিবাদ কেন]?
ও ভাই — কয় বিশারদ যাবে বিপদ,
ভিন্ন ভাবটি ভুলবে যবে।। (ওরে)

১৭.

ভীমপলশ্রী — একতালা

জাগো জাগো বরিশাল
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল।।
প্রাণ দিয়ে হুতাশনে
দেখাও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনক-কান্তি — সৌর করজাল।।

বিশুদ্ধি কালিমা কত
হবে এবে পরীক্ষিত
আজি পরীক্ষার দিনে ঘুচাও জঞ্জাল।।
দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কতকাল।।
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙ্গাল?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে ইহ-পরকাল?
ভুলিও না কোন ভয়ে
থাকিও যাতনা সয়ে
ঝুলুক বঙ্গের শিরে খর করবাল।।
জন্মে মৃত্যু অনিবার্য
মানুষ করিবে কার্য
ভয়ে ভঙ্গ দেয় শুধু — নীচ ফেরুপাল।।

১৮.

পূরবী — আড়াঠেকা

(অস্থায়ী)

হতাশ হয়ো না প্রাণে অনুচিত নির্যাতনে।
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দোষ মনে?

(অন্তরা)

গুর্খা দেখে মূর্খ যত
কি আতঙ্কে অভিভূত
উচ্চশির অবনত
এত শঙ্কা কি কারণে?

(সঞ্চারী)

যার অঙ্কে জন্ম নিলে
যার শস্যে যার জলে
রবিশশী করজালে
ধরেছ শরীরে —

(আভোগ)

তারি ধন তারে দিতে
তারি তরে কষ্ট পেতে
মাটীতে মাটীর দেহ
এত শঙ্কা সমর্পণে?

(পুনঃ সঞ্চারী)

স্বর্গাদপি গরীয়সী
মুখে বল ঘরে বসি
ভয়ে ম্লান মুখশশী —
দেখিলে বিপদ।
(পুনরাভোগ)
একদিন মৃত্যু হবে,
নিত্য ভবে নাহি রবে —
কাঁপে বক্ষঃ কেন তবে
মাতৃ-নাম সম্বোধনে?

১৯.

ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্‌।
খাক্‌ মিট্টী জৌহর্‌ হোতী সব্‌, জৌহর্‌ হ্যায়্‌ জঞ্জাল্‌।
ঘর ছোড়্‌কে সব্‌ পর্‌কো সেবে, ভাইকো দেৎ ভাগাই।
সাগর্‌ পার্‌ সব্‌ ধন্‌ গয়া, আউর্‌ ঘর্‌মে লছমী নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়্‌সা, সোনা চান্দী শেষ্‌।
অব্‌ ইনামেল্‌ গিল্‌টী শীসা, ঘর্‌ ঘর্‌মে প্রবেশ্‌।
পাট্‌ রূই সব্‌ এহী সে জাকর্‌ জাহাজ ভর্‌কে আতে।
দেশ্‌কে আদ্‌মী মুরখ্‌, বন্‌কর্‌ চান্দী দেকর্‌ লেতে।
গৌ শূয়র্‌কে লহুসে শোধিত্‌, চিনি নিমক্‌ খাওয়ে।
সফেদী দেখ্‌কর্‌ মন লল্‌চাতা, হাথ্‌মে মোক্ষ পাওয়ে।
গোশালামে গাওয়েঁ কিৎনী, কিসীকো এহ ন সুঝে।
টীন্‌ ভরে জো দুধ্‌ বিলাতী উস্‌কো মিঠা বুঝে।
দেশ্‌কে ধন্‌ সব, চৌপট্‌ কর্‌কে, লেতা পর্‌দেশিয়া!
এহাঁকে লোগ সব্‌ ফকির্‌ বন্‌ যায় ন পাওয়ে রূপৈয়া।
বণারসী আউর্‌ শাল্‌ দোশালা, রেশম্‌ পশম্‌ ছোড়ী।
ছীট্‌ পাট্‌ নক্‌লী মখ্‌মল্‌, গোটা মোল্‌হী দেক্‌র কৌড়ী।
গৌ শূয়র্‌কী চর্‌বী দেকর্‌ জো বনাইল্‌ বাস।
পেহনে ওহী ভারতবাসী ধরম্‌ কর্‌কে নাশ্‌।
পুণ্যস্থান্‌ এহী আর্যাবর্তমে নহি মিলে কোই চীজ্‌।
আদ্‌মী বউরা মূরখ্‌ হোকে ছোড়্‌ দিয়া তজ্‌বীজ্‌।
আঁখ্‌কে আগে সবী পড়া হ্যায়্‌ কোই ন পাওয়ে রুখা।
ঘর্‌কী লছমী পর্‌কো দেকর্‌ সব্‌ কোই রহেঁ ভুখা।
দীন্‌ বিশারদ্‌ গণই বিপদ্‌, ভনো দুঃখকো গীত্‌।
হো মতিমান্‌ দেশ্‌কে সন্তান্‌, করো স্বদেশহিত।

২০.

স্তোত্র

জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
মীনরূপ ধরি হরি অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে,

বিষম বিদেশী-স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে?
জয় জগদীশ হরে।।

এ বিশ্বে বিষম বৃষ্টি ডুবিল যখন সৃষ্টি
সঙ্কটে কমঠ হয়ে ও পিঠে ধরণী লয়ে।
রেখেছিলে, রাখ আজি বিদেশী তরঙ্গভরে।
জয় জগদীশ হরে।।

বরাহ আকার ধরি ভীষণ দশনোপরি
রেখেছিলে এই ভূমি সে যুগে যেমন তুমি
তেমনি ভারতে রাখ দেখা দিয়ে যুগান্তরে।
জয় জগদীশ হরে।।

অথবা নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু ভূপে
ভয়ঙ্কর বেশে নাশি ভীম মূর্তি পরকাশি
যে ভাবে বাঁচালে বিশ্ব, এস সেই মূর্তি ধরে।
জয় জগদীশ হরে।।

দেশান্তর হতে পণ্য হরিছে দেশের অন্ন,
ভিখারী বামন হয়ে ত্রিপদে ত্রিলোক ছেয়ে
ত্রেতায় রেখেছ অন্ন, সে অন্ন কে আজি হরে।
জয় জগদীশ হরে।।

বলদৃপ্ত ক্ষত্র সবে কোদণ্ড টঙ্কার রবে
হয়ে নিজে ভৃগুসুত করেছিলে পরাভূত,
পশু-বলদৃপ্ত-দলে নাশ পশু-শক্তি-হরে।
জয় জগদীশ হরে।।

কোথা নব দুর্বাদল তনুরুচি সুকোমল
রাক্ষসের অত্যাচার বাড়িয়াছে পুনর্বার
বিনা সে শ্রীরামচন্দ্র কে নাশে রাক্ষসাদিরে।
জয় জগদীশ হরে।।

দ্বাপরে কর্ষণ তরে করুণা বর্ষণ করে
যে রূপে দর্শন দিলে সেরূপে এস ভূতলে
অন্ন দিতে অন্নহীনে তাই ডাকি হলধরে।
জয় জগদীশ হরে।।

যেরূপ ধরিয়া হরি জগতের হিংসা হরি'
বুদ্ধ নামে খ্যাত ছিলে সেইরূপে দেখা দিলে
দুর্বল-দলন যাবে প্রবলের পদভরে।
জয় জগদীশ হরে।।

কলিযুগে কল্কি হয়ে ত্রাহি দেব ম্লেচ্ছভয়ে
দুর্বলের বল তুমি এ তোমারই লীলাভূমি,
দেখা দিবে বিশারদে আর কত কাল পরে?
জয় জগদীশ হরে।।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

১.

ভৈরবী — মিশ্র ঠুংরি

সোনার স্বপন-মোহে ভুলিও না ভাই! সাধনা।
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাকা ছলনা।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি' করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা;
ওরা বুঝিল কি তব ধর্ম-কাহিনী, বুঝিল কি তবে যাতনা?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ;
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা।
না করিলে পান মোদের শোণিত, হয় ওদের চিত্ত ক্ষুব্ধ;
তাই ভুলাইতে চায় মাতৃমন্ত্র করি আকাশ-কুসুমে লুব্ধ!
ওরা মোদের দৈন্যে করি পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস;
তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি;
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়ে ভক্তি।
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নববঙ্গে;
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয়-বাজনা?

২.

জামালপুরে লাঞ্ছিত রমণীদের প্রতি —

অহং — একতালা

আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো।
পরিহরি' চারু কনকভূষণ, গৈরিক বসন পর গো!
আমরা তোদের কোটী কুসন্তান গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে সব পিশাচে তোদের অপমান, তাও নেহারি নীরবে সহি গো!
তবু কি গো তোরা আমাদের পানে রহিবি চাহিয়া করুণ নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে, আপনার লাজ হর' গো।
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল, জ্বাল মা! হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল, মরণে বরণ করিয়া লও;
ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী, বাঁধ কটীতটে সুশাণিত ছুরী,
দানবদলনী সাজ গো জননী! বাঙালিনী বেশ ছাড় গো!
তোদের তপ্ত শোণিত-পরশে, পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে
জাগুক্ আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।
শুনিয়া তোদের ভৈরব-হুঙ্কার, নিখিল চমকি' উঠুক্ আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে কর মা! ধৌত কর গো!

বিপিনচন্দ্র পাল

মূলতান — একতালা

আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না;
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি, প্রাণে চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানব-দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা; —
উর মা! আজিকে সে-রূপে পরানে, ডাকি মা কালিকে!
ডাকি গো সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী! নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিনী, উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনী!
রিপুকুল মাঝে, সন্তান ল'য়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা; —
প্রলয়-হুঙ্কারে, হর-হৃদি হতে উঠিয়া দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে;
শোণিত-তরঙ্গে, মাতি' রণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজ শোনা মা!
নৃমুণ্ডমালিনী, তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী!
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভারত-বন্ধন ঘুচে না।

মনোমোহন চক্রবর্তী

বাউলের সুর

ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও ভগিনী ও জননি!
মোহের ঘোরে আর থেকো না।
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখ না!
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী,
জগৎ ভরে' আছে জানা;
চটকদার কাচের বালা, ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে সাজে না!
নাই-বা থাক্ মনের মতন স্বর্ণভূষণ,
তাতে যে দুঃখ দেখি না;
সিঁথি-সিন্দূর ধরি', বঙ্গনারী
জগতে সতী-শোভনা!
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
বার লাখের কম হবে না;
পুঁতি কাচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায় —
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা, শুধান কথা, —
"উঠ আমার যত কন্যা!
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জোটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম?
মা যে তোরা ভাবিলি না!"

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১.

এতদিন পরে, জননীরে যবে আজিকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান কেউ কোথা আর থাকিস্‌নে নিরজনে।
সবে মিলে তোরা কর্‌ আয়োজন,
— মাতৃপূজার বসা রে বোধন,
দুঃখ দৈন্য ক্লেশ মলিনতা দূর কর্‌ প্রাণপণে,
বেলা গেল বয়ে, মিছে কাজ লয়ে থাকিস্‌নে নিরজনে।
ওই শোন্‌ ওই মায়ের অভাব,
বস্ত্র নাহিক ঘরে,
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু
রত্ন হরেছে পরে।
কোটী পুত্র তোরা আছিস্‌, সবাই পেয়েছিস্‌ নবপ্রাণ,
এখন সকলে বল্‌ রে তোরা, কি করিবি মাকে দান?
কি দিয়ে তাঁহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা,
সব ত দিছিস্‌ পরকরতলে, কেমনে রাখিবি মান?
এখন সকলে বল্‌রে তোরা, কি করিবি মাকে দান?
বিদেশী বণিক শতবর্ষ ধরে
যে ধন লয়েছে হরে,
পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ?
পারিবি কি তোরা ঘুচাতে দুঃখ, মায়ের মুখটি ম্লান?
সবে মিলে তবে কর্‌ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন,
একপ্রাণ হয়ে মনে বল লয়ে হয়ে সব আগুয়ান,
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর লক্ষটি শির দান।
থাকুক শিয়রে শাণিত কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয় শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃক্‌পাত,
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর্‌ মাতৃজয়-নিশান,
বিশ্বসমাজে পরিচয় দে রে তোরা কার সন্তান।
ওই দেখ্‌ ওই জননী তোদের
কাতর মলিন ক্ষীণা,

দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিনী মত
অন্ন-বস্ত্র হীনা।
শতকোটী তোরা পুত্র যে তাঁর পেয়েছিস নবপ্রাণ,
আর কেন বল্ নীরবে শুনিবি মাতৃ-দৈন্য গান?

২.

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব,
শরণ তবু না চাই,
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই।
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
শরণ কভু না মাগিব।
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাহিনা দৈব,
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব;
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
যন্ত্রণা তাহে নাই,
বজ্র ধরিতে চাই!
আজি বিশ্বে কারেও করিনাক ভয়
ভয়েরে করেছি জয়,
শাসন-বাঁধন কিছুই মানি না
ঝঞ্ঝা প্রলয় লয়;
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরম নিঃসংশয়,
কারেও করি না ভয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী

সুখরাই কানেড়া — ঝাঁপতাল

শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান — লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, — করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই অস্ত্র, এই বর্ম, আমাদের মুক্তি-পথ।
নমোনম বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিভাস — কাওয়ালী

যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দো'রে;
আছে যা অশন-বসন, তাই খাব, তাই থাক্‌ব প'রে।
স্তন্যদুগ্ধ-ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গানদী
ওরই মিষ্ট রসে পুষ্ট মোদের তনু নিরবধি;
(সেই) সুধা ফেলে ক্ষুধায় মরি প'ড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।
দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ও মা! তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এমন লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা!
(তবু) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, জাত গেল — পেট ভরিল না।
মান বাঁচাতে মনের ভুলে অপমানে যাচ্ছি মরে।

প্রমথনাথ দত্ত

ভূপালী—মিশ্র দাদ্‌রা

আমরা যা করছি তা করবোই করবো!
আমরা যা বলছি তা বলবোই বলবো।
থাক-না কেন কাঁটাতরু
গিরিগহ্বর, গহন মরু,
যে পথে চলছি আমরা চলবোই চলবো।
যাই বল আর যাই কর,
লাঠিই মার আর অসিই ধর,
মায়ের পীড়ন বুক পেতে আমরা ধরবোই ধরবো।
ছিন্নই কর ভিন্নই কর,
আট কোটী ভাই হবই জড়,
ঝঞ্ঝা তুফান সকলই আমরা তরবোই তরবো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাউল

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার,
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দু'দিন আগে, দু'দিন পরে,
তফাৎ মাত্র এই;—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দেরে মায়ের তরে;
অমর জীবন পাবি রে ভাই!
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্ লিখবে যখন
পরকালের খাতা, —
(তখন্) তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা, —
ওরে ক্ষ্যাপা।

শশিকান্ত

সারি গান

জাগ ভারতবাসী রে, কত ঘুমে রবে রে!
বল সবে হ'য়ে এক মন, "বন্দেমাতরম্"।
ভাইরে ভাই! জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি রে!
এ দু'য়ে ভক্তি নাই যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ।
ভাইরে ভাই! ভারতের ভাগ্যদোষে— ফিরিঙ্গি আইল দেশে রে,
অসার খোসা ভুষি দিয়ে দেশের ধন নিল লুটিয়ে,
অন্নাভাবে মরে প্রজাগণ।
ভাইরে ভাই, হিন্দু আর মুসলমান, এক মায়ের দুইটি সন্তান রে!
একত্র হ'য়ে সবে, মাতৃপূজা কর ভবে, ধন্য হবে মানব-জীবন।
ভাইরে ভাই, ভারতের সুসন্তান! কর সবে অবধান রে!
বিলাতী লবণ, বিলাতী চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই! চিনি আর লবণ। (বন্দেমাতরম্)
ভাইরে ভাই! একটি সুপুত্র হ'লে মা সুখী হন ভূমণ্ডলে রে!
ত্রিশ কোটি সন্তান যাঁর, আজি কি দুর্দশা তাঁর,
দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন।
ভাইরে ভাই। কামার, কুমার, জোলা, তাঁতী
হায় হায় করে দিবারাতি রে।
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বিলাতী কিনে,
কি খাইয়া রাখিবে জীবন।
ভাইরে ভাই! মেড়ারে মারিলে ঢুষ,
সেও ফিরে করে রোষ রে!
আমরা এমন জাতি, খাইয়া ফিরিঙ্গির লাথি,
ধূলা ঝাড়ি' চলে যাই ভবনে!
ভাইরে ভাই। দ্বিজ শশিকান্তে কয়, জাগ সবে এ সময় রে!
পূজিতে মায়ের চরণ, না করিলে প্রাণপণ।
কাজ কি রেখে এ ছার জীবন? (বন্দেমাতরম্)।

মুকুন্দ দাস

১.

টোরি — ঝুলন

বাবু, বুঝবে কি আর ম'লে?
কাঁধে তোর সাদা ভূত চেপেছে একদম্ দফা সারলে!
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্ ষ্টীলের থালে,
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে?
পমেটম্ লাইক করিলি দেশী আতর ফেলে,
সাধে কি দেয় রে গালি "ব্রুট্, নন্‌সেন্স, ফুলিস্" বলে!
ছিল ধান গোলাভরা,
ইন্দুরে সব কর্‌লে সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ্‌না বাবু খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো ডিপুটি-বাবু, নাউ হেড ফিরিঙ্গীর বুটের তলে?
পাগলের কথা ধর,
এখনো সাম্‌লে চল,
সাহেবী চালটি ছাড়,
যদি সুখ-ইচ্ছা কপালে।
বল মাতরম্ বাজাও ডঙ্কা
জাগুক্ ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক্ রে ভাই
প্রেমময়ীর প্রেম-সলিলে।

২.

তোরা পাশ করে হোস মরা।
থাকে না শৌর্য-বীর্য, শুধু মুখের বোলেই
জিনিস ধরা।।
প'ড়ে ভাই এ.বি.সি.ডি. সাহেব হবার সাধটি যদি
তবে কেন ড্যাম্ ব্লাডি শুনেও তাদের ছাড়া,
তারা কি ছাড়ে রে তোরে বল্লে এমন ধারা,
তাতেই বলি শিখলি ভালো
কেবল তাদের পোযাক পরা।।

৩.

বাবুদের পায়ে নমস্কার —
দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভাল মন্দের নাই বিচার।।
যার মা উপোসী ভগ্নী দাসী বাবুর বাড়িতে
সেই ছেলে হয় টিকপ্‌দার বেশ্যা বাড়িতে।
বাবু বিদ্যার নামে নবডঙ্কা —
গুড্‌নাইট্‌ গুড্‌ মর্ণিং সার।।
কলিতে বৌ হয়েছে রং-এর বিবি[১] স্বামী মানে না —
শাশুড়ী হয় ময়না মাগী স্বামী খানসামা।
তারা ভাশুর-শ্বশুর কেয়ার করে না
বাপকে বলে "মাই ডিয়ার"।।
ছোট খাটো চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী
যুবক বন্ধুর চোখে চশমা এই দুঃখে মরি।
বাবুরা স্ফুর্তি করে বেড়ান ঘুরে[২]
যেন ময়লা-টানা গাড়ির যাঁড়।।

---

১. পাঠান্তর — 'বাবুর বৌ হয়েছে রঙের বিবি।'
২. পাঠান্তর — 'বাবু পথে বেড়ান ঘুরি।'

অশ্বিনীকুমার দত্ত

ভৈরবী — কাওয়ালী

আহা রে বাঙালীবাবু যাই বলিহারি!
কত রূপ ধরো তুমি অপরূপধারী।।
শিবের ছিল অষ্টমূর্তি, তোমার হল শত মূর্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে সৃজন কর, বিষ্ণু রূপে কলম ধর,
শিব রূপে কত ঢালো ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি।।
(কভু) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিব দুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝতে নারি।
কভু মুরগীর ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দাও,
বিদেশে পরমব্রহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী।।
নানা স্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না,
অন্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি।
সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, খাঁটি হয়ে রও রে ভাই,
বহুরূপী হইও না রে, কপট আচারী।।
নাহি রে তোর ধর্মাধর্ম কর পশুর মতো কর্ম,
যদি দেখো শ্বেত চর্ম অমনি গোলাম তারি।
সদা করজোড়ে রও, মস্তকে পাদুকা বও,
বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভারি।।
দিনে একশ আটবার কর ভারতের উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি।
মুখেতে মাল্‌সাট মারো, অ্যায়সা করো ত্যায়সা করো,
কাজের বেলা ন্যাজ গুটিয়ে মারো টেনে পাড়ি।।

২.

ঝিঁঝিট — যৎ

বাঙালী বড় বুদ্ধিমান কে বলে সংসারে।
এমন বোকা কোথাও না দেখি যে কাহারে।।
দেশের প্রতি নাই মমতা
বিদেশীয়র পায়ের জুতা,
যা করে ইংরেজে তাই ভালো তার বিচারে।।
বাঙালী বাবু যারা
এমন হত মূর্খ তারা
শুটকী চুরুটের লেগে অম্বরী তামাক ছাড়ে।।

সাচ্চা আতর গোলাপ ত্যজে
বিলাতী বিলাসে মজে,
কত টাকা ওড়ায় তারা ভস্ম ল্যাভেণ্ডারে।।
দু দিন স্কুলে গেলে
দেশী খাওয়া যান ভুলে,
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট গোমাংস আহারে।।
(ওরে) গোমাংস এ গরম দেশে
নিতান্ত যে সর্বনেশে,
বৈদ্যশাস্ত্রের সার কথা, হেসে উড়ায় তারে।।
কোন বাবু বিলেত গিয়ে
আসেন দেখ সাহেব হয়ে —
পৃথিবী চমকে তার হ্যাটের বাহারে।।
গরমির দিনে গরম কোট
পায়েতে বিলাতী বুট,
কালো গায়ে বান্দর সাজেন ইংরাজ নকল করে।।
দিবা নিশি চিন্তা কিসে
ইংরেজের সঙ্গে মিশে
তাদের পদতলে পড়ে থাকিবেন ডিনারে।।
ভাই বন্ধু বেরাদারে
আপনার বলতে লজ্জা করে,
চোটে যান বাবু বলে ডাকিলে তাহারে।।
সাহেবের মূর্তি ধ'রে
থাকেন পঞ্চমেতে চড়ে,
ইংরাজী ভাবেতে মত্ত আহারে-বিহারে।।
বদনে বিরাজে সদা
বাঙালীরা বড় গাধা,
দেহ-মন জর্জরিত ইংরাজী বিকারে।।
যতই বুদ্ধি রাখ রে ভাই
দেখে বলিহারি যাই,
দেশশুদ্ধ ছি ছি শুন তোমার এ ব্যাভারে।।
কেন রে এ বিড়ম্বনা,
বিদেশী এ ভাব ছাড় না,
(দেখ) এত কর তবু তারা পুছে না তোমারে।।

'করালী*'

আছিস্ কোন্ উল্লাসে?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশেপাশে;
এ যে এমনি নচ্ছার জোঁক
জলে স্থলে ধরল ঠেসে।
জোঁকের ভয়ে হ'লি পোকা,
জন্ম নিয়ে বীর-ঔরসে;
তোদের কাণ্ড হেরি' জগত জুড়ি,
হো হো রবে সবাই হাসে।
অস্থিচর্ম হল রে সার,
রক্ত নাহি রক্তকোষে;
এখন বাঁচ্‌তে চেলে ফেল্ সে জোঁক
বয়কট্ চূণা মুখে ঘ'সে।
খেতে নাই ঘরে অন্ন,
শুইতে বাঞ্ছা তক্তপোষে;
তোরা ধনেপ্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকানি দোষে।
করালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে,
দেখ্‌ছ না, সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকের শ্বাস-প্রশ্বাসে।

---

* ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় — সম্পাদক

ময়মনসিংহ সুহৃদ-সমিতি

১.

বাউলের সুর

পেটের খিদায় জ্বইলে গো মইলাম, উপায় কি করি?
ওরে, কি দারুণ আকাল পইড়াছে রে, ধান টাকায় হইল দুই পসুরী।
আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা, কর্জ্জহাওলাদ পাওয়া যায় না,
মহাজনে কুরুক দিছে জমী আর বাড়ী,
আবার চৌকিদারী টেক্স গো নিল, থালি লোটা নিলাম করি'।
পাটের টাকায় দিলাম কিনা বিবিরে জার্মানীর গয়না,
বিলাতী ফুকা মতির দানা, আর হাওয়ার চুড়ি।
ওরে, জার্মানীর গয়না কেউ বন্দক নেয় না রে, —
ভাই রে! ভাইঙ্গা গেছে ঠুইন্‌কা চুড়ি।
মনের দুস্কু কইবো রে কারে, ছাইলা মাইয়া কাইন্দা গো মরে,
পরিবার, হায়, ভাত বেগরে হইছে পাটখড়ি;
হায় রে, ছাতি ফাইটা যায় রে দেইখা,
ওরে আমি কেন না মরি!
মোমিন বলে, করি গো মানা, ভাতের দুস্কু আর রবে না,
বিলাতী চিজ্‌ কিন্‌বো না আর — কও কসম্‌ করি'।
তবে দেশের টাকা রইবো রে দেশে,
লক্ষ্মী ঘরে আস্‌বে রে ফিরি।

২.

বাউলের সুর

কিবা হইল ওগো নানি!
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবাণী।
দারগ্‌-গিরি চাকরী দিবে, সাথে বইসা খানা খাইবে,
ওরে .... সাদি দিবে, আমি দেহামু কের্‌দানী।
হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম, দারগ্‌-গিরি না পাইলাম,
ওরে, এত আশা কইরা শেষে, নছিবে হান্‌কী-ধোয়া পানি!
মোমিন বলে, —শোন মিঞা ভাই, হিন্দুর সাথে মিল রে সবাই,
ওরে ঘর-ভাঙ্গাইনা দুস্মন ওরা রে,
ভাই রে! রাইখো ওদের চিনি।
ওদের খালি কথারই ফাঁকি,
ওদের চিনাও ভাইরে চিন্‌লা নাকি,
ওরা, বৈরা দিয়া বৈরা মারে, কৈরা চালাকি;
ওরে — মিঞা মশয়, আমরা দুই ভাই,
দেলে খাঁটী রাইখো জানি।

৩.

খাম্বাজ — কাহার্‌বা

রাম রহিম না জুদা কর (ভাই) মনটা খাঁটী রাখ জী;
দেশের কথা ভাব ভাই রে! দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দু মুসলমান, এক মার সন্তান, তফাৎ কেন কর জী।
দুই ভাইয়ে, দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি।
কাপড়, জুতা, লবণ, চিনি, ছুরী, কাঁচি বিলাতী।
(মোদের) ভাইরা সকল পায় না খেতে, জোলা, কামার আর তাঁতী।
টাকায় ছিল মনেক চাল ভাই। এখন বিকায় পসুরী।
এর পরে ভাই, হতে বাকি গাছের তলে বসতি।
দেশের দিকে চাও ফিরে, (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয় রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুঁসি।

অমৃতলাল বসু

বাউলের সুর

ওরা জোর করে দেয় দিক্‌না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে
মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙালী প্রেম কাঙালী —
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙালী,
তা' নয় জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ
বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি চাইনে তোদের
লবণ দান?
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাইবা দেখাই সাজের জাঁক
তোদের ওই চক্‌চকান মধুর চাকে
করবো না আর বিষ পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেল্‌বো ভেঙে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁকার আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই বিসম্বাদে বঙ্গভেদে
আমরা হলুম আবার তেজীয়ান।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত
বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

কাফি — একতালা

উর গো বাণি বীণাপাণি
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদিনি আজ,
বীণার মধুর নিক্কণে।
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান,
পীযূষ-শক্তি-সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তাড়িত-তেজ-স্ফূরণে!

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১.

বাঁরোয়া — ঢিমে তেতালা

নয়ন-জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়।
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়।।
শিখ হৃদি উচ্চশিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায়।।
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না বায়।।

২.

মালকোষ — ঝাঁপতাল

জাগো শ্যামা জন্মদে!
প্রসীদ প্রসন্নময়ি বর দে মা বরদে!!
তনয়ে হৃদয়ে ধরি, উঠ মা শোক পাসরি,
শুভ দে গো শুভঙ্করি, মাগি পদ-কোকোনদে।।
পোহাল যামিনী ঘোরা, উঠগো জননী ত্বরা,
হেরি মুখ দুখহরা, ভাসিব আনন্দ-হ্রদে।।

বিপিনচন্দ্র পাল

১

প্রলয়

কতদিন বল আর রাখিবে সম্বরি
বক্ষোমাঝে রুদ্ধশ্বাস, বেদনা গভীর,
সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
সহিবে নীরবে? কবে উঠিবে বিদরি
মেদিনী-অম্বরতল ক্রন্দনের স্বরে
ঢালি দিবে উচ্ছ্বসিত যুগ-যুগান্তের
অগ্নি-প্রস্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা। প্রলয়ের
প্রবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
নিমেষে ভাঙিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
বিলাস-সম্ভার যত পণ্যবীথিকার।
সেইদিন ভারতের চির-বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহাজাগরণ।

২

বঙ্গবিভাগ

রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ!
শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগ-যুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ; হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ-রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুণ্ণ রেখা,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ-কঠোর? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক্ তরঙ্গ ভৈরব
বঙ্গ বক্ষঃ ক্ষত বিগলিত মেঘনাদ,
রক্তগঙ্গা — পুণ্যস্পর্শ যা'র দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয়দান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বঙ্গমঙ্গল *

মন্ত্রণা

...এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে?
তুমি যদি হে ভারতি, নাহি ধর হাল?
খাটুনিও নাহি বেশী পাটুনীর কাজে।
থাকিলেও ক্ষতি কিবা? —কার্য-হীন তুমি
হবেই তো অচিরাৎ নূতন বিধানে,
আগে থেকে দাঁড়-টানা শিখে রাখা ভাল।
পার কর বীণাপাণি কাব্য-কালাপানি।
হিমালয়ে শিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা —
নির্জনে মার্জন করে পর্জন্য আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক আসনে
ভাষেণ অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিণী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।
বিদায়িতে ভারতীরে মারুতির রথে
পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে; রবে সবে নীরবে জগতে।
ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হ'বে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে।
শান্তির কুলীশ দিব পুলিশের হাতে;
আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া।
সচিব! রচিব আমি অন্য নব বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ; তুমি পাণ্ডা হও তার।"
শুনি সে অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ; বন্দী গাহে গান।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে।

* প্রথম দিকের সামান্য অংশ বর্জিত হয়েছে। সমগ্র কবিতার জন্য দ্রষ্টব্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 'ফুলশর' কাব্যগ্রন্থ (১৩১১)।

রহিবে নাম ছাপা (ধামা চাপা)
পুলিশ কমিশনে।
ইউনিবরসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে
করিবে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে।
গুপ্ত বিল্ খুলি বিল্‌কুল্-ই
মহিমা জারি হোলো।
প্রভুর জয়গানে একতানে
সকলে হরি বলো।

দ্বিতীয় সর্গ
(উদ্যোগ)

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ
এক সঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালা-ফালা করি কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"
উচ্চারিয়া কথাগুলি হস্তে লয়ে ছুরী
দক্ষ সার্জনের মত দাঁড়াল কর্জন,
কহিলা সচিব তবে যুক্ত কর-যুগে :—
"ছুরী হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি;
কিম্বা যদি ধড় হ'তে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার? কি হইবে প্রভু?"
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভর্ৎসনা বচন,
কহেন শ্বেতাঙ্গ-পতি ঃ— "অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা, মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চীৎকার করা ভাবপ্রবণতা।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা শিখাব এবার,
থাকে প্রাণ ধড় মুণ্ড বিভক্ত করিলে।
যতটুকু যাবে কাটা ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া;
সবগুলো হবে তাজা সমান সমান।
বঙ্গ হতে কাটি বঙ্গ; প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধ্যা জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে হইবে সাধিত।"

তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
রত হল নব বিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে। উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গমুখে, অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে।

(রোদন ধ্বনি)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচিব জানি খাঁটি;
শোভিব নব ডালে,
দেহটা দিলে ছাঁটি;
মঙ্গল হবে খাসা
বিশেষ আছে জানা,
জঙ্গলে পাবে বাসা
অঙ্গের দু'টো ডানা।
অবোধ মোরা ওগো,
কাঁদিয়া মরি তবু;
বঙ্গটা বঙ্গে রাখো
করুণা করি প্রভু।

তৃতীয় সর্গ
(সিদ্ধি)

— তূণক ছন্দ —

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্য কার আজি তাঁর ন্যায্য কার্য রোধিবে?
মন্ত্রপূত লাট-দূত দেশ দেশ ধাইল;
ভেদমন্ত্র — বেদমন্ত্র — কণ্ঠ তার গাইল।
হর্ষনেত্র পাত্রমিত্র লম্ফঝম্ফ ঝাঁপিল।
ঘোর রোল গণ্ডগোল; বঙ্গখণ্ড কাঁপিল।
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড হইল তার দুঃখ কি?
খণ্ড-শূন্য জেদ-পূর্ণ রৈল লাট-বাক্যটি।
দেব সর্ব লাট গর্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল,
বঙ্গ-মুণ্ড দেহপিণ্ড ছাড়ি ভূমি পর্শিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল।
তূণকের ছন্দে ঢের বর্ণনায় বাড়িল।

মাথাটা গেল যবে, দ্যাখে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা!
কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণটা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,

তবুও নড়ে না!
আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা,
শ্বাস যে পড়ে না।
টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,
"আবার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আট্‌কে?"
কহেন লাট যে সে কড়া ভাষে ঃ—
"কোরো না বিজ্‌বিজ্‌!
জুড়িয়া দিলে মাথা, রবে কোথা
আমার prestige."
খণ্ড হল বঙ্গ দেশ,
খণ্ডকাব্য হল শেষ;
বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন।
শ্রীবঙ্গ-মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন।।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা

(শ্যামা বিষয়ক)

ও হে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক ছাই।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে' লয়ে তোমার গুণের বালাই।।
তোমার মুখের জ্ঞানের আলো, যে পায় সে না বাসে ভাল;
আপন জনে খোলা মনে, হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।।
ভেদ বুদ্ধি ভেবে সার পাকা চাল চাললে এবার,
সোনার বাংলা চুরমার করলে তুমি দুটা দুঠাঁই।।
শেল দিয়েছ মোদের বুকে, বল্ হে গৌর আর কি সুখে
সখা ভাবে ভাজ্‌বো তোকে, তোমার প্রেমনীতিতে ফাই ফাই।।
তোমার মুলুকের আমদানী, বসন ভূষণ চুড়ী চিরুনী,
ছড়ি জুতা, চোখরাঙানী, প্রেমের গৌর আর না চাই।।
চুরুট সাবান পাঙ্গা লবণ, দোবরা চিনি লোহার বাসন,
সাগর জলে দিই বিসর্জন, তোমায় ভজ্‌লে ধর্ম নাই।।
কালাপানির অতল জলে চায়ের রাশি দিল ফেলে,
স্বদেশ-ব্রতে প্রাণটা ঢেলে, মার্কিণ তুল্য কীর্ত্তি নাই।।
এখন গৌরচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ভজ্‌বো মোদের শ্যামা মায়ে,
কালী কালী নাম জপিয়ে মনের কালি মুছবো ভাই।।
ঘুচেছে মোহ এতদিনে, সুজন কুজন লই হে চিনে,
গতি নাই রে শ্যামা বিনে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই।।
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে, সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে,
আবেগভরা চাপা সুরে, স্বদেশপ্রেমের গুণ গাই।।
লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই, মিটেছে মোদের বিলাতী বাই।।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১.

প্রার্থনা

দেবী,
জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য
সকলের আগে সেবিতে চরণ
সকলের আগে লভিতে মরণ
সেবকবর্গ মাঝারে আমারে কর গো অগ্রগণ্য।
জয়-পরাজয় মান-অপমান
না গণিয়া মনে হব আগুয়ান;
অরির প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত লভিব তোমারি জন্য।
শুনি, পুরাকালে হইল যখনি
বীরের শোণিতে সিক্ত অবনী,
কে পারে গণিতে — সে শোণিতে কত জনমিল বীর সৈন্য।

আজিকে আমার রুধিরধারায়—
তোমার চরণতলের ধরায়
দেখি জাগে কিনা, লভিয়া শক্তি নবীন ভক্ত অন্য।

('প্রার্থনা' — ১ম ও ২য় স্তবক)

২.

নবজীবন

আসিয়াছি আমি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নব জগত-সভাতে
শুভ্র পুণ্য বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা।
করিয়ে আশিস্ শিরে উষ্ণীষ
জড়িয়ে দে মা।
কর্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা-পাহাড়,
ঠেলিয়া চরণে সে বাধা ভীষণ
সরিয়ে দে মা,

আছে তার পরে   নিরাশা-সাগর
                তরিয়ে দে মা।
সময়ের পথে হইব যাত্রী,
দেহ গো শস্ত্র জগত-ধাত্রী;
প্রীতির ধর্মে   অটুট বর্ম
        গড়িয়ে দে মা,
তৃণেতে আমার শর সাধনার
        ভরিয়ে দে মা।

অমৃতলাল বসু

প্রোক্লামেশন্ *

বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে।।
প্রথমে বলেন রাণী যে-সব বচন।
সম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ।।
সু-পুত্র সম্রাট হ'য়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়।।
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হ'বে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ।।
মেনে লব রাজ-বাক্য জ্ঞান করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ।।
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে।।
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন।
হ'বে কি কখনো ঠিক গোরার মতন।।
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলি।।
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি নাশিলে ফুলার।
হ'বে কি সিদ্ধান্ত পিলে ফেটেছিল তার।।
জিজ্ঞাসা করিও ভাল ক'রে কসামাজা।
ইংরাজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা।।
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ।।
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি।
তার পুত্র সূত্র-কর্ম পাবে কি গো ফিরি।।
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়াজাল।
তবু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কভু চাল।।
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কতদিনে হ'বে বন্ধ আসা সিগারেট।।
কেবল পকেট নয় হঁচড়ে বখাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট।।
মরিলে কলুর কলু কেরোসিন তেলে।
কলুনীর চুলো কি গো রাজা দেবে জ্বেলে।।

* ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।

কখনো দেবে না হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার।।
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশি অতিশয়।।

"ডিফেন্‌ডার অফ্ দি ফেথ্' যাহার উপাধি।
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী।।
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসলমান।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান।।
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পল্টনে।।
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার।।

বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধা।
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা।
ইংরাজ জাতির ভাব, — ভূ-পালের ভাষ।
অমৃত-সমান কথা শুনে হিন্দু-দাস।।
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্ব্বর্ণ।
যাদের পৈতৃক স্বত্বে নাহি দিবে কর্ণ।।
'কাষ্ট্ ক্রিড্ কলারের" এইরূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে।।
মহাসভা সভ্যদলে বোলো ভাল করে।
বোকার বোকাত্ব যেন কার্যে দেন ধরে।।

আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্নতন্ন মানে বুঝে এল সমুদায়।।
তাৎপর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য।
কোন কার্যে ভবিষ্যতে হ'বে না আচার্য।।
"রাইট্ রাইট্" বলে না ক'রে চিৎকার।
মর্মে মর্মে কৃষ্ণচর্মে দানিব ধিৎকার।।
হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি-ময়।
মারো কাটো ভালবাস তবু গাব জয়।।

হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্মশানকালী

আজি মাগো খুলি রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা,
ভয়ংকরী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা।
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশী,
দৈত্য বধি' রক্ত পান কর মাগো আসি।
শুভদে, বরদে, শ্যামা, শুভংকরী কালী
সন্তানের শিরে তুলি কলংকের ডালি,
কেমনে মা সহি' আছ এতদিন সুখে —
দানবের পদাঘাত শত শেল বুকে?
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি'
আজি মাগো সাজ তুমি শ্মশানের কালী।

পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র সাধন-মন্ত্র
প্রেত ভয়ে, ছি ছি, ডরিবি কে?
মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?
আয়, আজি আয় মরিবি কে!
অসুর নিধনে কিসের তরাস?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস?
না গণি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে?
আয়, আজি আয় মরিবি কে!
('আয়, আজি আয় মরিবি কে!')

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১

এ জগতে যদি বাঁচিবি

ছি ছি মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া,
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি?
ওড়ে ফুৎকারে কিরে হীনতা?
তেজ ধিক্কারে নিজ নীচতা;
গুরু-বচন-দম্ভে হবে কি?
হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ
বচনগুচ্ছ রচিবি?
কর্মের পর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
সহি চরম দলন, ধীরতা?
করি বেদনে রোদন, বীরতা?
কাজ কিরে বীরু বড়াইয়ে?
সহে ভীষণ তাড়ন, মানুষে?
হলে পাষাণ পীড়ন, সানু সে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।
মায়ের আশিস্‌লভিতে পারিস্
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

২

এড্‌রেশ্

কত্তা তুমি চল্লে ঘরে নেহাল করি দেশ;
রচি তব কীর্তিকল্পে কাব্যে এড্‌রেশ্।
জঙ্গী বেটার সঙ্গে যুঝি কর্ম হ'ল ঠাণ্ডা,
নইলে সবাই বুঝত তুমি কত বড় বান্দা!
গর্‌গরিয়ে রাগের চোটে ইস্তফাটি পেশ্;
রইল কিন্তু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ।
জবরদস্তের সঙ্গে নাহি উঠতে পার এঁটে;
নরম কাঠের ছুতোর তুমি, গেলে বঙ্গে কেটে।
কলেজ বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধুম;
রজনীতে ক'দিন ভায়া হয় নি তোমার ঘুম?
ঘরে গিয়ে পরের ভাবনা কোরো নাক আর;
রেখে গেলে যতটুকু এই ত চমৎকার।
গিয়ে দেশে ভুলে যেয়ো কাশ্মীরের স্বর্গ।

এড্রেশের প্রথমাক্ষর পড় পাঠক-বর্গ।
কবিটি তোমার ভক্ত বুঝহ ইংগিতে,
ঘোষিল অতুল কীর্তি বিজয়-সঙ্গীতে।

৩

ঠিক বলেছ

তোমরা কর শ্রমের বড়াই
আমরা যে রে বাবু।
তুমি চাহ কত্তে লড়াই
আমি তাহে কাবু।
তোমার খেলা ছুটাছুটি,
আমার খেলা গ্রাবু,
তোমার খাদ্য গোস্ত-রুটি
আমার পথ্য সাবু।
মোরা আর্য অতি শিষ্ট
তুমি বেটা ম্লেচ্ছ।
দুষ্ট লোকের নাহি ইষ্ট!
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো।
তোদের ধর্ম রজ-তম
মোরা অতি সাত্ত্বিক;
তোদের মূর্তি অসুর-সম,
মোরা রূপে কার্তিক।
পা-উঁচিয়ে কর রোষ,
ঘন ঘন মার কিক্;
আইন খুলে তস্য দোষ
দেখাই মোরা তার্কিক।
আর্য যাবে স্বর্গে হেঁটে;
তোরা দেবের ত্যাজ্য;
মর্বি খালি রাজ্য ঘেঁটে।
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো।
জানিস্? যখন ছিলি বনে,
কর্‌ল এই জাতে কি?
ধনী হ'য়ে মোদের ধনে
লড়বি মোদের সাথে কি?
আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভাঁড়
নাই থাকুক তাতে ঘি;
খাচ্চি এখন ভাতের মাড়
দেখ্‌বি পরে পাতে কি!
শাস্ত্রগুলো করি জড়
ভাবলে কথা ন্যায্য,
বুঝবি মোরা কতো বড়!
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো।

৪

মনের কথা

যা হোক, রাখি ঢাকা-চাপা,
দেখাই যে সে ভিতর ফাঁপা।
কুমড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল।
বলি পটল, ভাজি ঝিঙ্গে;
বলি জাহাজ, চালাই ডিঙ্গে;
ঝোলাই লম্বা কোঁচা, তবে ছুঁচো করে যা গোল।
'কালো কুর্তি' লাগায় বেটন্
দেহের মাংস করি মাটন্;
ভ্যা-ভ্যা চেপে হালুম-ডাকে তবু উঁছাই খাবোল।
অগ্নি মোদের খ্যাতি রটে;
হলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে!
পিঠের দাগ ঢেকে পিটি আত্মযশের মাদল।
পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি
লাটিম সম 'অটনমি'
হচ্ছে বটে; কিন্তু ঘটে জাগছে শক্তি আসল।
খুঁজি বটে গর্তে বাসা
আত্ম-শক্তি আছে খাসা
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল।

৫

ওরা শিশুর রক্ত চায়

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
পরীক্ষা আজ বিষম অতি, —
ও মোর দেশের পদ্মাবতী,
ছেলে বলির সমারোহে আয়, মা, ছুটে আয়!
কান্নাকাটি রাখ মা দূরে
ও সব হবে অন্তঃপুরে,
রণাঙ্গনে মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায়!
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায়!
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো ওরা শিশুর রক্ত চায়!
একটি ছেলে দিবি বলি,
উঠ্‌বে শত মৃত্যু ঠেলি,
দেখ্‌ব এবার কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায়!
জানিস্ তো মা আগাগোড়া,
রক্তবীজের বংশ মোরা,
রক্ত ফুটে লক্ষ হ'ব ধ্বংস-সাধনায়!
ওরা কত রক্ত চায় গো, দেখ্‌ব কত রক্ত চায়!
('ওদের শিশুর রক্ত চাই')

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের গান

মাতৃভক্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়
তার আগে ধায় বিজয়নিশান
বিজয় পায় পায়।
মাতৃমন্ত্র যে জন জপে সে কি ডরে অরির কোপে,
মাতৃকার্যে জীবন সঁপে কীর্তিমান ধরায়।।
শক্তিরূপা সঙ্গে ফেরে
বজ্র ফেরে তারে হেরে,
হেরে তারে নতশিরে রাজা রাজসভায়।।
মাতৃতেজ হৃদে ধ'রে
দাসত্বশৃংখল হয়ে
অসি ধরে ভীরু করে রণাঙ্গনে ধায়।।
(২য় অংক, ৭ম দৃশ্য)

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

গান

বাউলের সুর — মুসলমানী বাংলা

এখন মুসলমানের ইমান্ কোথা,
নাছারার বাহার।
দেখি খোদাতালার রাহার পরে
দেল্ রাখে না কেহ আর।।
ফোতো নবাব মস্ত ধিঙ্গি
খান্ বাহাদুর গাঁয়ের সিঙ্গী,
নামের লোভে কাম ছেড়ে সব —
দেনা করে দেয় বাহার।।
আখেরের সব ভাব্না ভুলে,
জাতি ভাইকে ফেলছে তলে,
যারা বাদ্সা ছিল এলেম বিনে,
তারাই গোলাম আর গোঙায়!
কি লোভে সব ভায়ের গলায়
অন্ধ হয়ে ছুরি চালায়,
আখেরে খান্সামাগিরি
(এখন) বড় জোর ছব্রেজিষ্টার।।
সদাই শুনি অন্নকষ্ট
গোলামগিরির সেলাম নষ্ট,
দু'বেলা দুই মুঠো ভাত (পেটভরে)
জুটছে দেশে ক'জনার?
দু'দিন আগে কি ছিলে ভাই,
দেলের মাঝে ভাবো না তাই,
খানা বিনা কেটেছে দিন
বাঙালায় কার বাপ-দাদার?
সে দিনের কি এই আখিরি —
কোথায় সে চাষ কারিগিরি,
কোথায় কদর কোথায় আদর —
এখন অন্ন জোটা ভার।।
কোথা থেকে কারা এসে
লুটে নে যায় নিজের দেশে
বাহিরের চটকে লালছ —
আমাদের কই হাট-বাজার?
করেছি হায় এয়ছা স্বভাব
নিজের দেশে যায় না অভাব
অযত্নে বিলালাম রত্ন —
বদ্লি মিল্লো ফক্কিকার।।
সায়ের বলে জেগে দেখো —
নয়ন কেন মুদে রাখ
যে মাটিতে পয়দা হলে
সেই মাটি সার দুনিয়ার।।

নানাবিধ কবিতা

বন্দে মাতরং সম্প্রদায়

মায়ের পবিত্র নাম করিয়া কীর্ত্তন
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে
জননীর দুঃখ ক্লেশ করিতে মোচন
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি এই বঙ্গদেশে।

অমৃত চালিত হ'য়ে অমৃতের ধারা
বর্ষিতেছ বাঙ্গালীর শ্রবণ কুহরে,
মহান্ পবিত্র ব্রত সাধিছ তোমরা
জাগায়ে স্বদেশ-প্রীতি সবার অন্তরে।

ধরেছ ভিক্ষুক বেশ মায়ের আজ্ঞায়
ধন্য ধন্য তোমাদের সার্থক জীবন!
এ সৌভাগ্য পৃথিবীতে বল কেবা পায়
কে পারে পূজিতে হেন মায়ের চরণ?

জননীর শুভাশীষ তোমাদের শিরে
জাগাও স্বদেশবাসী, অক্লান্ত অন্তরে।

১৬ই অক্টোবর

অভাগিনী বঙ্গমাতা হায়! বহুবার
সয়েছে লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার;
অন্নবিনে অনশনে সন্তান তাঁহার
মরিয়াছে কত হায়, সংখ্যা নাহি তার!

অযুত অযুত কত বঙ্গের সন্তানে
মহামারী পাঠায়েছে শমন ভবনে,
ভীম প্রভঞ্জন ঘোষ, সলিল প্লাবনে
ধন প্রাণ গৃহ হীন কত শত জনে!

সন্তানের এত ক্লেশ দেখিয়া জননী,
হারাইয়া ক্ষণে ক্ষণে নয়নের মণি ঃ—
শ্রীরামমোহন, মধু, কেশব, বিজয়,
রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস, ঈশ্বর, অক্ষয়,
হিতৈষী হরীশ, ঋষি দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র,
দাতাকর্ণ তারক, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র,
দীনবন্ধু, রাজেন্দ্রাদি কত কব আর
হরিল শমন যত রতন মাতার;—

সহি এত শোক তাপ তবু বঙ্গমাতা,
বিদীর্ণ হৃদয়ের লয়ে দীনতা হীনতা
একমাত্র সুখ চাহি আছিলা জীবিতা
নিরদয় বিধি কৈল তাতেও বঞ্চিতা।

অষ্টকোটি কণ্ঠে যবে ভাই বোনে মিলি
ডাকিত 'মা' বলি — মাতা সব দুঃখ ভুলি,
হাসিতেন সুমধুর, অশ্রুপ্লুত আঁখি,
সন্তান ভুলিত দুঃখ মার হাসি দেখি।

সে একতা সেই সুখ না সহিল প্রাণে,
রাজনীতি সুচতুর, কঠোর বিধানে
দিল তাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করি,
বহায়ে প্রবল বেগে মাতৃ অশ্রুবারি।

কান্দিল সমগ্র বঙ্গে পুরুষ রমণী,
হাহাকারে পূর্ণ হৈল গগন মেদিনী,
কেহ হরিনাম করি, কেহ গঙ্গাজলে
স্নান করি, প্রশমিল হৃদয় অনলে।

শোকে দুঃখে সমুদয় বঙ্গবাসীগণ
রন্ধন ভোজন পান করিল বর্জ্জন,
নগ্নপদে অনাবৃত দেহে কতজন,
মাতৃচ্ছেদ মহাশৌচ করিল ধারণ।

সেই ঘোর দুর্দ্দিনের কথা মনে হ'লে
এখনও ভাসে আঁখি শোক-অশ্রুজলে
যতদিন বঙ্গবাসী ধরিবে জীবন,
সে দুর্দ্দিনের কথা সদা করিবে স্মরণ।

কত দুঃখ, কত শোক, দুঃখিনী জননী
ভুলিয়াছ — ভুলিবে না এ দুঃখ কাহিনী;
বিংশের পঞ্চাব্দে ষোল, দশমের মাসে,
রবে চির কৃষ্ণাঙ্কিত, বঙ্গ-ইতিহাসে।

কর্জ্জন

১

কে বলে কর্জ্জন, তুমি শত্রু বাঙালীর?
যে কুটীল রাজনীতি অসি প্রহরণে,
দ্বিখণ্ডিলা দেহ তুমি বঙ্গ জননীর,
যে দারুণ ব্যথা দিলে বাঙ্গালীর প্রাণে —

নহে তাহা তাহাদের অশিব নিদান।
ভাঙ্গিয়াছ মহামতি ঘোর কশাঘাতে
অতি ঘোর মোহনিদ্রা, সুপ্ত বঙ্গপ্রাণ
বহু যুগ যুগান্তর আছিল যাহাতে।

ধন্য তুমি, বাঙ্গালীর পরম হিতৈষী,
ভারতের শিল্পোন্নতি — তোমার মনন —
জানাইলে যাহা দিল্লী দরবারে বসি
বঙ্গ অঙ্গচ্ছেদে তাহা করিলে সাধন।
ইতিহাস, তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষিত
যদিও এ নীতি তব অধুনা নিন্দিত।

২

রাজনীতি-বিশারদ রাজ-প্রতিনিধি,
চলিলে ভারত ছাড়ি দেশে আপনার,
প্রবর্ত্তিয়া যেই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিধি,
জানিনা দেখিবে কিনা সুফল তাহার।
জ্ঞানী তুমি, কিন্তু হায়, উদ্দেশ্য তোমার
হবে না সফল তুমি জানিও নিশ্চয়;
কি সাধ্য বুঝিবে নর, কার্য্য বিধাতার?
অশিব হইতে হয় শিবের উদয়।
ডালহৌসী হৈত যদি তোমার মতন
তা হ'লে এ কূটনীতি ফল প্রসবিত
তব কষাঘাতে দেখ বঙ্গবাসীগণ
ত্যজি ঘোর মোহ নিদ্রা, হইল জাগ্রত।
তোমার কৃপায় বঙ্গে যে অগ্নি প্রদীপ্ত
আশীর্ব্বাদ কর, থাকে চির প্রজ্জ্বলিত।

নিদ্রাভঙ্গ

বিধাতার আশীর্ব্বাদে জেগেছে বাঙ্গালী,
সেবিছে জননি-পদ সবে কুতুহলী;
ভাঙ্গিয়াছে ঘুম ঘোর,
আলস্য নিশার ভোর,
চলিয়াছে কার্য্যক্ষেত্রে নব বলে বলী
বিধাতার আশীর্ব্বাদে জেগেছে বাঙ্গালী।

দুই দিন পূর্ব্বে যারা মোহের স্বপনে
নিদ্রিত আছিল সুখে, আত্ম বিস্মরণে,
আজ কোন্ মন্ত্রবলে,
তাহারা সকলে মিলে,
দিতেছে জননি পদে নব নব ডালি?
বিধাতার আশীর্ব্বাদে জেগেছে বাঙ্গালী।

সাত শত বরষের দাসত্বে ডুবিয়া,
গিয়াছিল মনুষ্যত্ব যাহারা ভুলিয়া,

কোন্ দেবতার বরে
একতার মন্ত্র ধ'রে
তাহারা চলিছে পায়ে শত বাধা ঠেলি?
বিধাতার আশীর্ব্বাদে জেগেছে বাঙ্গালী।

তোমরা কারা

চিনিতে না পারিলাম
তোমরা কারা?
তোমাদের মুখ পানে
চাহিয়া আকুল প্রাণে
ডাকিছেন মাতা, তবু
নাহি দেও সাড়া!
তাই তো জিজ্ঞাসি ভয়ে
তোমরা কারা?

রহি জননীর বুকে
তোমরা তো মহাসুখে
হাসিতেছ, খেলিতেছ,
মাতৃদুঃখ দেখিতেছ
তবু নাহি রা
তোমরা কারা?

কভু উঁচু করি মাথা,
হইয়ে দেশের নেতা,
ভাসাও বক্তৃতা স্রোতে
এ পাড়া ও পাড়া,
তোমরা কারা?

কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্যে,
কিবা রাজনীতি ক্ষেত্রে,
বল দেশহিত কথা
লম্বা চওড়া;

ইঙ্গিতে পালাও ছুটে,
পদতলে পড় লুটে
প্রভুরা যখন দেয়
কঠিন তাড়া,
বল তোমরা কারা?

সন্তুষ্ট করিতে প্রভু
হিতৈষী সাজিয়ে কভু
লাখে লাখে চাঁদা দেও
চাহিলে তারা,

দেশবাসী অন্ন বিনে
মরে যদি অনশনে,
তবু নাহি গলে প্রাণ
এ কেমন ধারা?
তাই না চিনিতে পারি
তোমরা কারা?

বিনে 'কারি' 'কাট্‌লেট'
কভু নাহি ভরে পেট,
বাহিরেতে হিন্দুয়ানী
দেখাও পুরা;
যজ্ঞ, হোমে, দেবার্চ্চনে,
গৌরাঙ্গের খানা দানে
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি
কর গো মারা;
বল তোমরা কারা?

পেট্রিয়ট হইতে সাধ,
উপাধি সাধয়ে বাদ!
এ জগতে নাহি ব্যাধি,
উপাধি-বাড়া,
নাম তোমাদের ধর্ম্ম,
তার তরে যত কর্ম্ম,
দু নৌকায় দিয়ে পা
পড়গো ধরা,
দেশেই তো কর বাস,
খাইয়ে দেশের শাস
হইয়াছ এত বড়,
ধরা দেখ সরা
তবু তার শিরে পা
বুকেতে ছুরীর ঘা,
দেখি নাহি সরে রা
তোমাদের ধারা,
তাইতো সুধাই বাক,
তোমরা কারা?

দুষ্প্রাপ্য তিনটি গান*

কালীঘাট 'আর্য্যভাণ্ডার' থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় রাখী-সঙ্গীত

উদিল সুখ প্রভাত আজি বঙ্গের গগনে।
জাগো জাগো জনে জনে লভিয়া নব জীবনে।।
ভুলি স্বার্থ ভেদজ্ঞান এস হিন্দু মুসলমান
করহ প্রতিষ্ঠা প্রাণ মাতৃদেহে সযতনে।।
যেতে হবে আগে আগে মনে যেন এই জাগে
বিদেশের অনুরাগে চল সবে ভাই।।
ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গনে আজি 'রাখী'র বন্ধনে
বাঁধ সবে প্রাণে প্রাণে দাসত্বের বিমোচনে।

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষে গান

রাগিণী-বিভাস *তাল-একতালা*

হায় কি দুর্দিন আজিকার দিন
পড়িল অশনি বঙ্গের মাথায়।
আজিকে প্রভাতে, ভাই, ভাই সাথে,
হই ঠাঁই ঠাঁই, রাজার আজ্ঞায়।

দেখিয়া চৈতন্য হউক রাজার,
কার্জনের নীতি সাম্রাজ্য সংহার,
মাঞ্চেস্টার আর লিভার্পুল লিস্টার,
হয় মরুভূমি শাসনে অন্যায়।

যত দিন হায়! ছিন্ন অঙ্গ মার,
না লাগিবে জোড়া, করিব না আর,
আহ্লাদ আমোদ, বিহার প্রমোদ,
থাকিয়া সতত সন্ন্যাসীর প্রায়।

যে প্রতিজ্ঞা ভাই, করিয়াছি পণ,
দেশীয় গ্রহণ (আর) বিলাতি বর্জন
সেই ব্রত সবে, উদ্‌যাপিয়া তবে,
হও অগ্রসর স্বদেশ সেবায়।

---

* এই শেষ তিনটি গান 'জাতীয় রাখী সঙ্গীত' পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত। এগুলি ৩০-এ আশ্বিন রাখীবন্ধনের দিন গাওয়া হয়েছিল। এ সময়ের সমস্ত গানের মধ্যে শেষ গানটিই একমাত্র ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। — সম্পাদক।

গান

মিশ্র ঝিঁঝিট — একতালা

জাগহু জাগহু ভারতসন্তান,
জননি বদন, তনিক হেরো।
নিহারী ত্রসন, মলিন বদন
হিয়া কি ফাটয়, নাহীরে তেরো ।। ১।।

শিল্পী দ্বাদশী রসাতলবাসী,
গত পত নাহী বিদেশী বিনে।
ভঈ রাজ রাণী, আজু ভিখারিণী
তুহারী তুহারী, তুহারী গুণে ।।২।।

ভারত সন্তান, মরে অনশনে,
ধনী তব ধনে, বিদেশী জন।
ধিক্! ধিক্! ধিক্! তুহা শত ধিক্!
যদি না লাগয়, গলানী মন।।৩।।

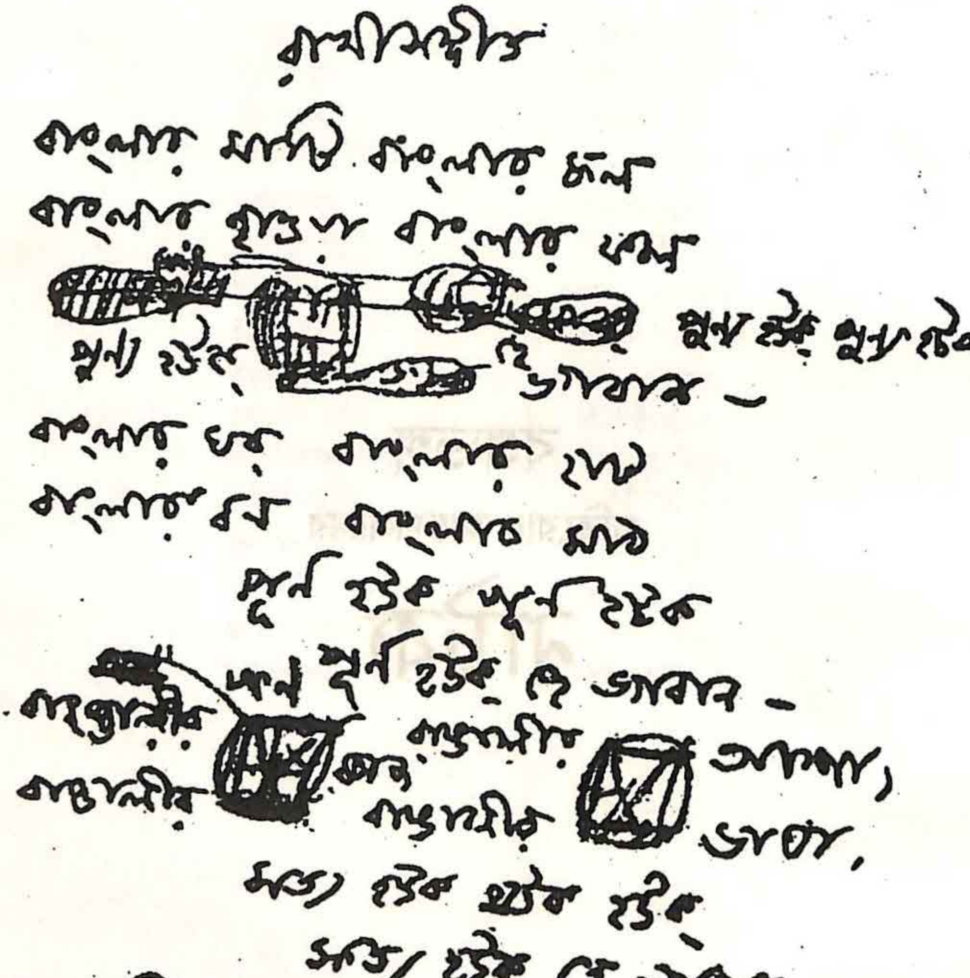
হিন্দু মহমদী পারসী, য়হূদী,
সব মিলী আজু করো রে পণ।
স্বদেশী অশন স্বদেশী বসন,
স্বদেশী লাগী রে, জীবন পণ।। ৪।।

ভারত সন্তান।।

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলনের

নাটক


রাখীসঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান —
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান —
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —
বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত রাখী সংগীত, ১৯০৫ (১৩১২) সালে রচিত

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

বা

The Partition of Bengal

(নাট্য-রূপক)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

(২৪শে শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

কলিকাতা

৯১নং হ্যারিসন রোড, "গ্র্যাণ্ড থিয়েটার বুক ষ্টল" হইতে

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১১৫/২, গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেশিন যন্ত্রে" শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : দুই আনা মাত্র।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

প্রস্তাবনা

নদীতীর।

মূর্ত্তিমতী বঙ্গমাতা, চতুষ্পার্শে ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভাগের অধিষ্ঠাত্রীগণ দণ্ডায়মানা।

গীত

বঙ্গমাতা। ছুরী মেরে হৃদমাঝারে
প্রাণ ছিঁড়ে মোর নিয়েছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে।।
বঙ্গমাতা। শেকল পায়ে বিকল হ'য়ে,
কত জ্বালা আছি সয়ে,
সাত কোটী দুঃখিনীর ছেলে
নয়ন জলে ভেসেছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে।।
বঙ্গমাতা। বড় আশায় পড়লো ছাই
ঘুচলো বলা ভাই ভাই,
ভারত জুড়ে করুণ সুরে
দুঃখের গলা উঠেছে রে।
সকলে। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে
না বেজেছে রে।।
বঙ্গমাতা। দোহাই তোমার লর্ড কার্জন
যুগযুগান্তর যে বাঁধন,
ছিঁড়লে তারে কাতরে,
কে না করে রোদন।
সকলে। সয় বলে হয়ে! আর কত সয় সারা
ভারত ডুবেছে রে,
বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার প্রাণে
না বেজেছে রে।।

প্রথম দৃশ্য

রাস্তা।

হুজুগরাম ও খয়ের খাঁ।

হুজুগ। সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, ভারত ছারেখারে গেল! হা অভাগিনী বঙ্গমাতা! আমরা অযোগ্য সন্তান, তোমার কিছুই করতে পারলুম না। এত (Agitation) এ্যাজিটেষন, এত (Muting) মিটিং, এত (Protest) প্রোটেষ্ট, সব মিছে হলো। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ তো কেউ রোধ করতে পারলে না। প্রায় বিশ বৎসর ধ'রে (Congress) করা গেল লক্ষ

লক্ষ টাকা খরচ হোলো, কি করলেম কি হোলো! (Governrment) গভর্ণমেন্টকে তো একটু (move) মুভ করা গেল না। যে ভেতো বাঙ্গালী, সেই ভেতো বাঙ্গালীই রইলুম।

(খয়ের খাঁর প্রবেশ)

খয়ের। কি হে হুজুগ রাম! এত (Agitation) এ্যাজিটেষন, এত (Muting) মিটিং, এত (Protest) প্রোটেষ্ট করে কোনটা কি দাঁড় করালে, (Bengal Partition) বেঙ্গল পার্টিসন রোধ হলো কি? না বল্লেও বাঁচিনি, তোমার অত মাথাব্যথা কেন? (Bengal) বেঙ্গলের ভেতর তোমার কখানা জমিদারি আছে? তুমি এতটা হৈ চৈ কোচ্চ কেন? কাগজওলারা চেঁচামেচি করছে, তার কারণ আছে। দেশের জন্য দুকথা না লিখলে, দুটো হৈ চৈ না করলে (subscriber) সাবস্‌ক্রাইবার ঠিক থাকবে কেন? তোমার অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণ 'দিন আন' দিন খাও তোমার (Patriotism) প্রেট্‌রিওটিসম দেখে লোকে হাসবে।

হুজুগ। ওকি বলছেন খয়ের খাঁ মশাই? বঙ্গসন্তান হয়ে জন্মেছি, বঙ্গমাতার ভাল মন্দ দেখব না। জানেন যে (Irish) আইরিষরা ইংরাজের চক্ষে (Rustic) রাষ্টিক, আজ যদি তাদের গৌরবের জন্মস্থান ইংলণ্ডের শ্রেণীভুক্ত কত্তে চান, তারা সে আহ্বান তুচ্ছ ক'রে যে (Rustic) রাষ্টিক (Irish) আইরিষ, তাই থাকতে চাইবে। দেখুন, আমাদের বাঙ্গালীর আর আছে কি? ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, আচার নেই, বিচার নেই, কিছুই নেই, যদি বাঙ্গালীর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু থাকে। তবে দুঃখিনী বঙ্গমাতার নাম। সেই বঙ্গমাতার বঙ্গচ্ছেদ! যুগ-যুগান্তর হ'তে সে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, আজ সেই বন্ধন ছিন্ন হল। এখন থেকে আর আমরা "সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে" একথা বলতে পারবো না। এখন সেই সপ্ত কোটীর স্থানে চার কোটীরও কম বলতে হবে। বলে কি মশাই, একি কম দুঃখ।

খয়ের খাঁ। হ্যাঁ বাবু! তোমার মত কোটী দেশ হিতৈষী এ খোটে জমাট হয়েছিল। ও যতই গলাবাজী কর, আর যতই লেখালেখি কর (Government) গভর্ণমেন্ট যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। এই সব মিথ্যা (Agitation) এজিটেষন করে ম'চ্চো। কি জান! যা কিছু বাঙালীর আশা ভরসা ছিল, সব ডুবিয়ে দিচ্ছো। দেশ হিতৈষিতার ফোয়ারা তুলে দিশী মোজা, গেঞ্জি, দেশাই*, এসব কত কি কল তৈরী হলো। কৈ বাপু টেকলো না তো? যাদের দেশলাই কাটীটী না হলে সন্ধ্যা বেলায় আলো জ্বালতে পার না, যারা কাপড়খানি না যোগালে স্বপরিবারে বস্ত্রহীন হয়ে থাকতে হবে, তাদের ওপর কি কারসাজি চলে বাপু, এখন দিন কতক চেপে চুপে থাক। নিজের অবস্থার উন্নতি কর। স্বজাতিপ্রীতি আর একটু ছড়িয়ে পড়ুক! তারপর (Goverment) গভর্ণমেন্টের ওপর চাল চালতে যাও।

হুজুগ। মশাই আর দেরী নেই, বাবু রমাকান্ত রায় জাপানে শিল্প শিক্ষা ক'রে এসে বাঙ্গালী ছাত্রের শিল্প শিক্ষার এক নূতন পথ দেখিয়েছেন; ভারত সন্তান এত দিনে নিজের অবস্থা বুঝেছে। তাই আজ এ দেশে শিল্পোন্নতি করার জন্য স্বনামখ্যাত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ এ সি বোনার্জি, মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে এ বৎসর স্বদেশীয় যুবকগণকে শিল্পশিক্ষার জন্য ইউরোপ জাপানে পাঠান হয়েছে।

খয়ের খাঁ। হ্যাঁ মানি বটে, এ একটা কাজের মত কাজ হয়েছে। বাজে গলা বাজী ও লেখা লিখি ছেড়ে এইসবে মন দাও, শুধু বঙ্গমাতা কেন, ভারতমাতার পর্যন্ত কাজ হবে।

(জনৈক ফিরিঙ্গীকে বেষ্টন করিয়া বালকগণের প্রবেশ)

---

*সম্ভবত শব্দটি দেশলাই হবে, ছাপার ভুলে দেশই হয়েছে। — এমন বানান ভুল আরও আছে। সংশোধন করিনি।
— বর্তমান সম্পাদক।

১ম বালক। দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কোরো না [।] তোমরা রাজা, আমাদের হয়ে লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল।

ফিরিঙ্গী। আরে এলোক ক্যা বলে, হাম তো কুচ সামঝে না।

২য় বালক। সাহেব! আমরা ঢাকা মনমন সিং প্রভৃতি বিভাগ থেকে লেখাপড়া শিখতে কলকাতায় এসেছি। আমাদের চারপুরুষের এখানে বাস। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কল্লে আমাদের মা জননীর বুকে ছুরি দেওয়া হবে।

ফিরিঙ্গী। কেয়া মুস্কিল! হাম মিউনিসিপালীটী রাস্তাবন্দী সাব হ্যায়। রাস্তা জরিপ কর্‌নে আয়া। হাম এসব বাত কেয়া জানেতো।*

৩য় বালক। দোহাই সাহেব! লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল, সাহেবের কথা লাটসাহেব শুনেন; বাঙ্গালীর কথা বড় একটা শুনেন না; তোমার ইংরাজ জাতির পায়ে ধরি তোমরা আমাদের জন্য এইটুকু উপকার কর, যেন তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করেন।

ফিরিঙ্গী। Oh how pitiable sight I see. Had I been the Viceroy and Governor General of India I would have at once stopped the partion of Bengal. ও হাউ পিটীএবেল্‌ সাইট্‌ আই সি, হ্যাড্‌ আই বিন দি ভাইসরয় এণ্ড গভর্ণর জেনারেল অফ্‌ ইন্‌ডিয়া, আই উড্‌ হ্যাভ এটওয়ানস্‌ ষ্টপড দি পারটীসন্‌ অব বেঙ্গল।।

(বালকগণের গীত)

সাহেব তোমার পায়ে পড়ি মান বাঁচিয়ে রাখ' প্রাণ।
বঙ্গমাতার অঙ্গ কেটে ক'র নাক' খান খান।
বঙ্গবাসীর চোক্ষের জলে,
দেখ না আজ পাযাণ গলে,
ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে, কর সাহেব দয়া দান।
লাটের কাছে গিয়ে তুমি,
রক্ষা কর বঙ্গ ভূমি,
মনের খেদে সবাই কাঁদে সোনার বাংলা আজ শ্মশান।

(সাহেবকে লইয়া বালকগণের প্রস্থান)

হুজুগরাম। দেখুন মশাই কি ব্যাপার দেখুন (School এর) স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত (Bengal Partition) বেঙ্গল পার্টিসন্‌ নিয়ে কিরূপ মর্ম্মাহত হয়েচে।

খয়ের খাঁ। তাই তো, তাই তো, এমন দৃশ্য তো কখন দেখিনি, আমায় (move) মুভ্‌ ক'রে দিয়েছে। চলতো চলতো সাহেবটাকে নিয়ে ছেলেগুলো কি করে, দেখা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগান

(Chittagong) চিটাগঞ্জের ফিরিঙ্গিগণ ও তাহাদের পত্নীগণ।

গীত

হতচ্ছাড়া বাংলা ছাড়া হ'য়েছি সব বেঁচেছি।
বরাত জোরে ঘুরে ফিরে এমন লাট পেয়েছি।।
হোলো জবর পার্টিসন্‌
মজা পেলে এই হাফকাষ্ট্‌ নেশন্‌।
অফিসে বাড়্‌লো প্রবিসন্‌
হো হো ড্যাম নিগার নেটিভের মাথা খেয়েছি।

* 'জান্‌তা' হবে। — বর্তমান সম্পাদক

পুঁই চিংড়ি খাই
খাস সাহেবের রাইট পাই
তাই কার্জ্জনের জয় গেয়েছি।
ক'রে চাটগাঁ কলনি,
দেখাব' কোন পিদ্রু, গমিস পিন্টো এন্টনি।
চুনোগলির নামটী কেমন ব'দলে নিয়েছি।।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

স্বামী ও স্ত্রী

স্ত্রী। হ্যাঁ গো মাছ খাবে না কি গো? চরণ তুলশীর বাড়ী থেকে ইলিস মাছের তত্ত্ব এসেছে, কত সাধ ক'রে কাঁচা ইলিসের ঝোল আর অম্বল রাঁধলুম, খাবে না কি গো।

পুরুষ। যা বল্লে বল্লে, আর ও কথা বোল না [।] মাছ খাওয়া তো দূরের কথা — ধোপা নাপিত বন্ধ।

স্ত্রী। কেন কি হয়েছে — মাছ বন্ধ, ধোপানাপিত বন্ধ? তোমার আবার কার জন্য ওষুধ হোল?

পুরুষ। জান না! আমরা যে মাতৃহীন হয়েছি।

স্ত্রী। ও কি কথা! বালাই-বালাই। ও কথা মুখে এন' না। এই যে আমি দেখে এলেম, মা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুর পূজা কচ্চেন, তুমি আবার মাতৃহীন হোলে কি ক'রে?

পুরুষ। তোমায় কি বোঝাব; মাতৃহীন হলে এক বৎসর কালা ওযুধ থাকে। কিন্তু এ কোন মার মৃত্যু হয়েছে জান? মার মা আমার মা, তোমার মা, সমস্ত বাঙ্গালীর মা — জন্মভূমি, মাতৃভূমি — বঙ্গমাতার মৃত্যু হয়েছে, এই অশৌচ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী।

স্ত্রী। কি বল'গো! তোমার যে আমি কথা বুঝতে পাচ্চিনি। এইবার' বছর তুমি মাছ খাবে না; কাপড় কাচবে না, খেউরি হবে না, বল কি?

পুরুষ। (খ) হায় অবোধ রমণী! কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল তুমি কিছু বুঝছো না? বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ, জন্মভূমি জননীর বুকে খড়্গাঘাত, মার অপমৃত্যু! — বার বৎসর অশৌচের কথা শুনে স্তম্ভিত হচ্চো, কিন্তু রাণাপ্রতাপের চরিত্র পড়েছ কি?

স্ত্রী। হ্যাঁ, বসুমতীর উপহারে যে "রাজস্থান" দিয়েছিল, তাতে রাণাপ্রতাপের কথা পড়েছি, তাতে হয়েছে কি?

পুরুষ। হয়েছে কি! সে মহাত্মা দেশের জন্য কিনা কঠোর সাধন করেছিলেন। বিলাস বৈভব ত্যাগ ক'রে, জটাজট ধারণ করে, অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন, রাজ রাজ্যেশ্বর হ'য়ে ঘাসের রুটী খেয়ে দিন কাটিয়েছেন; কেন? কিসের জন্য জান কি? দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান ক'রেছিলেন। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে আমরা কি কল্লেম, — বল্‌তে বুক ফেটে যায়, তাঁর তুলনায় কিছু কত্তে পাল্লেম না।

স্ত্রী। আচ্ছা, তুমি তো খুব হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়চো। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে আর কাউকে কিছু ক'রতে দেখেছো?

পুরুষ। আর কেউ কিছু করুগ না করুগ, আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্বো। শৌর্য্য বীর্য্যহীন বাঙ্গালী আমরা, অধঃপতিত বাঙ্গালীজাতি আমরা, আমাদের কিছুই নেই; এইটুকু ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে পার্ব্ব না। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশৌচ ধারণে পশ্চাৎপদ হব, এ কার্য্য পার্‌বে না? এ

জীবনে ধিক্ — জগৎ স্তম্ভিত হোক্, জানুক বাঙ্গালী যতই ঘৃণিত, দলিত, পদলেহিত জাতি হউক, তাদের (Will force) মনঃশক্তি যথেষ্ট আছে। যাহার তুলনায় পৃথিবীর সকল জাতিকে পরাস্ত হ'তে হবে, — জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হবে। ভাই বঙ্গসন্তান বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ! এস, এই দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশৌচ গ্রহণ কর। নতুবা জানবো তোমরা কেবল হুজুগপ্রিয় বাক্যবীর, অকর্ম্মণ্য, আর কিছু নয়।

স্ত্রী। ভগবান তোমাদের এই মতি গতি করুন। বাক্যবীর তোমরা, একটু কর্ম্মবীর হও। যদি যথার্থ এ কাজ কত্তে পার, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সব মেয়েদের পায়ে ধর্ব্বো, তাদের বুঝিয়ে বলবো, তারাও যেন তাদের স্বামীর স্বধর্ম্মের উৎসাহদাত্রী হয়।

(কন্যার প্রবেশ)

কন্যা। হ্যাঁ মা, আমি সকাল সকাল খেয়ে স্কুলে যাব ব'লে বামুর ঠাকুরকে ভাত দিতে বল্লাম, সে কেবল ভাজা, ডাল আর ভাত এনে দিলে। বাড়ীতে এত মাছ এলো কৈ একখানা দিলে না, আমি কি মাছ না হ'লে খেতে পারি। তাতে সে বল্লে কর্ত্তাবাবু হুকুম দিয়েছেন, আজ থেকে বার' বছর এ বাড়ীতে মাছ ঢুক্‌বে না।

পুরুষ। হ্যাঁ বিনু আমিই ব'লে দিয়েছি। আমাদের কি হয়েছে জান? রাজা বাহাদুর জন্মভূমি জননীর হৃৎপিণ্ড ছেদন করেছেন। তাই আমাদের বার বৎসর অশৌচ। তুমি যদি আমার মেয়ে হও, যদি আমার প্রতি একটু টান থাকে, তাহলে আমি যা করি তুমি তাতে দুঃখ কর' না।

কন্যা। হ্যাঁ বাবা, সত্যি তাই? তবে আর আমি মাছ খেতে চাইবো না। যদি না খেয়ে মরতে হয়, তবু মর্ব্বো, বার বছর আর মাছের কথা মুখে আনবো না।

গীত

মাছ খেতে আর চাইবো না।
ভাল ক'রে চুল বাঁধবো না।।
রাঙ্গা কাপড় আন্‌লে তাঁতিনী,
আমি আর তো প'রচিনি।
আল্‌তা প'রে আমোদ ভরে আর তো
চ'লবো না।
কাঁদবো সুধু "মা" "মা" ব'লে
আর তো কিছু বোলবো না।।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা।

পলিটিক্যাল মুর্দ্দাফরাসগণ।

গীত

তোদের বঙ্গমাতা খাল,
ও তোদের বঙ্গমাতা খাল।
দেখে আয় শিকলের পাহাড় হাঁসপাতাল।।
এ ফোঁড় ও ফোঁড় ফেলেছে চিরে,
কেঁদে মর' মাথা খোঁড়' পাচ্ছ না ফিরে,
তোরা বুঝবি কি ছাই পলিটিক্যাল চাল।।

কফিন বক্স এসেছে মেলে
গোর দোব কি পোড়াব' কি ফেলবো গঙ্গা জলে
এখন মিটিং ক'রে বল সকলে;
আমাদের নাইকো ঘুম, কড়া হুকুম
আজ হ'লে আর চাইনে কাল।।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাস্তা

(স্কুল ও কলেজের যুবকগণ)

১ম যুবক। আর কি ভাই, যা হবার তাই হ'য়ে গেল, যখন বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হলো, তখন আমরা যে দেশের মানুষ, সেই দেশে চ'লে যাই।

২য় যুবক। ভাই! রাজা আমাদের ওপর বিরূপ হ'য়ে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কল্লেন বটে, কিন্তু আমাদের যেন এইটী মনে থাকে — আমরা এক মার পেটের ভাই! কেউ ছাড়াছাড়ি কর্ত্তে পার্ব্বো না। পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে তবু এ শোণিত সম্বন্ধ কেউ ঘোচাতে পার্ব্বে না।

(বিলাসের প্রবেশ)

৩য় যুবক। একি বিলাস, তুমি এখনো জুতো পায়ে জামা গায়ে দিয়ে রয়েছ! আমাদের জাতীয় অশৌচ হয়েছে জান? বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এতদিনে শেষ হোল এ সংবাদ রাখ না? তুমি কি বঙ্গমাতার সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা পাও?

বিলাস। আমি তো জানিনি এ সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! আমি বাবার সঙ্গে হাওয়া খেতে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি আজ। সবে এসে কল্‌কাতায় পৌঁছেছি। Bengal Partition তা হ'লে হ'য়ে গিয়েছে।

৩য় যুবক। হ্যাঁ ভাই — আর কি বোলবো।

বিলাস। তবে আর কেন? আজ হতে আমিও তোমাদের মতন অশৌচ গ্রহণ কল্লেম। জুতা জামা বিলাসের সামগ্রী সব দূর হও। যদি স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মান রাখতে চাও, অকপট হৃদয়ে শপথ গ্রহণ কর, যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় দেশীয় শিল্পের উন্নতি ক'রে স্বদেশ জাত বস্ত্র দ্রব্যাদিতে গৃহপ্রয়োজনীয় সমস্ত অভাব পূরণ কর্ব্বো। আজ হ'তে আর বিদেশী পণ্যদ্রব্যে বাঙ্গালীর ঘর সজ্জিত হবে না।" ভাই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সপ্তকোটী বঙ্গসন্তান ছিলেম, আজ হতে মুষ্টিমেয় হতে চল্লেম। এস ভাই একবার জন্মের শোধ সপ্তকোটী কণ্ঠ মিলিয়ে বন্দেমাতরং গাই এস ; —

গীত

"বন্দে মাতরং"

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং
বন্দে মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্ত কোটি কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুফলাং সুফলাম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য

বঙ্গমাতা অঙ্গচ্ছেদ অবস্থায় ভূতলে পতিতা। ভারতসন্তানগণ দণ্ডায়মান।

গীত।

তুই যদি মা চ'লে গেলি কি সুখে আর থাকি বল্।
নয়ন দিয়ে উজান বেয়ে উথ্‌লে উঠে সাগর জল।।
সুজলা সুফলা শ্যামা
বঙ্গমাতা অনুপমা
জেগে উঠে কোলে নে মা হ'য়েছি চঞ্চল।।

ক্রোড়াঙ্ক

উজ্জ্বল দৃশ্য।

সস্ত্রীক সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্তির আবির্ভাব।

ভারতসন্তানগণের গীত।

এই যে মোদের দয়াল রাজা সিংহাসনে ব'সে।
দেশ বিদেশে ধন্য ঘোষে যাঁর নামের যশে।।
একটুখানি দয়া ক'রে,
বঙ্গমাতায় দাও গো ফিরে,
মা জননী হেথায় প'ড়ে সোনার অঙ্গ ধূলোয় মেশে।
দয়ার সাগর তোমায় বলে,
তুমিও কি নিদয় হ'লে
অভয় বাণী শুনবো ব'সে আছি ব'সে আশার আশে [।।]

যবনিকা পতন।

বঙ্গভঙ্গ
প্রতিরোধ আন্দোলনের
গল্প

বিনামূল্যে মাসিকপত্র বিতরণ!

কোহিনূর।

উৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচনী।

বিগত বৈশাখ মাসে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

কোহিনূর হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি—জাতীয় উন্নতি এবং জাতীয় সাহিত্যের কল্যাণকামনায় প্রচারিত। বঙ্গসাহিত্যের প্রধান্তনামা হিন্দু মুসলমান লেখকবৃন্দ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান লেখকগণের সমবেত সাহায্যে সুপরিচালিত।

কোহিনূর বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। ইহাতে মুসলমান আওলিয়া-তাপসদিগের জীবনী ও বৃত্তান্ত, "পাঠান বংশের ইতিহাস", "হিন্দু-মুসলমান," "বঙ্গভাষার মুসলমান লেখক ও মুসলমান সাহিত্য" প্রভৃতি প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়িবার মত বিষয়।

কোহিনূর লেখার ধরণ-ধারণ, কায়দা-কারণ, ছাপা-কাগজ, সাজ-সজ্জা সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট, অপূর্ব্ব ও অভিনব।

কোহিনূর প্রবন্ধ-গৌরবে—সাহিত্য-চর্চ্চায়—লেখক-সম্মিলনে ও চিত্র-নৈপুণ্যে অভিনব প্রণালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র।

কোহিনূর প্রায় সকল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে বিশেষ প্রশংসিত ও একবাক্যে সমাদৃত।

কোহিনূরে ধর্ম্ম-সমাজ, সাহিত্য-ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-কবিতা, গান-গল্প, উপন্যাস-ভ্রমণ এবং জীবনী প্রভৃতি যাহা কিছু সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ এবং যাহা কিছু সাহিত্যের গৌরব ও মঙ্গলকর তাহাই প্রকাশিত হয়।

নিবেদন হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি-উদ্দেশ্যে সাহিত্য-প্রচার—এই প্রকার উদ্যম আমাদের দেশে নূতন। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের অনুকম্পা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। "কোহিনূরের" গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবেন না কি? অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা অসমর্থপক্ষে ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। পাঠাগার ও সভা-সমিতি সমূহে এবং স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও মহিলাগণকে ১৲ এক টাকা মূল্যে প্রদত্ত হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "কোহিনূর"।
কোহিনূর সাহিত্য সমিতি।
পাংশা, বেঙ্গল।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির একটি প্রচারপত্র

রাখীবন্ধন

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

পিতাপুত্রের কখনও বনিবনাও হইত না। অধিকাংশ সময়েই দেখা যাইত পিতা দুর্গাচরণের মতের সহিত পুত্র আশুতোষের মতের আদৌ মিল হইত না। অধিকন্তু, লেখাপড়া শিখিয়াও কেন যে তাঁহার পুত্র আর্ত ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত, তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এ জন্য দুর্গাচরণকে প্রায়ই আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার লোকের কাছে দুঃখ করিতে দেখা যাইত। ধৈর্যশীল আশুতোষের এসব গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ যখন তাহাদের জমিদারীর প্রজারা প্রভাতে আসিয়া করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া আশুতোষের দ্বারা দুর্গাচরণকে জানাইল যে তাহারা দুর্বৎসর হেতু এবারে জমির খাজনা দিতে পারিবে না, তখন আর্ত প্রজাগুলির উপর পিতার দুর্ব্যবহার দেখিয়া সে একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিতান্ত কর্তব্য বোধে দুই একটি কথা কহিয়াছে মাত্র, এমন সময় দুর্গাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "আজকাল লেখাপড়া শিখিয়া তোমাদের ঐ হইয়াছে বাপু, কেহ কোন দুঃখ জানাইয়া কিছু প্রার্থনা করিলে, তোমাদের চাঁদার খাতায় নাম সহি করিবার ও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কার্য করিবার ক্ষমতাটি বিলক্ষণ হইয়াছে, বিশেষ তোমার ত পাত্রবোধে কখন কার্য করা—"

দুর্গাচরণ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার উচ্চারিত বাক্যের স্বচ্ছন্দ গতি দেখা যাইত না। সে কারণে এবারকার বক্তব্যটাও শেষ করা হইল না। অবসর বুঝিয়া আশুতোষ জানাইয়া দিল যে প্রজারা যাহা বলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। দেশের অবস্থা পিতার জ্ঞাত থাকাই সম্ভব, প্রজাদের খাজনাটা এবারে মাপ করিয়া দেওয়া হউক্।

পিতাপুত্রে কথাবার্তা অতি কমই হইত। কিন্তু দুর্গাচরণ কথাবার্তায় কোন বিষয়ে যদি পুত্রের তিল মাত্র অনৈক্য বুঝিতে পারিতেন, তখন কথাবার্তা অন্যরূপ ধারণ করিত। আশুতোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন। এবারেও তাহা বাদ গেল না। অতিরিক্ত রাগের ঝোঁকে শেষে তিনি আশুতোষকে বলিয়া উঠিলেন, "নিজে তুমি কখনও কিছু উপার্জন কর নাই, আমার আয় ব্যয় সম্বন্ধে তোমার কথাবার্তা নিতান্তই অশোভন দেখায়। আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব। তুমি আপনার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত আছ, তাহা লইয়াই থাক।"

আশুতোষের প্রতি দুর্গাচরণের এরূপ কঠোর উক্তি তাহার মনে গিয়া অত্যন্ত আঘাত করিল। সে যে পিতার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইবে, ইহা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাস্তব জীবনে তাহা লাভ করিয়া সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে ত বরাবরই পিতাকে স্বীয় উপার্জনের কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আশুতোষের ইচ্ছা ছিল যে নিজের সমগ্র উপার্জিত ধনে অক্ষম ও দীনদরিদ্রদিগের যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করিবে। কিন্তু দুর্গাচরণ আশুতোষের সে দিকে কোনওপ্রকার মনোনিবেশ যে আদপে পছন্দ করিতেন না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পুত্র একটু বড় হওয়া অবধি তিনি বরাবরই তাহাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়া আসিয়াছেন। বড়লোক জমিদারের পুত্র হইলে কিরূপভাবে জীবনযাপন করিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ আশুতোষের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

তাই আজ যখন দুর্গাচরণ আশুতোষকে কঠিন কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন, তখন সে আজ আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। পিতার অনলস্রাবী মন্তব্য শেষ হইলে সে জানাইল যে প্রজাদের রক্তশোষণ করিয়া তাহাদের লুণ্ঠিত ধনে তাহার স্পৃহা আদৌ নাই। দুর্বৎসরে প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা হত্যার নামান্তর মাত্র, সে বুঝিয়াছে। একমাত্র মাতৃহীন পুত্র ননীগোপালকে লইয়া সে আজই অন্যত্র গিয়া থাকিবে।

অনবরত কলহের মধ্যে থাকা অপেক্ষা দূরে শান্তিতে জীবনযাপন করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। উভয়েরই মন ইহাতে ভাল থাকিবার সম্ভাবনা।

পিতার অনুমতি পাইলে, আশুতোষ আপনার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র ননীকে লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে গিয়ে বাসা লইল।

২

আশুতোষ যে গ্রামটিতে গিয়া বাসা লইয়াছিল, সে গ্রামে তাহার সহপাঠী যতীশ নামে এক পুরাতন বন্ধু থাকিত। চেষ্টা চরিত্র করিয়া সে আশুতোষকে গ্রামের স্কুলে একটা মাষ্টারী জুটাইয়া দিল।

এই মাষ্টারীটি পাইয়া আশুতোষ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। পিতার নিকট যখন সে ছিল, লেখাপড়ার চর্চায় ও একরূপ নিশ্চেষ্টতায় তাহার জীবন কাটাইতে হইত। অধুনা কর্মের আস্বাদন পাইয়া পূর্বের বন্ধন-ভারগ্রস্ত জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছিল। অধিকন্তু স্কুলে অধ্যাপনার পর সে যে সময়টি পায়, তখন সে আপনার চিরপোষিত অভিলাষটি পূর্ণ করিবার প্রয়াস পায়। কোথায় কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্রের কি অভাব, গ্রামে কাহার কি অসুবিধা, তাহা দূর করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধনমুক্ত জীবনে যে এত আনন্দ সে পূর্বে জানিত না।

গ্রামের দীন দরিদ্র সকলেরই নিকট আশুতোষের প্রশংসা ধরিল না।

৩

পুত্রকে বিদায় দিয়া দুর্গাচরণ যে বিশেষ মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বরং তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, এখন তিনি যে সব কার্য করিবেন, তাহাতে বাধা দিবার লোক কেহ থাকিবে না। স্বেচ্ছামত কার্য বাধাবিহীন ভাবে করিলে যে একটা বিপুল আনন্দ পাওয়া যায়, এতদিন তিনি যেন তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আশুর বিদায়ের পর তিনি আপনাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে করিলেন।

কিন্তু একটি ছোট শিশুর স্মৃতি তাঁহার সকল কার্যের ও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। পৌত্রবিরহে তাঁহার হৃদয়ে যে বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার অন্ত তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ননী চলিয়া যাইবার পর দুর্গাচরণের গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহাকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, একটি সুগভীর নিরানন্দ ভাব সমগ্র বাটীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে যে বাটীতে শিশুর কলরব ও চাঞ্চল্যের বিরাম ছিল না এখন সে বাটীতে এই শান্তিপূর্ণ নীরবতা ও শব্দবিহীন শূন্যতা অনুভব করিয়া দুর্গাচরণের মন কাতর হইয়া পড়িত।

তিনি আপনার কর্মের মধ্যে, গৃহের মধ্যে কিছুতেই আর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রাতে জমিদারি সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দেখিবার সময় দেখিতেন যে চশমাটি পূর্বদিনে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই স্থানেই আছে। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার লোক এখন আর কেহ নাই। অগোচরে দোয়াত ও কলম লইয়া পলাইবে এমন লোকও আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূজা করিবার সময় ফুল চুরি করিয়া লইয়াও কেহ পালায় না। দুর্গাচরণের স্নানাহারও এখন নিতান্তই সঙ্গীবিহীনভাবে করিতে হয়। নিজের খাইবার সময় ননীর খাওয়া হইয়াছে কি না ভাবিয়া চিত্ত আকুল হইয়া উঠে। তাহাকে না খাওয়াইয়া তাঁহার কখন আহারে পরিতৃপ্তি হইত না। আজকাল সে কথা স্মরণ করিয়া নয়ন প্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দুর্গাচরণ একাকী যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেন, তাঁহার এক একবার হঠাৎ মনে হইত যেন দ্বারের আড়াল হইতে পরিচিত সুরে, "দাদামশাই — টু" শব্দ শুনিতে পাইবেন। যদিও দুর্গাচরণ জানিতেন যে চারিদিক খুঁজিলেও কাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তবুও তাঁহার চক্ষু দুইটি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিত। দর্শনান্তে তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত জলে ভরিয়া আসিত, ভাবিতেন, "কোথায় রে ননী, তুই আজ কোথায় গিয়েছিস, কোথায়?" সে যে গৃহে নাই, পথে নাই — সে যে তাঁহার অশ্রু অভিষিক্ত হৃদয়টি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেন না।

ননী চলিয়া যাইবার পূর্বে দাদামশাইয়ের নিকট শয়ন করিত। আজকাল বৃদ্ধ একাকী শয্যায় শয়ন করেন। বিছানায় পার্শ্বের স্থানটি শূন্য দেখিলে শয্যায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না; প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে।

নিশীথ রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসেন। নিশীথিনীর অন্ধকারে অনুভব করেন যেন তাঁহারই অব্যক্ত বেদনা অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!

৪

দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা অবধি ননীরও মন আদপে ভাল ছিল না। দাদামশাইকে ছাড়িয়া কখন যে নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে সে জানিতে পারে নাই। একদিন হঠাৎ ঘুমের পর জাগিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখে যে নূতন একটি ঘরে সে শুইয়া আছে। শয্যার পার্শ্বে দাদামশাই নাই, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে বাবা সে ঘরে একাকী বসিয়া পার্শ্বের একটি টেবিলে বই রাখিয়া পড়িতেছেন। আশুতোষকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানিতে পারিল যে তাহাদের দুইজনকেই এখানে থাকিতে হইবে। দুর্গাচরণের সহিত ননীর সাক্ষাৎ হওয়া যে আর সম্ভব নহে, সে কথা আশুতোষ আর ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। কিন্তু কি জন্য যে ননীর প্রতি এরূপ কঠিন শাস্তি বিহিত হইল, ক্ষুদ্র শিশুজীবনে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া আসা পর্যন্ত তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল।

খেলায় ও সর্ববিষয়ের সাথী দুর্গাচরণকে ছাড়িয়া পুত্র ননীগোপালের যে কতদূর কষ্ট হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আশুতোষ পূর্ব হইতেই তাহার জন্য খেলনা ও নানাবিধ ছবির বহি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ননী মধ্যে মধ্যে তাহা লইয়াই একাকী ব্যস্ত থাকিত কিন্তু খেলার মধ্যেও সে এক এক দিন অকস্মাৎ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিত। আশুতোষ তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি তখন আপনার স্নেহক্রোড়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন।

৫

ইহার মধ্যে একটা নূতন ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরবাটী হইতে ননীর দিদি নলিনীবালা পূজার পূর্বে বাটী আসিয়াছে। সে-ই এখন ননীকে অনেক সময় ভুলাইয়া রাখে। গল্প বলিয়া ছবির বহি দেখাইয়া তাহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলে। নলিনীর এই সবে দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে; সে তাহার শ্বশুরবাড়ীর কত কথা ছোট ভাইটিকে বলে। সে সব কথা বুঝিত না, কিন্তু দিদির নিকট দ্রব্যাদি লইবার লোভে সে চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইত। চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে নলিনী ধমক দিত, "যা তোর আর গল্প শুনেও কাজ নেই, আর খেলনা নিয়েও কাজ নেই, সেই যে নূতন বাঁশীটা এনেছি তা আর কাউকে দিলেই হ'বে, তুই ত নিবিনি!

একটি ফুৎকারে যেমন দীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইয়া যায়, তেমনি ননীর মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া যাইত। দিদি আবার তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া, আদর করিয়া নিজের ভাল বাক্সটি খুলিত। যে জিনিষটি লইবে তাহা ননীকে নিজেই নির্বাচন করিয়া লইতে বলিত।

একদিন এইরূপ করিয়া নলিনী ছোট ভাইটিকে ভুলাইতেছে, এমন সময় ননীর দিদির বাক্সের ভিতর যত্নে রক্ষিত "কুন্তলীন" ও "দেলখোস্" শিশি দুইটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি দিদি?" দিদি কহিল, "ওর নাম দেলখোস্, রুমালে মাখতে হয়, খুব ভাল ফুলের গন্ধ এর ভেতর। আর এই যে এটা, এটা মাখলে চুল খুব বড় হয়। তুই নিবি?" দেলখোসের শিশিটি হাতে লইয়া ননী বলিল, "আমি শুধু এটা নেব"। শিশিটির গন্ধের আঘ্রাণ লইয়া সে তাহা পুনরায় দিদির বাক্সের ভিতরই রাখিয়া দিল।

এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিয়া যাইত। আশুতোষ আপনার কার্যে দিন রাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। কন্যা নলিনী আসা অবধি তিনি ননীগোপালের কোন খোঁজ খবর লওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না।

৬

দাদামশাইকে এ কয়দিন আর ননীর মনে পড়ে নাই। কিন্তু যখন পূজার কথা সে শুনিল, তখন তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই পূজার সময় তিনি কত জিনিস তাহাকে দিতেন, কত আদর করিতেন, সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু সে পূজাও হইয়া গেছে। এত আশা করিয়াও দাদামশাইয়ের সহিত দেখা না পাইয়া ননীর মন বড় খারাপ হইয়া গেল। দাদামশাইয়ের কথা দিদি ও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর পায় না। দিদি নাকি আবার বলিয়াছে যে দাদামশাই তাহাদের উপর রাগ করিয়াছেন। তাই সে এখন দিদির সহিত তেমন করিয়া হাসিয়া কথা কহে না। এমনকি গল্প শুনিতে তাহার আজকাল তেমন আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নলিনী তাহাকে অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। এমন সময়ে সে আশার একটি উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তাহার সহিত ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে। যে ঘটনাটি লিখিতেছি, সেই ঘটনার পূর্বের বৎসরে বঙ্গবিচ্ছেদ হইয়া গেছে। তাহারই বাৎসরিক দিনে ননীদের গ্রামে যে রাখীবন্ধন, সঙ্কীর্তন ইত্যাদি হইবে, তাহার বিষয়ে নানা প্রকার গল্প করিয়া নলিনী ভ্রাতাকে হর্ষোল্লাসে সঞ্জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিত। ননী নানারূপ প্রশ্ন করিত। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি রাখীবন্ধন কাকে বলে?" নলিনী রাখীবন্ধনের উদ্দেশ্যটি ছোটভাইটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বলিল, "সে দিন ভা'য়ে ভা'য়ে ভাব করিতে হয়। ভাই যদি রাগও করেন, তবুও সব ভুলিয়া তাঁহার হাতে রাখী পরাইয়া দিতে হয়।"

দিদির নিকট রাখীবন্ধনের এই কথা শুনিয়া অবধি একটা ভারি মজার কথা তাহার মনে উদিত হইত, কিন্তু সে কথা দিদিকে প্রকাশ করিয়া জানাইত না।

৭

রাখীবন্ধনের দিনে আশুতোষ যখন গঙ্গাস্নান করিয়া অধিকবেলায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ভীতচকিতা নলিনীর মুখে শুনিলেন যে ননীকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে নলিনীর সঙ্গে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে গিয়াই সে বাটী ফিরিয়া যায়। কয়দিন হইতে তাহার শরীর খারাপ বলিয়া সে গঙ্গাস্নান করিতে চাহে নাই। নলিনী বাটী আসিয়া দেখে ননী কোথাও নাই।

আশুতোষ চিন্তিত হইয়া থানায় খবর পাঠাইলেন এবং নিজেও অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথাও ননীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

৮

"দাদামশাই, — টু!"

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বাহিরের ঘরের বিছানায় যেরূপ প্রত্যহ শয়ন করেন, আজও সেইরূপ শয়ন করিয়াছিলেন। আশু ও ননীকে বিদায় দিয়া তাঁহার মন যে এত খারাপ হইবে তিনি পূর্বে ভাবেন নাই। সর্বদা মনে হইত যে পুত্র আশুতোষ ও তাঁহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। পিতৃ-গর্ব ভুলিয়া তিনি যদি জয়ী হইতে পারেন, তবেই আশু ও ননী উভয়েই তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে কথা স্মরণ করিলেই তাঁহার আশঙ্কা হয়। ফল কি হইবে কে জানে? তাঁহার পক্ষ হইতে জয়ের ত কোনও আশাই দেখা যায় না। পুত্র যেরূপ আত্মসম্মানপ্রিয় সে যে বাটী ফিরিয়া আসিবে এরূপ আশা দুর্গাচরণ কিছুতেই করিতে পারেন না।

আজ আহারান্তে শুইয়া শুইয়া তিনি এই সব কথাই মনের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে আপনার নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সুমধুর শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত পরিচিত আহ্বানবাণীটি হইতে তিনি অনেকদিন বঞ্চিত ছিলেন।

দাদামশাইকে ডাকিয়া ননী আপনার হস্ত দুইটি পিছনে রাখিয়া অপরাধীর ন্যায় দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরে যাইবার তাহার সাহস কুলাইতেছিল না। যদি দাদামশাই বকেন। তাই অতি ভয়ে ভয়ে, ধীরে ডাকিল, "দাদামশাই, — টু।"

দুর্গাচরণ বজ্রচকিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। পূর্বে এক এক দিন মনে হইত বটে যেন পরিচিত শিশুকণ্ঠে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, কিন্তু আজ আর কোন ভুল নাই। বৃদ্ধ শয্যা ত্যাগ করিয়া ননীকে ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার শয্যায় আসিয়া বসিলেন। বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে অস্থির করিয়া দিলেন।

ননী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দুর্গাচরণকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "দাদামশাই, তুমি আমার ওপর রাগ করনি?" দুর্গাচরণ আপনার কম্পিত হস্ত তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটির উপরে রাখিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমি কি তোমার ওপর রাগ কর্তে পারি?"

"তবে কেন তুমি আমাদের বাড়ী পুজোর সময় যাওনি?"

চক্ষের জলে বৃদ্ধ ঠিক মনোমত উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। মনে মনে বলিতেছিলেন, "দাদা, আমি যা পারিনি, তুই আজ তাই করেছিস।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কোনও কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

"দাদামশাই, এই দেখ তোমার জন্যে আজকে আমি কি এনেছি!" এই বলিয়া ননী তাহার জামার পকেট হইতে শিউলির ফুলের বোঁটায় নিজ হস্তে রঞ্জিত একটি রাখী বাহির করিয়া স্নেহ-সুকোমল হস্তে দুর্গাচরণের শীর্ণ হস্তে পরাইয়া দিল। অপর পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি শিশি বাহির করিয়া সে শয্যার উপর রাখিয়া দিল।

"দাদামশাই, তুমি বড় ফুল ভালবাস, এই দেখ কেমন একটা শিশি এনেছি। এর ভেতর কেমন ফুলের গন্ধ। দিদি বলেছে, আজকের দিনে সবাইকে দিশী জিনিস দিতে হয়। তোমাকে দেবার জন্যে আমি এটা এনেছি। তুমি আমাকে এবার পুজোর সময় কিছু দাওনি—"

এক নিঃশ্বাসে ননী এই কথা কয়টি বলিয়া গেল। এতদিন আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে দারুণ অভিমান লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ সে অভিমান আর কিছুতেই গোপন রাখিতে পারিল না। রুদ্ধোচ্ছ্বাসে নির্ঝরের ন্যায় বালকের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দুর্গাচরণ অনেক করিয়াও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে দুর্গাচরণের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

৯

ননীগোপাল যেদিন তার দাদামশাইয়ের সহিত দেখা করিতে যায়, সে দিন তাহার কিছুই আহার হয় নাই। আশুতোষ ও নলিনীর অগোচরে সে প্রত্যুষেই নগরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। পথ না জানায় ও রৌদ্র উঠায় কিছুদূর অবধি গিয়া সে আর হাঁটিতে পারে নাই। রাস্তার ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কাঁদিয়াছিল। অবশেষে একজন ভদ্রলোক দয়া পরবশ হইয়া নিজের গাড়ী করিয়া প্রিয়দর্শন বালকটিকে দুর্গাচরণের বাটীর নিকট নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান। কয়দিন হইতে ননীর শরীর ভাল ছিল না। আজ দ্বিপ্রহরে রৌদ্র লাগিয়া তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ দেখিলেন, ননীর জ্বর হইয়াছে। সন্ধ্যামুখে বালকের জ্বর শীঘ্র বাড়িয়া উঠায় তিনি ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। নিজে শয্যার পার্শ্বে ননীর ক্ষুদ্র দুইটি হস্ত আপনার হস্তে তুলিয়া লইয়া একাকী বসিয়া রহিলেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া ঔষধ লিখিয়া চলিয়া গেলেন। আসার কথা তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না।

বেশী রাত্রে প্রলাপের লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিল। বালক তখন ভুল বকিতে আরম্ভ করিল।

দাদামশাই তোমার হাতটা একবার এগিয়ে দাও না রাখীটা পরিয়ে দিই। আমার উপর তুমি রাগ করনি—"

প্রভাতে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ননী কাহার প্রত্যাশায় ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রহিল। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সে পুনরায় নীরবে চক্ষু বুজিয়া শুইল।

দুর্গাচরণ আশু ও নলিনীকে আনিতে পূর্বেই লোক পাঠাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে ডাক্তার আসিয়া বালকের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্বে আশু ও নলিনী যখন আসিয়া পৌছিল, তখন নির্বানোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ননী আর একবার সচেতন হইয়াছে।

নলিনীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "দেখ দিদি, দাদামশাই আর আমাদের ওপর রাগ কর্বেন না বলেচেন, তাঁর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে, দেখ, কেমন তাঁর হাতে আমি রাখী পরিয়ে দিইচি—"

[কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩১২]

পূজার চিঠি

যশোমালিনী দেবী

বন্দে মাতরং

দেখ, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলেই ভারি একটা গোলমাল ঠেকে, সেই জন্যই ত দুই মাস ছ'মাসের একখানা চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। কি পাঠ লেখা যায়? প্রাণনাথ, প্রাণকান্ত, হৃদয়সর্বস্ব, জীবনসখা — এ পাঠগুলো মনে হলেই বোধহয় কে যেন চুলের মুঠি ধরে সবেগে পিঠে শতমুখী চালাচ্ছে। ও সম্বোধনগুলো যাত্রার দলের গোঁফ কামানো নকল মেয়েদের নাকি সুরেই শোনায় ভাল। এমন কি, একালে উপন্যাস স্বর্গ থেকেও এ সম্বোধনগুলি নির্বাসিত হয়েছে; অতএব আমায় মাফ কর, সম্বোধনটা উহ্য রৈল।

ঠাকুরঝি বলেন, প্রিয়তমেষু পাঠটি মন্দ নয়; প্রাণাধিকেষু আরও ভাল। কিন্তু সম্বোধনের এত জাতিবিচারের আবশ্যক? তুমি আমার প্রাণের 'অধিকেষু' তাতে তোমার সন্দেহ আছে কি না তা তুমিই বলতে পার, কিন্তু আমি যে তোমার প্রাণের 'অধিকেষু' তা আমার এই বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়সেও যদি বুঝিতে না পারি, তা হ'লে ভগবানের উচিত ছিল আমাকে দাড়ি গোঁফ দিয়ে কেরাণী করে আফিসে পাঠানো। কিন্তু আমার এই কথায় যদি তুমি মনে করে থাক, কেরাণীদের আমি একটি সপুচ্ছ ভারবাহী চতুষ্পদের সঙ্গে তুলনা করচি, তা হলে বড় অন্যায় হবে। সহিষ্ণুতায় তারা কেরাণী জীবনের আদর্শ সন্দেহ নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে খাটো!

অনেক দিন পত্র লিখিনি বলে গোসা হয়েছে। দেখ্‌চি তুমি ভারি অবুঝ! সংসারে কত কাজ জান ত? বুড়ো শাশুড়ী ভোরে উঠে সংসারের দাসীবৃত্তি করবেন, রাত্রি পর্যন্ত একভাবে খাটবেন, আর আমি দিনের মধ্যে তিনবার সাবান মাখবো, কাপড় বদলাবো, দুপুর বেলায় দেখনহাসি কি বেগুনফুলের বাড়ী তাসের আড্ডায় মিশবো, আর সন্ধ্যা না হতেই 'সখি, আমায় ধর ধর' অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে নবেল না পড়লে বাঁচবো না, এত আবদার আমাদের মত গৃহস্থের বৌ ঝির সহ্য হয় না।

কিন্তু ভগবান ত নারীহৃদয় দিয়ে ভারতে পাঠিয়েছেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখন রাত্রে টুনুরাণীকে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কতদিন স্বপ্নঘোরে দেখিছি, তুমি যেন মেঘে চড়ে অন্ধকার ঘরে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছ, তোমার চোখে যেন চাঁদের আলো, মুখের হাসিতে যেন কত বাঁশির স্বরমাধুরী, আর নিশ্বাসে যেন ফুলের গন্ধ! আর তোমার সেই স্বপ্নময় স্পর্শ, সে স্পর্শে যেন কত জন্মজন্মান্তরে বিস্মৃত সুখ মনে পড়ে; মনে হয়, —

"পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে?
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?"

কিন্তু যাক এ সব উৎকৃষ্ট কাব্য, কাব্য প্রকাশের বয়স আর আছে কি? এখন যে আমি ছেলের মা!

তবু সত্যই এক এক সময় মনের মধ্যে হু হু করে, কেন তার কারণ খুঁজে পাইনে; কি যেন অতৃপ্তি, কি যেন অভাব! কবির ভাষায় কি ইহারই নাম বিরহ? কবি গাহিয়াছেন,

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

আমি কিন্তু কবি হলে গাইতাম,

বিরহরে, তুঁহু মম প্রাণ সমান।

বিরহ প্রিয়জনের স্মৃতিকে উজ্জ্বল, মধুময় ও উপভোগ্য করে তোলে; প্রাণই সেই কাঁচা সোনার কষ্টিপাথর। প্রাতঃসূর্যের লাল আলো, ভিখারীদের মোটা সুরে আগমনী গান, দীঘির পর পারে সুদূর মাঠে বিকশিত কাশ-কুসুমের শুভ্র-শোভা, আর রাত্রে চাঁদের মধুর হাসি — এ সব যেন কেবল মিলনেরই মধুর বার্তা বহন করে আনচে। সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখের দেবতা বিধাতা পুরুষ যদি খুব লম্বা দাড়ি গোঁফে সাজসজ্জা করে, পিঙ্গল বর্ণ নিবিড় জটাজালে আচ্ছন্ন হয়ে আপাদমস্তক ভস্ম মেখে সাধু সন্ন্যাসীর মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতেন, আর দক্ষিণ হাত তুলে বলতেন, 'বল্ তোর কি বর চাই?' তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে হাতজোড় করে বল্‌তাম, 'আমি অমর হতে চাইনে, কেবল আমি যার তার কাছে ইচ্ছামত উড়ে যাবার বর চাই'। নিজ গুণে মাঝে মাঝে ধরা দেও বটে, কিন্তু তোমায় ধরে রাখি এত শক্তি আমার কোথায়?

পূজার ত আর দিন পনের মাত্র দেরি আছে, তুমি আর দশ বার দিন পরে বাড়ী আস্‌চো শুনে আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তাও ত এখনও কম দেরি নয়। যদি বিরহের মেয়াদটা লম্বায় দশ দিন হয় তা হলেও সে হচ্ছে দুশো চল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ চৌদ্দ হাজার বারশো মিনিট! বাসরে! এক একটা দিন যদি চব্বিশ ঘণ্টায় শেষ না হয়ে চব্বিশ মিনিটে কাবার হয়ে যেত, তা হলে বেশ মজা হতো; কিন্তু আরও কিছু চাই; তুমি বাড়ীতে যে কদিন থাকবে, তার এক একটা দিন কুম্ভকর্ণের নিদ্রার মেয়াদের মত লম্বা হ'লে একরকম চলে! কিন্তু হায়, আমি কি স্বার্থপর! স্বদেশী মামলায় স্বদেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা কর্তে গিয়ে আজও যাঁরা জেলে দিন কাটাচ্ছেন, এ আনন্দোৎসবের মধ্যে তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনায় আমাদের অবসরের যেন অভাব না হয়।

এখানে মেয়েদের দলে স্বদেশী আন্দোলন কেমন চল্‌চে, জানতে চেয়েছে; দুই এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না; আমরা সখীতে সখীতে কি কোন পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে 'বন্দেমাতরম্' বলে সম্ভাষণ করি। সে দিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দত্তদের নিরুপমার সঙ্গে দেখা হলো। সে তার স্বামীর কাছে বরিশালে থাকে, তার স্বামী একজন ডেপুটী। নিরুর সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্র সে একটু হেসে মাথা নুইয়ে আমায় বলে 'বন্দেমাতরম্', — শুনে অনেক বৌ ঝি হাসলে; আমি বল্লেম, 'সে কি লো! তোর স্বামী যে ডেপুটী, তুই পথেঘাটে বন্দেমাতরম্ বলছিস্, তাঁর চাকরী থাকবে ত?' নিরু বল্লে, 'আমি তো আর সরকারের গোলাম নই; আর সরকারের চাকরী করে বলেই কি ছেলে মাকে সম্মান করবে না? ওদের কি এতই অধঃপতন হয়েছে মনে করিস্? —শুনে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এখানে একটা স্বদেশী মামলা হয়ে গিয়েছে, কয়েকটি ছেলে ফৌজদারীর আসামী হয়েছিল, আমরা মেয়েরা চাঁদা তুলে তার মামলার খরচ চালিয়েছি; একটি মেয়ের হাতে টাকা ছিল না, সে তার সোনার মাকড়ি কাণ থেকে খুলে দিলে। স্বদেশীতে তোমরা আমাদের জিতে যাবে তা মনে করো না। আমাদের কার্যক্ষেত্র পুলিশের রেগুলেশন লাঠির সীমানার বাহিরে। আমাদের স্বদেশী যারা দমন করতে আসবে, তাদের জন্য মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি, তার এক একটি খিল যেন দধীচি মুনির এক একখানি অস্থি!

নিরু এখানে এসে খুব স্বদেশী প্রচার করচে, এমন কি আমাদের বাড়ীতেও তার প্রচারকার্যের বিরাম নেই! আমাদের ঝি ভবির হাতে কাচের চুড়ি ছিল, আমি তাকে চুড়ি ভাঙ্গতে কতবার বলেছি কত লোভ দেখিয়েছি; ভবি ভুলবার নয়।' কিন্তু নিরু ভবিকে আচ্ছা রকম সায়েস্তা করেছে! নিরু একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে ভবিকে এক গ্লাস খাবার জল দিতে বল্লে; ভবি এক গেলাস জল এনে দিলে; হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নিতে গিয়ে নিরু তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলে, মুখ বাঁকা করে বল্লে 'তোর হাতে জল খাব না'। —ভবি বল্লে, "বেশ দিদিমণি, আমি কি জাত? আমি গয়লার মেয়ে!" নিরু বল্লে, "জাতে তুই গয়লার মেয়ে বটে, কিন্তু আচরণে তুই মেথরের অধম, বিলিতি চুড়ি হাতে দিয়ে তুই আমাকে জল দিতে এসেছিলি, তোর একটু লজ্জা হ'ল না?" — ভবির চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগলো, আর কিছু না বলে সে চলে গেল, তারপর জাঁতির ঘা দিয়ে চুড়ি দুগাছা ভেঙ্গে আর এক গেলাস জল নিয়ে এল। এবার জল পানে আর নিরুপমার আপত্তি হলো না; সে আমাকে বল্লে শৈল, 'ওকে দুগাছা শাঁখা কিনে দিস্।'

টুনু আমার আড়াই বছরের মেয়ে, সে বলে, 'মা, আমি আঙা কাপল নোব, বিলিতি কাপল পলবো না।' সবচেয়ে মজা হয়েছে তোমার পিসিমার হরিনামের ঝোলা নিয়ে। ঝোলাটির ত সতেরো জায়গায় রিপু করা, মান্ধাতার জন্মের দুই দশ বৎসর আগে কি পরে সেই ঝোলার সৃষ্টি, তা ঠিক করা ভারি শক্ত। ঝোলাটির এক ধারে সবুজ আর একধারে লাল মখমল, তার উপর সুতো দিয়া 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা' মার্কা মারা। আমি বল্লাম, 'পিসিমা, তোমার হরিনামের ঝুলির উপর পর্যন্ত বিলিতি কাপড়ের নিশান উড়িবে, তোমার উপর কি নারায়ণের দয়া হবে?' — পিসিমা তারপর না হবে বিশজনের কাছে সেই কাপড় যাচাই করেছেন, কিন্তু কেউ বল্লে না যে কাপড়টা দেশী। তখন তিনি একদিন নদীর জলে ঝুলিটি ভাসিয়ে দিয়ে এলেন! তাঁর জন্যে একটা দেশী কাপড়ের ঝুলি যেখান থেকে পাও নিয়ে এসো। আমিই তাঁর ঝুলিটির গঙ্গাযাত্রার কারণ।

তারপর? — তুমি ত বাড়ী আসচো; আমার জন্যে কি আনতে হবে জান্‌তে চেয়েছ। তুমি নিজে এলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হবে; তবে দুই একটা বরাত না দিলে হয়ত তুমি মনে ভাবতে পার আমি অভিমান করে বসে আছি। দেখ, সেদিন ঘোষেদের সুকুমারীর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ ছিল, সুকুমারীর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ ছিল, সুকুমারীর মামাতো বোন কল্লোলিনী কলকাতায় থাকে, সেদিন একটা তেল দিয়ে চুল বেঁধে এসেছিল; হঠাৎ যেন সদ্যফোটা গোলাপের মিষ্ট গন্ধে ঘরটি ভরে উঠল, বিস্তর রকম তেল দেখেছি, কিন্তু তেলের এমন মিষ্ট মোলায়েম গন্ধ আর কখন নাকে যায়নি। শুনলাম, সেটা গোলাপগন্ধি কুন্তলীনের গন্ধ! তবু তার আগের দিন বৈকালে চুল বাঁধা। কল্লোলিনীর পাশে আর একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে আগে আর কখনও দেখিনি, কে অনাথ বাবু মুন্সেফ আছেন, তাঁরই মেয়ে; নামটি বেশ, — পারুল। তার সোনালী জরির 'বন্দে মাতরম' পেড়ে কাপড় থেকে একটা চমৎকার এসেন্সের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল! সেই মধুর গন্ধটিতে যেন উৎসবের আমোদ আরও জমাট বেঁধে আসছিল। তিনি ত রেগেই খুন! —বল্লে, 'কাপড়খানি ত বন্দে মাতরম পেড়ে, কিন্তু এসেন্সটা যে বিলিতি, — এক কলসী দুধে এক ফোটা গোচোনা!' পারুল হেসে বল্লে, 'গাল দেও কেন দিদি, বিলিতি এসেন্স কোন্ দুঃখে মাখবো? স্বদেশী এসেন্স দেলখোসের নামও কখনও শোননি?' বিনি ত অপ্রতিভের এক শেষ! —এ রকমের কাপড় একখান, আর কিছু কুন্তলীন ও দেলখোস আনবে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, ডাকের সময় যায় যায়। কত কথা লিখিবার থাকে, সব কথা কি ছাই মনে আসে? আর মনে এলেও কলমের মুখে আসে না। এ লোহার কলম, পুষ্পশর নয় তা মনে রেখো, অতএব এখানেই তোমাকে মুক্তি দান করা গেল। ইতি।

তোমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো

শৈল।

[কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩১২]

পরাজয়

আশালতা সেন (নারায়ণগঞ্জ)

১

দুপুর বেলায় সে দিন আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। রাশিরাশি কালো মেঘ মহানগরীর সমস্ত ছাদগুলার উপরে একটা দুর্ভেদ্য আবরণের সৃষ্টি করিয়া করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল।

তখন উত্তরের দিকের নির্জ্জন বারান্দায় বসিয়া আমার ও পিসিমার একটা আলোচনা চলিতেছিল। পিসিমা বলেতিছিলেন,—

"আমায় আর কতদিন ভুলাবি? এবার ত তোর পরীক্ষা হয়ে গেল এখন বিয়েটা কর।"

শিশুকালে মার মৃত্যুর হইতে আমি পিসিমার কোলেই পালিত সুতরাং আমি তাঁহার নিতান্তই একলার সম্পত্তি। পিসিমার বিশ্বাস তাঁহার রমেশের মত ছেলে এ কলিকালে দুটি নাই। এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। নূতন স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া অনেক ছাত্র পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিল, স্কুল কলেজ ছাড়িয়াছিল, কিন্তু আমি সে বৎসরেই একেবারে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতীর আদর্শ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম; এবং পরীক্ষার পর অবসরের কয়েকমাস স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে নিজের নামটিও বেশ জাহির করিয়া তুলিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, "পিসিমা! দেখছ না আমাদের দেশের কেমন বিপদ উপস্থিত। ছেলেরা সব লেখাপড়া বন্ধ করে রাস্তায় রাস্তায় হুটপাট করে বেড়াচ্ছে আমি মনে করেছি খবরের কাগজে লিখে লিখে এ সব বন্ধ করব। এখন কি বিয়ে করবার সময়?"

কিন্তু আমার এই মহৎ উদ্দেশ্যে সে দিন পিসিমা কোন সান্ত্বনা পাইলেন না। সম্প্রতি তিনি বাতের ব্যারামে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (যদিও আমি তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বসিতে দেখি নাই) এবং তাঁহার নিত্যকার শিবপূজায় অনেক বাধাবিঘ্ন আসিয়া পড়িয়াছিল। পিসিমার সমস্ত শোক দুঃখ অশ্রু আকারে উথলিয়া উঠিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি আত্মরক্ষার্থ বাহিরের দিকে ছুটিলাম।

দ্বারের কাছে আসিতেই দেখি বৌদিদি। তিনি আমাকে দেখিয়াই উপহাসের তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি স্বদেশ প্রেমিক! এত বড় মহৎ উদ্দেশ্য তোমার! এই উদ্দেশ্যের কথা লিখে গবর্ণমেন্টের কাছে একখানা দরখাস্ত দাও ডেপুটিগিরি নিশ্চয় পাবে। আমি সনিঃশ্বাসে বলিলাম, "এ সব আন্দোলনে দেশের যে কত অনিষ্ট হচ্ছে তা ত তোমরা বুঝবে না কি করব বল?" সে দিন আমার তর্ক প্রবৃত্তি ছিল না বৌদিদির হাত ছাড়াইয়া নিজের ঘরে গিয়া পড়িলাম। বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া শত্রু পক্ষকে আক্রমণের কৌশল আবিষ্কার করিতে লাগিলাম।

তর্কে আমাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না। যখনি দশজনে একটা মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত অমনি আমি বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্করূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সকলকে ধূলিশায়ী করিতাম। আমরা বন্ধুরা বলিত যে আমি যদি সব কাজকর্ম ছাড়িয়া বক্তা হইতে চেষ্টা করি তবে বাংলা দেশ হইতে সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি বক্তার নাম উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আমার বৌদিদি মোক্ষদা সুন্দরীর কাছে আমার কোন তর্ক খাটিত না, তিনি অতি বেশী শিক্ষিতা, তাঁহার মুখের একটু সুমিষ্ট হাসির স্রোতে আমার সমস্ত কথা ভাসিয়া যায়। আমি কোন এক সুযোগে আমার সমস্ত বুদ্ধি ও যুক্তি তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিব এই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

২

আমাকে নিজের পথে আনিবার জন্য পিসিমা অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন যথা, অশ্রুজল, অনুরোধ, উপরোধ, অভিমান, মৌনাবলম্বন; কিন্তু এতগুলি উপায় যখন ব্যর্থ হইয়া গেল তখন পিসিমার

একাদশীর সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতি বাড়িয়া চলিল। মাসের মধ্যে ৭/৮টি একাদশী করিতে লাগিলেন। সব কাটান যায় কিন্তু বৌদিদির পীড়াপীড়িতে আমি কিছু জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম।

শনিবার দুপুরবেলা আমার নিরাপদ দুর্গের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িতেছিলাম এমন সময় বাহিরে দাদা ডাকিলেন, "রমেশ, এদিকে এস।" রাখী উৎসবে সমস্ত কলিকাতা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম হায়, হায় দেশটা যে রক্তচক্ষু মাতালের মত হইয়া উঠিল। সেদিন আমার সাধের বিলাতী চা একটুও খাইতে পাই নাই, আমার বিলাতী কলার নেকটাই পিয়ার্স সোপ ইত্যাদি বৌদির হাতে যথেষ্ট নিগৃহীত হইল। স্নানান্তে একটি "রাখী" আমার হাতে বাঁধিয়া দিয়া বৌদিদি বলিলেন, "এই রাখীর সঙ্গে তোমার স্বদেশভক্তি প্রবল হোক, আমি এই আশীর্বাদ কচ্ছি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার আশীর্ব্বাদ অক্ষয় হোক; কিন্তু বৌদি, রাজনীতিক্ষেত্রে তোমরা মেয়েরা নাব্‌লে এখন দেশটা যে সত্যি সত্যি উদ্ধার হবে।" বৌদি অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "তোমরা লেখাপড়া শিখে বেশী উদার হয়েছ কিনা তাইত তোমাদের ভক্তি সাগর পার হয়ে বিলাতের পায়ে গিয়ে ঠেকেছে। তোমরা দেশকে ভাল রাখবে কি করে? আমাদের ছোট ভালবাসার কাছে দেশই সব চেয়ে বড়।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম আগামী রাখী উৎসবে সভাসমিতি করিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিব। এবং বৌদিদি ও শৈলকেও বিশেষ করিয়া এসব আন্দোলনের অপকারিতা বুঝাইয়া দিব। কার্ত্তিকের শেষাশেষি শৈল ফিরিয়া আসিল; পিসিমার সেবা ও দাদার ছেলেদের ভার সে গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদিদির সঙ্গে তাহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মের সঙ্গিনী। আমি দাদার সঙ্গে চলিলাম। বসিবার ঘরে গিয়া দাদা বলিলেন, "তোমার পরীক্ষা ত হয়ে গেল, এখন বিয়ে করনা! শেষে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখো। পিসিমার মনে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছ। তুমি বল্লেই আমি চেষ্টা দেখব।"

আমি একটু ভাবিয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম, বৌদিদির উপর মনে মনে খুব রাগ করিলাম। এ সবি তাঁহার কাণ্ড, তা না হইলে আমার বিবাহের জন্য দাদা হঠাৎ এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন না। যাহা হোক আমার পাত্রী জুটিতে বেশীদিন বিলম্ব হইল না। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা একজন উকীলের ভগ্নী শৈলবালার সঙ্গে আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। আশ্বিন মাসেই বিবাহ। ভাই স্বদেশী আন্দোলনের নেতা কনেটাও ঘোর স্বদেশী; এই বালিকাকেই সর্ব্বপ্রথমে আমার নবীনমন্ত্রে দীক্ষিত করিব ভাবিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।

৩

আশ্বিনের মাঝামাঝি আমার বিবাহ হইয়া গেল। কয়দিন খুব গোলমালে কাটিল। এক সপ্তাহ পরে শৈল তাহার দাদার নিকট চলিয়া গেল। পিসিমা বৌ দেখিয়া খুব খুসী হইলেন, তাঁহার সমস্ত রোগ যন্ত্রণা অল্প কয়দিনের মধ্যেই সরিয়া গেল, শিবপূজা আবার নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল।

বিবাহের গোলমাল কাটিতেই আর একটা গোলযোগে পড়িয়া গেলাম; ৩০শে আশ্বিন আসিল। আমি অহোরাত্র উপদেশ দিয়া তাহাকে নিজের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শৈল নম্র নিরুত্তরে আমার সকল কথা শুনিয়া যাইত। কখনো কোন প্রতিবাদ করিত না। আমি ভাবিলাম ইহাকে সহজেই নোয়াইতে পারিব।

৪

বৌদিদির অত্যাচারের হাত হইতে আমার কোন মতে নিস্তার ছিল না। কোনদিন দেখিতাম স্নানের ঘরে গরম জলের টবে একটব চা প্রস্তুত হইয়াছে চায়ের টিন খালি; আমার সাধের বিলাতী এসেন্সটুকু বিলাতী বুটের মধ্যে ঢালা। প্রায় মাঝে মাঝেই আমার মোজা, গার্টার, কলার ইত্যাদি অদৃশ্য হইয়া যাইত। এসব অপকর্ম্মে শৈল যে তাঁহার সহকারিণী এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। ক্রমে আবার ৩০শে আশ্বিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল; কিন্তু আমার প্রবন্ধ লিখিবার ও সভাসমিতি করিবার উৎসাহ কমিয়া আসিয়াছিল। তবু একটা ক্ষীণ আশা লইয়া বসিয়াছিলাম যে ঘরের মধ্যেই এ সভার অধিবেশন হইবে এবং এই দুটি দুরন্ত স্বদেশ-প্রেমিকাকে আমার সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইব।

বৌদিদি ও শৈল দুজনে কয়দিন ধরিয়া গোপনে কিসের পরামর্শ আঁটিতেছিল; আর আমি বেচারা একা বসিয়া ভাবিতেছিলাম যে, রাখীবন্ধনের দিন এমন কিছু কাণ্ড করিব যাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া যাইবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ২৯শে আশ্বিন সকাল বেলা একটা দোকানে ঢুকিয়া চটপট কতকগুলি বিলাতী জিনিস কিনিয়া বাসায় ফিরিলাম। একটি জাপানী বক্সের মধ্যে এক বাক্স সাবান, এক শিশি ম্যাকেসার অয়েল ও এক শিশি এসেন্স সাজাইয়া ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা দশটা হইবে শৈল ছোট খোকাকে কোলে করিয়া মেজের উপর বসিয়াছিল। আমি তাহার কাছে বাক্সটি রাখিয়া বলিলাম "শৈল এগুলি তোমার জন্য আনিয়াছি"।

জিনিসগুলির দিকে চাহিয়াই শৈলর স্নিগ্ধ চোখ দুটি বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত সজল গম্ভীর হইয়া উঠিল। আমার যে কি হইল জানি না যতগুলি কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম কিছুই বলিতে পারিলাম না। অকারণে বক্ষের স্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিল। হঠাৎ চোরের মত আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। অবশেষে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

৫

রাত্রিতে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে কষ্টেসৃষ্টে বিছানার কাছে আসিয়াছিলাম। অন্ধকারের মধ্যেও জানিতে পারিতেছিলাম যে, বিছানার উপরে একজন শুইয়া আছে এবং সে যে কাঁদিতেছে তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার উপহারের বেদনাতেই ঘরের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে পড়িয়াছিল। অপরাধীর মত বিছানায় গিয়া শুইলাম; কোন সান্ত্বনার কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম বৈঠকখানার ঘড়িতে তং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিতে পারি নাই।

সকালবেলা যখন জাগিলাম তখন ভোর হইয়াছে খোলা জানালা দিয়া একটু সোনালি রৌদ্র টেবিলের নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। শরতের নির্ম্মল আকাশে শুভ্র মেঘগুলি চঞ্চল শিশুর মত শূন্যপথে ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃদু বাতাসে দেয়ালের শুষ্ক বকুলের মালাটা এক একবার দোলাইয়া যাইতেছে। সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি আসিয়া কানে পৌঁছিতেছিল; জানালা দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম দলে দলে বাঙ্গালী নগ্নপদে মাতৃশোকের বেশ পরিধান করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে।

আমি চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলাম। টেবিলে একখানি রূপার থালায় একটি সদ্যবিকসিত শিশিরসিক্ত শেফালিকার মালা স্থাপিত ছিল। মালাটি উঠাইয়া লইলাম; কুন্তলীন ও দেলখোসের দুটি সুন্দর শিশি মালা দিয়া ঢাকা ছিল। আমি শিশি ছিপি খুলিয়া একটু তৈল ঢালিয়া লইলাম, বঙ্গমাতার অঞ্চলস্থিত সমস্ত বিকসিত ফুলের গন্ধে সকালের বাতাস যেন সুগন্ধময় হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে শৈল গৃহে প্রবেশ করিল; তাহার স্নানসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একটি শান্ত লাবণ্যে তাহার সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল। কেবল চোখের কোনে একটু ম্লান বিষাদের ছায়া। সহসা বঙ্গলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি আমার চোখের সম্মুখে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম শিশি খুলিয়া একটু দেলখোস তাহার মাথায় ঢালিয়া দিলাম, বলিলাম, শৈল। আজ হইতে আর বিলাতী জিনিস স্পর্শ করব না।

তারপর কুন্তলীন মাখিয়া স্নান করিতে ছুটিলাম; স্নান করিয়া বাহির হইতেই, বৌদিদি আমার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "বৌদি। তোমার আশীর্ব্বাদ সার্থক।"

সেদিন আমিও নগ্নপদে, শুভ্র বসন শুভ্র উত্তরীয় ধারণ করিয়া মাতৃশোক গ্রহণ করিলাম। গৃহের প্রাঙ্গণে আমার সমস্ত বিলাতী দ্রব্যের চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। এই পবিত্র হোমানল শিখা আমার জীবন হইতে সমস্ত কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া লইল।

[কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩১২]

ব্রতধারণ

সুরবালা দাসী (রাজশাহি)

আমি বেঙ্গল নাগপুর রেলের স্লীপারের কন্ট্রাক্টরী করি এবং গলির ৪ নম্বর বাড়ীতে বাস করি। আমার বাড়ীর ভাড়া ৫ নম্বরে দিতে হইত। বাড়ী দুইটির গঠন দেখিলে মনে হয় পূর্ব্বে একটা বড় বাড়ী ছিল, পরে একটা দেয়াল গাঁথিয়া দিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছে। দোতালার একটি কক্ষের দেয়ালের মধ্যে একটি দরজা ছিল, তাহা পাঁচ নম্বরের দিক হইতে সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। বাড়ীর এক পার্শ্বে এক তালার গায়ে একটা বারান্দা ছিল, তাহার মধ্যেও একটু দেয়াল গাঁথিয়া এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাইবার পথ বন্ধ করা হইয়াছিল।

কখনও কখনও কাজের অনুরোধে আমাকে খড়্গপুর বা তাহা অপেক্ষাও দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাইতে হইত, সে সময় বর্দ্ধমান জেলার পাচক ব্রাহ্মণ ও মেদিনীপুরের খানসামা বাসা রক্ষা করিত। যখন কলিকাতায় থাকি সমস্ত দিনটাই কাজের ঝঞ্ঝাটে কাটে, সন্ধ্যার এ দিকে বাসায় বড় আসিতে পাই না।

প্রায় চারি মাস হইতে চলিল আমি এই বাড়ীতে আসিয়াছি এবং প্রায় প্রতি রাত্রিতেই পাশের পাঁচ নম্বর বাড়ী হইতে হর্ম্মোনিয়ম সহযোগে কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রীকণ্ঠে বা কোরাস গান শুনিতে পাই। নানা বিচিত্র ঘটনা বিধ্বস্ত কলিকাতায় এই ঘটনায় কোন অসাধারণত্ব ছিল না, সুতরাং আমার মনে কোন দিন কোন প্রশ্নের উদয় হয় নাই।

একদিন একটু রাত্রে বাসায় ফিরিলাম, রেলের কষ্টে ও গরমে এমন মাথা ধরিয়াছিল যে আহারে স্পৃহা ছিল না, রাত্রে আর স্নান করিলাম না, মাথায় একটু "কুন্তলীন" দিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেলিলাম এবং বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। ক্রমে একটা বাজিয়া গেল; পল্লী তখন নিস্তব্ধ, কেবল অধিক রাত্রে নগরের বিচিত্র শব্দ ধরণীর অস্ফুট বিলাপের মত শুনা যাইতেছে, এমন সময় পাঁচ নম্বরের বাড়ী হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে গাহিল —

"আমরা পথে পথে যাব সার ধরে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
কব জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ
(তোদের) মা ডেকেছে কব বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর
(তোদের) হৃদয়-যন্ত্রের তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে —
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে।
(তোমার) সন্তানেরি দান ভারে ভারে।"

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে এই গান আমার কানে বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। আমার মনে হইল এমন প্রাণ মাতান গান আমি জীবনে আর কখনও শুনি নাই। কি জানি কেন, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমার অজ্ঞাতে দুই বিন্দু অশ্রু আমার দুই চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল। কাঠের ঠিকাদারী করি, কুলি মজুর খাটাই, স্বদেশপ্রীতিই বল আর যাই বল, সে সবের বড় বসর থাকে না; জীবনে গানও অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ভাবিলাম এ গানের কি কোন অর্থ আছে, না মূল্য আছে? এ পোড়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এমন কেহ একজনও কি আছে যে জননীকে প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত?

এই সব সাত পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে দেয়ালের ঠিক ওপারেই খুব ফিস্ ফিস্ কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। কোনদিন এমন হয় না, কিন্তু আজ কি জানি কেন পাশের বাড়ীতে কি ঘটিতেছে জানিতে ভারি উৎসুক হইয়া উঠিলাম। অনেকবার যাব না যাব না ভাবিয়া শেষে আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

বিছানা হইতে উঠিয়া একতালার বারান্দায় রেলিং ধরিয়া গিয়া আমার ঘরের ঠিক ওপারের কক্ষের একটি জানলার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। সেই জানালার এক ছিদ্র দিয়া যে দৃশ্য সেই রাত্রে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। দেখিলাম মাদুরমণ্ডিত কক্ষতলে তের জন লোকে বসিয়া আছে, দুই সারিতে মুখোমুখী হইয়া ছয় জন করিয়া বার জন, এবং পৃথক আসনে একজন এই বারজনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যেন ইহাদের কর্ত্তা বা সভাপতি বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের সকলের আপাদমস্তক গেরুয়া রং-এর আলখেল্লায় আবৃত, কেবল দুই চক্ষের কাছে দুইটি ছিদ্র। সভাপতি সম্মুখে একটি চাঁদীর বাটী, আরা সেই বাটীর উপরে তীক্ষ্ণধার ছোট একখানি ছোরা সংস্থাপিত ছিল, ছাদ হইতে একটি ক্ষুদ্র ঝাড় ঝুলিতেছিল, তাহাতে যে তিন চারিটি বাতি জ্বলিতেছিল তাহার ক্ষীণ আলোক সে কক্ষের সমস্ত অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছিল না। কক্ষের এক কোণে একটি টেবল হারমোনিয়াম, তাহার সম্মুখে একখানি চেয়ারে ঐরূপ গেরুয়া আলখেল্লা পরিহিত এক ব্যক্তি বসিয়াছিল, বোধ হয় তিনি স্ত্রীলোক এবং তাঁহারই গীত "পথের গান" আমাকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল।

আমি যে জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম সেই জানালাটি সভাপতির ঠিক পশ্চাতের দেয়ালে সংলগ্ন, সেই জন্য সেই কক্ষাভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনা আমি বেশ দেখিতে পাইতেছিলাম। ক্ষণকাল পরে এই অদ্ভুত সভার সভাপতি মহাশয় তিনবার হাততালি দিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখস্থ দ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং আরও তিন ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাদিগের মধ্যে দুইজনের ঐরূপ গেরুয়ার আলখেল্লায় আপাদমস্তক মণ্ডিত, তৃতীয় ব্যক্তি গেরুয়া পরিহিত ছিল না, তাহার সুন্দর মুখখানিও অনাবৃত ছিল। ঐ দুই ব্যক্তি তাহাকে আনিয়া সভাপতির ঠিক সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দুইজন তাহার দুই পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এই তৃতীয় ব্যক্তির পরিধানে ধুতি এবং গায়ে টুইলের জামা, গলায় বোতাম খোলা এবং গলায় একটি দড়ির ফাঁস। ইহারা আসিয়া দাঁড়াইবার ক্ষণকাল পরে সভাপতি মহাশয় দৃঢ় গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—

"তোমার নাম নরেন্দ্রনাথ রায়?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"নরেন্দ্র তুমি কি এই দাস-ব্রত গ্রহণ করিতে চাও?"

"চাই।"

"এই দাস-ব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?"

"আছি।"

"তবে শোন; আমি প্রথমে তোমায় সে শপথটি একবার শুনাই; এই বলিয়া তিনি একখণ্ড কাগজ হাতে ধরিয়া পড়িতে লাগিলেন —

"আমি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় আজি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এই 'দাস-ব্রত' গ্রহণ করিলাম। আমি স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল এই ত্রিলোক সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি জীবনে কখনও এই দাস সম্প্রদায়ের নিকট অবিশ্বাসী হইব না। আজ হইতে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করিলাম, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব জননীর সেবায় অর্পণ করিব। যতদিন দেশের দশা না ফিরে আমার গলার এ ফাঁস গলায় ধারণ করিব। যিনি যখন সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব। যদি কখনও এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি যেন নরকেও আমার স্থান না হয়। ঈশ্বর — আমার সহায় হও।"

"যাহা আমি পড়িলাম তাহা শুনিলে? এখন এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছ?"

"প্রস্তুত আছি।"

তখন সভাপতি ইঙ্গিত করিলেন, নরেন্দ্রের দুই পার্শ্বস্থ দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া সেই চাঁদির বাটি ও ছোরা লইয়া নরেন্দ্রের পাশে গেল। একজন সেই ছোরা দ্বারা নরেন্দ্রের বুকে একটু আঘাত করিল, অপর

ব্যক্তি সেই বাটীতে আহত স্থান হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া লইল। তাহার পর একটি নূতন ঘাসের কলমে সেই রক্ত লইয়া নরেন্দ্রের হাতে দিল; নরেন্দ্র সেই কলম লইয়া আপনার বক্ষের রক্তে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। তখন একজন একটু কাপড় জলে ভিজাইয়া কিছুকাল ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতেই রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

অতঃপর সভাপতি সদ্যদীক্ষিত নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এখন তোমাকে এই দাস-সম্প্রদায়ের লোক চিনিয়া লইবার উপায় বলিয়া দিই। প্রতি মাসে এই চিহ্ন পরিবর্ত্তিত হয়। এ মাসে বাম হস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ হস্তের তালুতে কেহ এইভাবে রাখিলেই বুঝিবে সে একজন দাস। এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবারও এক সাঙ্কেতিক শব্দ আছে, সে শব্দও প্রতি মাসে পরিবর্ত্তন হয়।

এ মাসের সাঙ্কেতিক শব্দ 'একতা'। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি যে উদ্দেশ্যে আজ তুমি স্বদেশের দাসত্বের স্বীকৃত হইলে, আমাদের সে আশা সফল হউক। এখন আইস এই স্থানে সমবেত 'দাস' গণের সহিত পরিচিত হও।" এই কথা বলিয়া মাত্র সকলে নিজ নিজ গেরুয়া বসন উন্মোচিত করিল। তখন আমি সবিস্ময়ে। দেখিলাম সেই সমবেত লোকের অধিকাংশই হিন্দু বাঙ্গালী, অবশিষ্ট বাঙ্গালী মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবী, আর হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে এক লোকমোহিনী বাঙ্গালী রমণী। তাহার পরিপূর্ণ দেহখানি একটা মহামূল্য হীরকের মত সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের আশা ও সুমহান ভাব ইহাদের সকলের মুখে যেন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। একে একে ইহারা সকলেই নরেন্দ্রের সহিত কোলাকুলি করিতে লাগিল। এই দৃশ্যে কেন জানি না আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, আমি আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

এই সময়ে সেই ঘরে যেন অস্ফুট চিৎকারধ্বনি হইল, কিন্তু আমি আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি যে ভাবিতেছিলাম এই পতিত দেশের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে মায়ের জন্য প্রাণ পণ করিতে প্রস্তুত? আজ একি দেখিলাম ইহারা কে? কি ইহাদের উদ্দেশ্য ও আশা তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তথাপি সেই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল "দাস সম্প্রদায়টি" আমার চক্ষে বড় মহৎ, বড় আশার বলিয়া বোধ হইল। আমার মনে হইল যেন কয়েকটি দেবকুমার ও একটি দেববালার দর্শন লাভ করিলাম। ভাবিলাম, হায় ভারতমাতা! তোমার কোলে এমন হৃদয়বান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুসন্তান একটিও যদি থাকে তবে তোমার মুখচন্দ্রমা মলিন কেন তাহা তো বুঝি না মা!

বোধ হয় চারি পাঁচ মিনিট এইভাবে বিছানায় পড়িয়া আছি; এমন সময় হঠাৎ পাঁচ নম্বরের দিক হইতে আমার ঘরের সেই দ্বার খুলিয়া গেল, চাহিয়া দেখি বাতি হস্তে সেই সুন্দরী গায়িকা, তাহার অনুপম মুখখানি দারুণ আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভীত স্বরে সে কহিল, "মহাশয়। আপনি বাঙ্গালী, বাঙ্গালীকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ীর দুয়ারে পুলিশ! আপনার দুয়ার দিয়া কয়েকটি নিরীহ লোককে বাহিরে যাইতে দিয়া চির বাধিত করুন! কাল আপনাকে সব বলিব।"

আমি বলিলাম, "আমাকে কিছু বলিতে হইবে না, কে কে বাহিরে যাইবেন নিঃশব্দে আমার পশ্চাতে আসুন।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে গেলাম, দেখিলাম, রাস্তায় লোক ধরিতেছে না!

সেই জনস্রোতে সকলকে মিশাইয়া দিয়া আমি পাঁচ নম্বরের দুয়ারে গোলম। দেখিলাম সেখানে দশ পনর জন পাহারাওয়ালা ও গুটী তিন চারি সার্জ্জন। একটু ভিড় ঠেলিয়া নিকটস্থ হইয়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হইয়াছে খাঁ সাহেব?"

সে ব্যক্তি কহিল "আরে বাবু হিয়া তুম্‌হি লোক মিনিট করতে হো শুন্‌কে আয়েথে, কোন্ বাউরা বাবু যাকে খবর দিয়া, আব হি তো দেখতে হেঁ কুছভি নেহি।"

আমি কহিলাম "ভাইরে! সে বাবু বাউরা নয়, রাক্ষস।" বুঝিলাম, কেন "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।"

[কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩১২]

খালাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রীপুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধূম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেন্ট আফিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সে জন্য ইঁহার শালীশালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবু ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "ফরিদপুরে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল, "স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদপুরে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কই দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম — "

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদপুরে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতী কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল, "জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে — 'এ জি. এ জি. সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়' — আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদপুরে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল, "এমন চাকরি করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন, আপনার ত ল-লেকচার কমপ্লীট রয়েছে। ওকালতীটে পাস করে দিব্যি বড় দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়েসে এগজামিন পাস করা পোষায় ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল, "ফিরিঙ্গির চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত, আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না, পঞ্চাশ টাকায় দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারিসনে ইন্দু? সেখানে কিনলে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল, "ঐ 'মাতৃপূজক সমিতি' কন্‌গ্রেসের জন্য ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা মন্দিরা বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দেমাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকাপয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস জন্মভূমির
ভকত সন্তান,
মা'র পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই এমন সুদিন কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই দিক্ সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান,
যার কিছু নাই, সে দিক্ কেবল
ব্যথিত হৃদয়খান।

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল, "মশায়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "নাম দরকার কি?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন 'জনৈক বন্ধু'।"
সত্যেন্দ্র বলিল, "ওহে, লেখ 'জনৈক ডেপুটি'। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি।"
গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন, "না, না। 'জনৈক বন্ধু' বলেই লিখে নাও।"
যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদপুর বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।
দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি?"
লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।
ছেলেরা বলিল, "ছি ছি, এ যে বিলাতী।"
"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়!"
"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"
"মুসলমান।"
একজন ছেলে বলিল, "বিলাতী চীজ হারাম হ্যায়।"
লোকটি বলিল, "তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"
"কত দাম নিলে?"
"দেড় রূপিয়া।"
"অ্যাঁ — দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"
লোকটা সাহেবের চাপরাসি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহা অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আর আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল, "সচ্ বাত বাবু?"
ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সত্য বইকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"
চারি পাঁচ জন বালক সেই চাপরাসিকে লইয়া সদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল, "একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমে ফিরিয়া লইব না।"
তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে একটিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাসিকে বলিল, "দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"
চাপরাসিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।
চাপরাসি বলিল, "বাবু, ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আঠ আনা পয়সা?"
ছাত্রেরা দোকানে বলিল, "আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।" — আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাসিকে দিল।
চাপরাসি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"
"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হ্যায়।"
"তোবা তোবা" — বলিয়া চাপরাসি ডাকবাঙ্গলো অভিমুখে রওনা হইল।
ছেলেরা বলিল, "ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলো রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই

অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাসি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারটাই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুলোক পাগল হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল, "বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকে দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোল্‌তা হায়।"

নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য' করিয়া, চাপরাসি প্রফুল্ল মনে ডাকবাঙ্গলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাসিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?" — বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাসির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাপরাসি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাসির পতনে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন, "ড্যাম শুয়ারকা বাচ্চা — ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া?"

চাপরাসি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল, "হুজুর — হাম বিলাতী বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন —"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকা লেড়কালোক" — চাপরাসি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন — "ইস্কুলকে লেড়কালোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

এতক্ষণে চাপরাসিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল, "হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া?"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পঁচিশ আদমি — হাম একেলা কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন, "ইউ ড্যাম্ কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহেঁ নেই বোলায়া?"

চাপরাসি বলিল, "হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কানেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পয়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা কঁরে, হুজুরকা চা ঠান্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রূপিয়ামে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীবপরবর।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, হাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কা লোগকে হাম্ জেহেলমে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেমসাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েন্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাঁহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি-পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্ম্মূথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "Very sorry to intrude" — তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন, "I say – this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।" — বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন, "কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন, "Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন "দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-কর সাহেব বলিলেন, "While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বে-আদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু" গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী হঁহা হায়, ইতলা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর" — বলিয়া দারোগা চাপরাসিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল চাপরাসি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা জিজ্ঞাসা করিল — "কোথাও জখম আছে?"

সাহেবের প্রহারে তাহার কপাল যে জখম হইয়াছিল, চাপরাসি তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন — "ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে!" — দারোগা লিখিয়া লইল — "বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইব।"

এত্তেলা গ্রহণ শেষ হইলে পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন, "আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।" — হুকুম দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আপনার এই চাপরাসিকে আসামী সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাসি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখ্‌লাও।"

চাপরাসি বলিল, "হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "শুয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর" — বলিয়া চাপরাসি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একেবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাসি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছু জানিত না। বালকত্রয় বলিল, "দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?"

দারোগা বলিল, "কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" — বলিয়া দারোগা তিনজন কনষ্টেবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাসিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল, "থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না, ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোনও ডেপুটি বাবু আসিবে; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস!"

চাপরাসি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন — "ড্যাম্ নেটিভ পুলিস এই রকম dishonest-ই বটে!"

দারোগা তখন বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সেই সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা, এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন, "আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, — "না — এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়াছে।"

চারুশীলা বলিলেন, "তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে, কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটিবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "যদি প্রমাণ হয়, তাহলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে' তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন, "ছি, অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেকে বললেন যে ছেলেরা চাপরাসিকে রাজি করে', তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয়নি, মারেওনি। তাছাড়া, যে তিনজন ছেলেকে পুলিস ধরেছে তারা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটিবাবু একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ সব প্রমাণ হয় তবে না!"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ না হয়, কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটিবাবুর মনের বিষণ্নতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালী আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটিবাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

আরও কয়েক ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাসি আসিয়া তাঁহাকে অফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল, "সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন। বলিলেন, "এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কই তেমন ত কিছুই দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot' ; নগেন্দ্রবাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"আজ্ঞে —"

"যথার্থ স্বদেশী — অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা — সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এসব কি?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন, "ওগুলো ভল নয়।"

"By the way — সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উঃ — ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাসিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলো রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃ ত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু, ফরিদপুর কিরূপ স্থান মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুগ্ধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গি পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে দশ টাকায় বাবুর্চ্চি বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হ্যাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র। Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিনশত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "Well Nagendra Babu, I won't detain you longer" — বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন, "স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out – at any cost."

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ হুজুর। আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীলবাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাসি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্তৃক 'এগ্‌জিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাসির সহিত বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিত পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট্ করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন, "কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে"। জেরায় বলিলেন, "চড় কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল। আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাসি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রের সঙ্গে যে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে, স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলোর খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাসিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীলবাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃতগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটিবাবু তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত ইয়াছে। প্রত্যেকের তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালতগৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামীপক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies' — উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে,ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোন কঠিন শাণিতদ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না। ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে, তাহাতে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের সমস্ত কথাই যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাঙ্গলোর খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে, খানসামা উকীলবাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারো মাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপীল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল —

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

সেদিন ডেপুটিবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটিবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটিবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি?

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?" "মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনই সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "থাক দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্রবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষম ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন, "মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন সারে নাই।

নগেনবাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন, "এস এস, উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন, "আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনার সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন, "ওকি, চোখের জল ফেল কেন? —বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ওগো আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বোলো না।" — বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কৰ্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই প্রথম? —কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধৰ্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠা, — শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি! পূর্ব্বকালে অৰ্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মাৰ্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেন্টের নিকট হইত পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মাৰ্জ্জনা আছে?

ডেপুটিবাবু এইসকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সে পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পর দিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আজ মফঃস্বল যাইব।" — সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন, "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওকি — ওকি? শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন, "আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?" "কি বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোনারূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও আমি তাতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটিবাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণের সময় সন্নিকট। ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" — বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে চাপরাসি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটিবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়ে দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে — তাহার চারি পার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা" — ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গনিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা" গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটিবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারি গেলেন। চারুশীলা পুত্রকে কহিলেন, "আজ ইস্কুলে গেলিনে?" "না, আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে নাকি?" "না"। "তবে?"

"ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়" — বলিয়া আর বলিতে পারিল না। তার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথেঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন, 'আচ্ছা তবে থাক্। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্তবাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোন কথা বলিলেন না, মুখ বার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত সাদর নহে। চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন। একটি মহিলা বলিলেন, "ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপীলে বোধ হয় টিক্‌বে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন, "তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপীলের দিন কবে হয়েছে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পবে? এঁরাই করবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিলেন — "টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন, "আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্য কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই একযোড়া বালা আর একযোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপীলের কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" — ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ছেলেদের আপীল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাস-কামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষ্যে, নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও কার্য্যে ভুল ধরিয়া আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে সাহেব অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপীল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আফিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাসি ফিরিয়া তাঁহাকে আফিস কামরায় না লইয়া গিয়া, সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন 'চুনাপুঁটি' পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাসি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "বাবু জুতাকা আওয়াজ মৎ কীজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। 'চুনাপুঁটি'গণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজারি সারিয়া আফিস কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন — নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে, — অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না। "গুড্‌মর্ণিং সার্।" "গুড্‌মর্ণিং বাবু।"

"বাবু!" — অন্যদিন হইলে সাহেব বলিতেন — নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু বাবু বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আগাতে নূতন কোন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন, "সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভালই।"

" শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিলেন। ভালই — অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেন্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণা দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন, "তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনি কি একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলন হওয়া অবধি, এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশিকতা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না! তিনি বুঝিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" — বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন — By the way— শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপীলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন। ইহ সত্য নাকি?" "সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এটা কি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেন্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই! সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে, চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনই নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাজকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন — ঔষধ ধরিল কিনা। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই অফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুডমর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন — "গুডমর্ণিং"।

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বিকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফেটন্‌গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল, ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল — "একি বাহে? বাবুর সাদি নাকি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল — "আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।"

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দুইমাস-ব্যাপী বিচ্ছেদের পর আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪)

উকীলের বুদ্ধি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ •

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল — লোকটা ভারি চালাক চতুর, — উহার পসার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে। বাস্তবিক বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধবাবুর পসার হয় না, এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক; — বিদ্যার ছাপ ত তাঁহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পাশ করিয়া তিনি দিনাজাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাজকর্ম্মও যথেষ্ট — এবং 'বার'ও তেমন 'স্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীলবাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীলবাবু বলিলেন — "ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।"

উকীলবাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপহার এনেছ হে?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল — একটি চকচকে নূতন আলপাকার চাপকান এবং একটি ঝকঝকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন, "এইগুলি অনুগ্রহ করে আপনাকে নিতে হবে।"

উকীলবাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি?"

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মানে আছে।"

"কি বল দিকিন?"

"এ দুটি আপনি নিয়ে — আপনার পুরানো চাপকান আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।"

এতক্ষণে উকীলবাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ — বুদ্ধি করেছ ভাল।"

সুবোধ বলিলেন, "আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন জায়গায় ওকালতী করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল, — তার উপর যদি নতুন শামলা আর চাপকান দেখে, তা হলে মক্কেল কি আর কাছে ঘেঁসবে?"

উকীলবাবু বলিলেন, "দেখ হে আমি বলে দিচ্চি — তুমি শীগ্‌গিরই পসার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।"

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়া সম্মুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন, বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর হইতে কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনকাল কি ভয়ানকই পড়িল! যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরিতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না।

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি — রাস্তার উপর একটি ফটক আছে — তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড — তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে কুড়ি টাকা করিয়া, কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। যে মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে — তাহারও শ'খানেক টাকা প্রাপ্য। বাড়ীওয়ালা ও মুদী সুবোধবাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন উপার্জ্জন না হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর উপার্জ্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন — জগৎপ্রসন্নবাবু। জগৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব। জগৎবাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধবাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন তার তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন — "দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভার চিনি। লোকে মনে করে হলদে চিনি হলে দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী, কিন্তু তা মহা ভুল। জাভা, মরিশস্ প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্ছে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।"

সুবোধবাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন, আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে — নালিস করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর 'ইত্যাদি'ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্বপ্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া অবিলম্বে সুবোধবাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনা একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, 'ইত্যাদির' দাম অনেক — তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং ইত্যাদি করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধবাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল — "কম্লি" তাহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন, তাহা আট আনা সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণপ্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত মনে সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈতৃক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কর্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান, কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহনভোগওয়ালা, 'ঘী—গাওয়া-ঘী'ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের এক ছিলিম তামাক সুবোধবাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে? মক্কেল নহে ত? নিকটস্থ আলমারীর মস্তক

হইতে সুবোধবাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ্ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পরমুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্নবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ্ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধবাবু বন্ধুকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।—"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে করে?"

"আর ভাই বসে বসে কি করি—আসা গেল একটু গল্পগুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছট্‌ফট্ করে মরছিলাম। আজকের 'বেঙ্গলী' নাকি? দেখি।"

কাগজ লইয়া সুবোধবাবু চাকরি খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎবাবু বলিলেন, "শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলার সাহেব এসে পৌঁছবেন।"

সুবোধ বলিলেন, "৭টার সময়? শুনে খুসী হলাম। আমার বাড়ী আসবেন না ত?"

জগৎ হাসিয়া বলিলেন, "বলা যায় কি? আসেনই যদি—এত ভয় কেন?"

"না ভাই—আমার স্বদেশী ঘরকন্না, তাতে ঝি-টিও পালিয়েছে। তাঁকে খাতির করব কি করে?

"খাতির যদি করতে পার, তা হলে সুবিধে করে নিতে পার—তা জান সুবোধ? বেচারি যেখানে যাচ্ছে—কেউ খাতির করছে না! কোনও মিউনিসিপ্যালিটি অভ্যর্থনা করছে না—অনেক জায়গার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দনপত্র দেবার প্রস্তাব করে বে-সরকারী সভ্যদের কাছে হার মেনে যাচ্ছে।"

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "খাতির করলে একটা চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় ত বল, আমি নিজে একটা অভিনন্দনপত্র দিয়ে ফেলি।"

"শোননি—পূর্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলার সাহেবের নামে একটা কবিতা রচনা করে গভর্ণমেন্ট প্লীডারের পদ পেয়ে গেছে।"

সুবোধচন্দ্রের জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ। একটা গভর্ণমেন্ট প্লীডারী পেলে যে গো-জন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?"

জগৎবাবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "ইংরাজি কবিতা লিখতে পারবে?"

"না। কখনও দুটো লাইন মেলাইনি।"

"চেষ্টা করে দেখ না। একটা কবিতা লিখে সোনার জলে ছাপিয়ে ফেল। ফুলার সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ কর, —আর ফুলার সাহেবকেও এক কপি পাঠিয়ে দাও। এই ফরিদসিংহের সরকারী উকীল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি—তাঁকে নিয়ে গোলযোগ চলছে। চাই কি তাঁর পদটা পেয়ে যেতে পার।"

সুবোধ উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্বমত পরিহাসের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"নাও, কাগজ কলম বের কর। আমি না হয় তোমায় সাহায্য করছি। ছেলেবেলায় আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায়? Hail Fuller–Lord of East Bengal—তারপর, কি মিল করা যায় বল দেখি?"

সুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন। জগৎ বলিলেন, "তার চেয়ে বরং Hail Bamfylde Fuller – Lord of half Bengal—শুনতে বেশ গম্ভীর। মিল করা যায় কি? Bengal-এর সঙ্গে 'all', 'call', 'fall' অনেক মিলই ত আছে। হাঁ হাঁ—হয়েছে Hail Bamfylde Fuller–Lord of Half Bengal,

How glad are Dinajshahi people all
To–to–

তার পর কি হে? বল না। সব কবিতাটাই আমি রচনা করব—আর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেন্ট প্লীডার হবে?"

সুবোধ বলিলেন, "না হে—কবিতার কাজ নয়। আমি আর একটা কথা ভাবছি।"

"মনে হয়েছে।

To welcome thee to their most ancient town,
The worthy representative of the Crown.

না। 'Worthy' কেটে 'glorious' —সবটা শোন দিকিন—লিখে নাও—

Hail Bamfylde Fuller–Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To welcome thee to their most ancient town,
The glorious representative of the Crown–

লিখে ফেল—লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ন হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।"

সুবোধ বলিলেন, "দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পার?"

জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্ছে কবিতার চর্চ্চা। এমন সময় বললে কিনা টাকা ধার দিতে পার? যাও, আমি তোমার কবিতা রচনায় সাহায্য করব না।"

সুবোধের মুখে হাসি নাই। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। বলিলেন, "না ঠাট্টা নয়। গোটা পঞ্চাশেক দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলবটা শুনি?"

"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেন্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এসপার কি ওসপার।"

জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, " কি করতে চাও?"

"ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করব।"

"কি পাগল! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না, —তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেনই বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করবার সুযোগ পাবে?"

"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব, যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলে কার্য্যোদ্ধার।"

জগৎবাবুর মুখ হইতে হাস্যপরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন, "কি পাগলামি করছ? দেশসুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না—তুমি একা করবে? তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্যে দেশ-নায়কদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করবে?"

সুবোধ বলিলেন, "জগৎ, তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসাখরচ চালাচ্ছি, দেশ-নায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে — 'ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত?' —ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে আমি দুধ কিনতে পারিনে; শুধু কোলের মেয়েটির জন্যে একসের করে দুধ নিই; অন্য ছেলে মেয়েদের আমার স্ত্রী সুজি সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন ঝিই বেশীদিন টেকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি করে নিতে পারি, ত কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণমেন্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তা ত নয়। গভর্ণমেন্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে—আমি গভর্ণমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত

ক্ষতিটা কি? কতকাল আর এরকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "কি করবে স্থির করেছ?"

"বাড়ীটে বেশ করে সাজাব।"

"তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?"

"না, তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকামাত্র, বীজবপন মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে ফুলার সাহেবের সু-নজরে পড়ে যাব—কাজ বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত? না, শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে?"

"যখন যেমন বলব, তখন তেমন করবে। আপাততঃ আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে করে বেড়াও।"

"সে কাজ শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলছে—বাইরের লোক কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"তার জন্যে ভয় নেই।"

"তাই হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"—বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।

সুবোধও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময় জগৎ বলিলেন, "দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে ধরছে। এ খেলা মন্দ নয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে—সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেন্টের এই উন্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক—আমাদের ষড়যন্ত্রটি সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।"

"আর আমার হাতযশ।"—বলিয়া জগৎ সহাস্যে সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাটসাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোন উৎসবের আয়োজন করিতেছে না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরুক রহিয়াছে। নূতন লাটসাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউসন করিয়াছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্ণমেন্ট-পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নানাস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবরেজিষ্ট্রার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায়, জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে—সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজীভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দনপত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তার যোগে অবগত হইয়া, ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি-জানা পারিষদকে দিনাজসাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসীগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধবাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারোজন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারুপত্র আসিয়াছে।

কয়েকটা সদ্যচ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধবাবুর ফটকের উপর বাখারীর 'আর্চ্চ' তৈয়ারী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে 'আর্চ্চ' দেবদারুপত্র মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণঘট। গৃহের জানালাগুলির চারিপার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধবর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে পিচকারি দিয়া সে গুলিতে জলসেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধবাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল, যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামীকল্য সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহের কম্পাউন্ডে কিছু বাজী পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া বেশ পরির্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানি লম্বা তক্তা আনাইয়া তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণসূচক শব্দ-সমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক ও যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এ কি করছেন?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিলেন, "কাল লাটসাহেব আসছেন কিনা, তাই বাড়ীটা একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না, আপনি সাজাচ্ছেন কেন?"

"কেন, তাতে দোষটা কি?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্য সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে; এই কি উৎসবের সময়?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি? কেন শোক কিসের? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত—এ রুধিরপাত—যতদিন এর প্রতিবিধান না হবে, ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি।

সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিল। একজন বলিল, "আপনার পায়ে ধরি—এ সব ভেঙ্গে ফেলুন।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "এত খরচ করে করলাম, সব নষ্ট হবে?"

বালকেরা বলিল, "আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন, —আমরা স্কুল থেকে চাঁদা তুলে, নিজেদের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। অনুমতি করুন আমরা নিজে এ সব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধচন্দ্রের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। সকল কাজেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও লেখাপড়া করগে।"

বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন — এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি রাত্রে আসিয়া যদি সব ভাঙ্গিয়া দেয়? তৎক্ষণাৎ পোযাক পরিয়া পুলিস সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌছিয়া শুনিলেন, সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গলোয় গিয়া পুলিস সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধবাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব বলিলেন, "কি বাবু? কি চাই?"

"হুজুর, কাল লাটসাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, স্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আপনিই কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ হুজুর, আমিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুলিস্ সাহেব বলিলেন, "ইঁহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন, "আচ্ছা, সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনই চারিজন কনষ্টেবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকীল?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন?"

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুর, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।"

"অল্‌রাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নামটি কি?"

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে নাম পূরণ করিয়া তাঁহাকে দিলেন। সুবোধবাবু ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন যথাসময়ে লাটসাহেবের আগমন হইল। কাছারির পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। লাটসাহেবের ফেটন্ গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌছিল। কমিসনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবামাত্র সুবোধ নতমস্তকে সেলাম করিলেন। লাট-সাহেব স্মিতমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলীবৃক্ষ ও পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষদেশে শাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল।

Long Live Fuller

Welcome to Dinajshahi

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফেটন্ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। নয়টা বাজিলে পর, একখানি ঠিকাগাড়ী আনাইয়া সুবোধবাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন। পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই তিনজন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্তই গভর্ণমেন্ট-কর্ম্মচারী—ডেপুটি মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একসুট মাত্র পোষাক আছে, তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই, তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান, মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরি যায়। ডেপুটি, মুনসেফ, আমলা প্রভৃতি সরকারী চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, বে-সরকারী লোক অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার জন পনরো মুসলমান সভ্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইল। আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়ার অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব প্রথমে ইংরাজিতে ও পরে উর্দ্দুভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর "ইন্ট্রোডক্সনের" পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবোধবাবুও সাহসপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকেও লাটসাহেবের

নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার সুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উকীলেরা ভারী রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না হুজুর।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইভেট রভিউ করিতে আসিও।" —বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। পরে অন্যলোকে "ইন্ট্রোডিউস" হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া পকেট হইতে একখানি প্রাইভেট ইন্টারভিউ নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন — "তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; His Honour স্বয়ং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"

সুবোধ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎপ্রসন্ন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল — "দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?" — সবই ত হইল। এখন গভর্ণমেন্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সে সমস্তই ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া স্বকৃত পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাটসাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধবাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল।

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হইতে, এক গামলা গোবর ও কাদা-গোলা জল সুবোধবাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিতনেত্রে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল — "Long live Subodh Babu – Welcome to Pandemonium".

গোবর ও কাদা-গোলা জল তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যান্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধবাবু জুতা চব্ চব্ করিতে করিতে যথাসাধ্য ত্বরিত-পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই একটিমাত্র পোষাক—তাহা গেল নষ্ট হইয়া। এখন কি পরিয়া সুবোধবাবু প্রাইভেট ইন্টারভিউ করিতে যান?

স্নান আহার করিয়া তিনি অনাথবাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া একটু পোষাক ধার চাহিলেন।

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "মশায়, আচ্ছা, তা পোযাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী করছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইভেট ইন্টারভিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন?"

সুবোধবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন, "সাহেব নিজে বলেছেন; না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?"

ডেপুটিবাবুর হঠাৎ মনে হইল—এ সব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"না—তা যাবেন বইকি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবশ্য আপনার যাওয়া উচিত। বসুন, পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইভেট ইন্টারভিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯টার সময় শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাবাস্—সাবাস্। তুমি যা বললে তাই হল যে। তারপর লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেন্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন, "পাগল! তা হলে যে সন্দেহ করবে। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! সে সব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি করবে?"

"টেলিগ্রামের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খানকতক।"

জগৎবাবু টেলিগ্রামের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—"বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।"

"কিসের তার?"

"আমার কীর্ত্তি।"

"সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ-দাতা সুকুমারবাবু তোমার নামও লিখে গিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।"

"আর সে গোবরজলের কথাটা?"

"সেটা বোধ হয় লেখেননি।"

"আরে সেইটিই হল আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম মুসাবিদা করে এনেছি। সুকুমারবাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemoniumটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনা ভারি উত্তেজিত করবে।"

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধবাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিলেন, "মশায়, শুনলাম নাকি কাল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবরগোলা জল ফেলেছে?"

"ফেলেছিল বটে।"

"এ কথা সাহেবদের কাণে গেছে। পুলিস সাহেব আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিসগ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হলে, আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়িবাচ্ছা সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিস করে দিন।"

সুবোধবাবু বলিলে, "কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিস করব?"

"ও বাড়ীতে ছেলেপিলে যারা আছে, তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ করে নিচ্ছি। আর তাদের বাপ, — উকীলবাবুটি, — তিনি নিশ্চয় ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।"

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, আমি ত কাউকে দেখতে পাইনি, কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না।"

দারোগাবাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধবাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন—যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবরজল ঢেলেছিল, তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে। খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব হবে না।

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় টীটী পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন, "এমন স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।" একজন রসিক লেখক, "সুবোধবাবুর পাপমুক্তি" নামক একটি কবিতায় লিখিলেন গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ, লাট দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধবাবুর যে পাপ সঞ্চয় হইয়াছিল, গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে। —এই উপলক্ষে ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধবাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। সুবোধবাবুর সৎসাহসের প্রশংসাও বাহির হইল।

এদিকে দিনাজসাহীতে সুবোধবাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বার-লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধবাবুর অনুপস্থিতিকালে একজন উকীল একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন, "কি হে, তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চায়, না কি হতে চায়?"

জগৎবাবু রাগিয়া বলিলেন, "আর মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুত্ব—"

"বন্ধুত্ব! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটা করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

জগৎবাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন, "আমি ওর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাট সাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরীমোহনবাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরীবাবু বৃদ্ধ, অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায়, তিনি কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "সুবোধ কাজটা যা করেছে তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলেমানুষ, না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর ওপর অমন করে জুলুম করতে আছে! আহা বেচারি কাগজে যা গালটা খেয়েছে, অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।" —ফলতঃ দুই-চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধবাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

"এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুর্সৎ পাইনে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ, আসতে ভয় করে, পাছে ধরা পড়ে যাই। কিন্তু আসল কাজের ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে, —কেবল কি গাল খেয়েই মরলে?"

"আসল কাজই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।"

"কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না!"

'না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর 'বারে' আর সুবিধে হবে না। হলাম যেন সরকারী উকিল—কিন্তু বার লাইব্রেরিতে কেউ আর আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে?"

"তবে কি করবে?"

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিমী পদটাও লোভনীয়।"

"তবে তাই দরখাস্ত কর না।"

"না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।"

"আর কি গোড়া বাঁধবে?"

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে দাও, ব্যস আর কিছু চাইনে। তাহলেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।"

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরীবাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্চ নাকি?"

"অবশ্য।"

"তোমার নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরীবাবু বলে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তারপর?"

"তারপর আমি উঠে আসব। তারপর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে কাগজে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না হে—অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। কাজটিও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি ওপর সব নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেন্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।"

অনেক বলা কহার পর জগৎবাবু রাজী হইলেন। এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎবাবু ঠিক মুহূর্ত্তে বলিলেন, "মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধবাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জ্বাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল, "আমরাও খাব না।" —বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধবাবু বলিলেন—"মশায়—একজনের জন্যে আপনারা এত জন কেন অভুক্ত ফিরে যাবেন? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্ছি।" —বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরীবাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিলেন, "ভাই, চলে যেও না। এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।"

সুবোধবাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "এত অপমান সহ্য হয় না।" —বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন, এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজসাহী যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা সমস্ত জেলার অনুকরণযোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্যকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে — "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, দিনাজসাহীর উকীলবাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আগাম গভর্ণমেন্ট ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অপ পুলিস্‌সের কর্ম্ম দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।"

সুবোধ বলিলেন, "তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুললো। এত কাণ্ড করে — এত গাল খেয়ে—শেষে পুলিসে চাকরি।"

জগৎবাবু বলিলেন, "গভর্ণমেন্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বই ত নয়।"

"মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে—আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্ছে না। দেখ, এই এক মাস জাল-স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিসের চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে। কোথায় কে বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম্ বলছে—মার তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পারব না। তার চেয়ে 'বারে' আমার এ উপবাসই ভাল।"

জগৎবাবু বলিলেন, "দেখ, আমার বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গভর্ণমেন্ট তোমাকে তাই দিতে চাইত। সেটা গভর্ণমেন্টকে জানান ভাল। যাও, শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।"

"এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না। শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব?"

"ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেন্টের চিঠিরই সমান।"

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলঙ যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল সুবোধবাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবোধবাবু এখন ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় না। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

(প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৪)

হাতে হাতে ফল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালারবাবুকে বলিতেছিলেন, "তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিকশ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

সিগনালারবাবু বলিতেছিলেন, "আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। এই একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগনালারবাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ীভাড়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিতে চাহিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ওকি? না—না, রাখুন।"

সিগনালারবাবু বলিলেন, "তা হলে যে বড়ই অন্যায় হয়!"

"না—না। কিছু অন্যায় হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম করে দিই; তারপর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন, তার আর কি?" —বলিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।"

উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত "বীর-ভারত" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তারবাবু সরকারী চাকর হইলেও, অন্যান্য সরকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কাণাঘুসা করিয়া থাকে। বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেণও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোক্তার এবং ছাত্রগণ পরিবৃত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যেই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল— "এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন, "কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে।" —বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, "বাদশাহ-কা-দোস্ত" আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ রেশমী চাদরধারী মূর্ত্তিমান রাজদ্রোহীকে এক ধাক্কা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয়বাবু "বীর-ভারত" পত্রিকার সম্পাদক হইলেও অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একযোড়া সোনার চশমা,—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চূরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহার সহচরগণ বন্দেমাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিনজনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেইদিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে) — ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন; — তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগল।

ডাক্তারবাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন বিনয়বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন; — পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়া "বীর-ভারতে" এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

হরগোবিন্দবাবু স্থানীয় হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন,— নেটিভ ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহরে দুইজন এম-বি, কয়েকজন এল-এম-এস থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দবাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইভেট কল্ তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দবাবুর দুই পুত্র; — একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি-এ পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল, স্থানীয় জেলা স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল — গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দবাবু হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল, "বাবা, সাহেবটা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা বেচারীকে বড্ড মেরেছে।"

অজয় বলিল, "তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট। বেশ হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখ, সে অন্যায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন লোককে পাঁচজন পড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না!"

অজয় বলিল, "ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীর কখনও ন্যায়যুদ্ধ হতে পারে?"

"কেন?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকর্দ্দমা হয়, তবে হাকিম কি ন্যায়বিচার করবে?"

ডাক্তারবাবু হাসিলেন। বলিলেন, "তোমার যুক্তিটা ত বেশ দেখছি! অন্যে অন্যায় করে, সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায় ন্যায় অন্যায় স্থির হতে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ,একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে রাজপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?"

অজয় বলিল, "গায়ের জোর না থাক, মনে জোর পাচ্ছে। মনের জোরেই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তারবাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন, "তা ঠিক বটে। মনের জোরই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ করেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা বোনের

সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতি বল প্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না?"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতে, সাহেবমারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ মহলে, হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিসকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভার কোতোয়ালীর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগাবাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ছোকরা দলের উকীল ও মোক্তারকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককেও ধৃত করিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর ছয়টার সময় সেইমত ডাক্তারবাবু শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্রবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগাবাবু বলিলেন, "আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তারবাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কি হয়েছে?"

"পরশুকার সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন? আসামী ত অনেকগুলি ধরেছেন শুনলাম।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদুহাস্য করিলেন।

দারোগাবাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কী করে?"— বলিয়া ডাক্তারবাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

'গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দ্দান্ত। এক একটা গুণ্ডা। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাস্তা দিয়ে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টোদিক থেকে আসছে, সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন?"

"না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে, কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্চে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে হাজতে পুরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগাবাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হলে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে? আমি কি করব?"

"আজ্ঞে হেঁহেঁ—আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম—সাক্ষীটা দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগোবাবুর সুপ্রচুর দাড়ি গোঁফের মধ্য হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তারবাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে, কিন্তু ঘটনাস্থলে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাইনি।"

দারোগাবাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তাই ত! বড় মুস্কিল হল যে! আহা, এ কথা যদি আগে জানতাম!"

"কেন, হয়েছে কি?"

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "না জেনে বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করেছি।"

১ দফা প্রকাস থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস শ্বপক্ষ দেশী চিণী ও করকচ নবন সর্ব্বোদা আহার করে স্ত্রির বেনামীতে ভারত কটন মীলে পাঁচশত টাকার শেয়াল খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগন আসামী কদাজ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাঠাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাস থাকে পরম্প্রায় সুনিলাম উক্ত হরগোবিন্দ বলিয়াছে আমী জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

ইতিমধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু দারোগা বলিলেন, "সাহেবের হুকুম নাই।"

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্চ্চওয়ারেন্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানার দারোগাবাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরুচুরির আসামীর সঙ্গে দারোগাবাবুর দরদস্তুর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল, হাল গোরু বিক্রয় করিয়া দারোগাবাবুর পাণ খাইবার জন্য অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছেন, দুই শত টাকার এক কাণাকড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না। এমন সময় সার্চ্চওয়ারেন্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন — "তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দুসী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া গোহালে অনধীকার প্রবেস করতঃ জাব খাইতেছিল তদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।"

গোরুচোরকে বিদায় দিয়া, বদনবাবু সাবধানে সার্চ্চওয়ারেন্টখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পরিধান করিয়া, দশ বারোজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া দারোগাবাবু বীরদর্পে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী-স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তারবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁকডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাহাকে সার্চ্চওয়ারেন্ট দেখাইয়া স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। কনেষ্টবলগণকে দারোগা বলিলেন, "সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়"। —যেগুলির চাবি ছিল সেগুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিষপত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগাবাবু জুতার ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া সেগুলো বিক্ষিপ্ত করিয়া "তল্লাস" করিতে লাগলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগাবাবুর জুতার ঠোক্করে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজ পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে একখানি 'আনন্দ মঠ' পুস্তক বাহির হইল, —তাহা দেখিয়া দারোগাবাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক "তল্লাসী" হইল। ডাক্তারবাবুর প্রেস্কৃপসন বহি, তিনটি চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিকপত্র, —সমস্তই দারোগাবাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া, একস্থান হইতে একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধ বোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,— লেবেলে একটা হরিণের চিত্র। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগাবাবু একবার ঘ্রাণ লইলেন। পরে সাক্ষীদ্বয়কে বলিলেন, "ডাক্তার তয়ের লোক।—একটু হবে?"

সাক্ষী দুইটি বলিলেন, "না মশায়, আমরা মদ খাইনে।"

দারোগাবাবু তখন একটি মেজর গ্লাসে খানিক ঢালিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন, "এটা কি? ব্র্যান্ডি বটে ত?"

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন, "হাঁ ব্র্যান্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "গদি বালিসগুলো কাট্ ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবল তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানাপত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তুলা বাহির করিয়া ফেলিল। তুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগাবাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদনবাবু বলিয়া উঠিলেন — "হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কি না দেখ।"

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমে ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি মজঃফরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগাবাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন — "বৃহৎ বাসের লাঠি দুইটী রক্তের চীর্ণ পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।"

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দবাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তারবাবু একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে হরগোবিন্দবাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দবাবু গিয়া বলিলেন, "মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন, "দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন, "কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বলেন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন, "তার চাইতে এক কাজ করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—"। অপর বাবুটি স্পষ্ট বক্তা। তিনি বাধা দিয়া বললেন, "ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে — আমাদের ত হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় করে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে থাক।"

"প্রণাম হই মশায়।" — বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব তখন টেনিসের পোযাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেটখানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লাব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দবাবু তখন সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবু?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না?"

"আজ্ঞে হাঁ, দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন — "How dare you! দুইদিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তারবাবু স্ত্রীকন্যাগণের নিকট বসিয়া ছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান লাঞ্ছনা, —সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তারবাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, "ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

ভৃত্য শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল, "একঠো রোগী আছে—বোলাহাট এসেছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"

শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল—"ঐ লোকঠো আবার এসেছে, বলে ডাংদারবাবুর সাথ ভেট না করে হামি যাব না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি ত উঠতে পারি নে—আচ্ছা বাবুকে নিয়ে আয়।"

বধূ কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিল। বলিল, "বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে? কি ব্যারাম?"

"সে আর কি বলব! কোন্ মুখেই বা বলি?"

ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি কে?"

"আমি থানার রাইটার কনষ্টেবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগাবাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্যে তিনি লজ্জায় মরে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম?"

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমাকে কেন? আর কি ডাক্তার নেই?"

মুন্সীবাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন — বলিলেন, "দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তারবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ? —লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সীবাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন, "একটু গরম দুধ এনে দেব?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন, "গিন্নিমা কোথায়?"

"কে গা তোমরা?"

ঝি বলিল, "উনি বদন দারোগার পরিবার।" —সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কেন—কেন?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন, "এমন ব্যারাম?"

"হ্যাঁ মা। ডাক্তারবাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা, —তাঁর ব্যারামে অন্য ডাক্তার বুঝবে না, ত বাঁচবে কেমন করে? এইখানে কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখানে কি খেলেন? এখানে ত কিছু খাননি।"

যুবতী বলিলেন, "আমায় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ — এ সময় আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইঁহাকে হরগোবিন্দবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। যুবতী ডাক্তারবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমায় রক্ষা করুন।"

গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন, "তিনি বলছিলেন, খানাতল্লাসী করবার সময় ওষুধের আলমারিতে একটা ব্র্যান্ডির বোতল ছিল, ব্র্যান্ডি মনে করে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্চে সেটা ব্র্যান্ডি নয়, কোনও বিষ-টিষ।"

একথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ওষুধের আলমারিতে ব্র্যান্ডির বোতল?"

শুনিবামাত্র ডাক্তারবাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চললাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন, "বাবা, আমার কপালের সিঁদূর থাকবে ত?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের হাত মা।" —বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারারাত্রি জাগিয়া ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

(প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫)

মা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সুখচরের চক্রবর্তীদের বধূ দয়াঠাকুরাণী যখন তাঁহার বহু মানত ও ব্রতসাধনার ফল একমাত্র ষষ্ঠীচরণকে লইয়া বিধবা হইলেন, তখন ষষ্ঠীচরণের বয়স মাত্র তিন বৎসর, দয়াঠাকুরাণীর বয়স তখন ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ আপনার গৃহের গৃহিণী ও বিষয়-আশয়ের কর্ত্রী হইয়া কিছু স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভাসুর রামরাম চক্রবর্তী যখন অকস্মাৎ ভ্রাতৃবিয়োগে ব্যথিত হইয়া বধূমাতার বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন দয়াঠাকুরাণী তাঁহার এই পরোপকারব্রতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া বলিলেন, "থাক, সে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, ষষ্ঠীচরণ যতদিন না মানুষ হয়, ততদিন আমিই কোনোমতে চালিয়ে যেতে পারব।"

রামরাম চক্রবর্তী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সাহসিকা রমণীর নিন্দা প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কুলপুরোহিত সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য আসিয়া কহিলেন, "বৌ ভগবানের আশীর্বাদে তোমার তো কিছুরই অপ্রতুল নেই, তুমি স্বামীর প্রীত্যর্থে সাবিত্রী-ব্রত আর পুত্রের কল্যাণার্থে কুক্কুটব্রত অনুষ্ঠান কর।"

দয়াঠাকুরাণী বিনম্র বচনে বলিলেন, "স্বামীকে যদি তাঁর জীবদ্দশায় শুধু প্রীতি দিয়ে সুখী করে থাকতে পারি, পরলোকেও তিনি শুধু অন্তরের ভক্তি পেয়েই তৃপ্ত হবেন, প্রেমের নিষ্ঠাই আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর পুত্রের মঙ্গলের জন্যে মার ব্যগ্র প্রাণ যা করবে তা শাস্ত্রাচার অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠ!"

ভট্টাচার্য মহাশয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলেন। কৃপণ বিধবার নিকট তাঁহার প্রাপ্তির কোনো আশা আর রহিল না।

দয়াঠাকুরাণীর নিন্দা প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে, স্নানের ঘাটে, মুখুজ্জেদের বৈঠকখানায় বিঘোষিত হইতে লাগিল। দয়াঠাকুরাণী সমস্তই শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও দমিলেন না। নিন্দা কুৎসা গায়ে না মাখিবার মতো তাঁহার চরিত্র স্বাধীন ও বলশালী ছিল।

গ্রামে তাঁহার আত্মীয়েরও অভাব ছিল না। যাহারা সকলের নগণ্য, যাহারা সকলের হেয়, যাহারা উপেক্ষিত, তাহারাই ছিল দয়া দেবীর আপনার জন। তিনি হাড়ি-ডোম-দুলে-বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির বাড়ী মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাদের নোংরা ছেলেমেয়েদের ছুঁইয়া আদর করিতেন, কাহারো পীড়া হইলে তাহার মলিন শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন, বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিতেন না; অবস্থাবিশেষে শুধু হাত পা ধুইয়া, খুব বেশি তো কাপড়খানা ছাড়িয়াই, তিনি আপনাকে শুচি বোধ করিতেন, একটু গঙ্গাজল পর্যন্ত স্পর্শ করা আবশ্যক বোধ করিতেন না। কেহ অন্তত পক্ষে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলে তিনি উত্তর করিতেন, "এক ঘড়া পুকুরজলে যদি আমি শুচি না হয়ে থাকি, এক ফোঁটা গঙ্গাজলে আর আমায় বেশি কি শুচি কর্‌বে?" এ উত্তরে পল্লীবিধবাগণ অবাক হইয়া শুধু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিত।

দয়াদেবীর অনাচারের জন্য যখন তথাকথিত ভদ্রসমাজের নরনারী বিমুখ হইয়া তাঁহার ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ত্যাগ করিল, তখনও তিনি ভীত হইলেন না; অথবা আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন না। সকল দরিদ্র, নকল নির্যাতিত, সকল উপেক্ষিত নরনারী তখন তাঁর পরমাত্মীয় এবং তাহার প্রেমবদ্ধ অনুচর সেবকও অগণ্য।

দুলে-বাগদির ছেলেরা অপর কোনো শুচিবায়ুগ্রস্তা রমণীকে দেখিয়া "ওরে বাম্‌নী আসছে, পথ ছেড়ে দাঁড়া" বলিয়া ম্লান কুণ্ঠিতমুখে অপথে গিয়ে দাঁড়ায় স্নানের সময় পাছে গায়ে জলের ছিটা লাগে বলিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভরে স্নান করে; আর দয়া দেবীকে দেখিয়া তাহারা মা বলিয়া হাসিয়া নাচিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে; শিশুহৃদয় সমগ্র গ্রামের মধ্যে কেবল একজনের কাছে হৃদয়ের পরিচয় স্বাধীনতার সংবাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়। অন্ত্যজ-মন্য পুরুষেরা দয়াদেবীর অভিলাষ জানিবামাত্র তাঁহার কর্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, নারীগণ আপনাদের গৃহ-প্রাঙ্গণের তরি-তরকারী দিয়া আপনাদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে প্রতিযোগিতা করে।

একদিন দয়াদেবী সমাগতা রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, মোছলমান বউ অনেকদিন এদিকে আসেনি কেন? তার কেউ কিছু খবর জানিস?"

একজন বলিল, "তার মা, বড় ব্যামো; বাঁচে কি না বাঁচে। আহা মাগী মোলে তার ছেলেটার কি যে অবস্থা হবে কে জানে? আহা মাগী বড্ড ভালোমানুষ ছিল। মোছলমান তো নয়, যেন হিঁদুর ঘরের বিধবা, এমনি তার নিষ্ঠে, এমনি তার মন!"

সমবেত রমণীগণ সকলেই সেই মোছলমান-বউয়ের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়াদেবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দুলে-বৌ তুই একটু আমার সঙ্গে যাবি? আমি একবার মোছলমান-বউকে দেখ্‌তে যাব।"

দুলে-বউ বলিল, "তা কেন যাব না মা, কিন্তু সে যে অনেকটা পথ।"

"ত হোক, আমি একবার যাব"—বলিয়া দয়াদেবী যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া তাহার কোণে কোণে কিছু সাগু, বার্লি, মিছরি, কিসমিস্‌ একটু আমসত্ত্ব বাঁধিয়া লইলেন, আর আপনার অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন পাঁচটি টাকা।

মুসলমান-বধূটির গৃহ গ্রামান্তরে, প্রায় এক মাইল পথ হইবে। মুসলমানী তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে পঁচিশ বৎসর বয়সে পুত্র জহর আলিকে কোলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। সে নিঃস্ব চাষীর গৃহিণী ছিল; বিধবা হইয়া আপনার শিশুপুত্রটিকে লালন-পালনের জন্য সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সামান্য চাষীর ঘরে জন্মিয়াও আস্‌মানীর এমন একটি প্রস্ফুট অথচ স্নিগ্ধ শ্রী ছিল, যাহা চাষীর ঘরে দুর্লভ, আর সেই ললিত শ্রীকে মহিমান্বিত করিয়াছিল তাহার শ্রমপটু নিটোল স্বাস্থ্য ও কোমল মধুর প্রাণটি। এত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য যাহার, তাহাকে আশ্রয় দিবার পুরুষের অভাব কখনই ঘটে না, অনেকে তাহাকে নিকা করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আস্‌মানী সে-সকল প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছিল, "খোদার দোয়াতে যার ছেলেকে আমি কোলে পেয়েছি, তার ছেলেরই মা হয়ে আমি মর্‌ব, খোদাতালার দোয়াতে জহর আমার বেঁচে থাকুক।" অতঃপর আস্‌মানী চিঁড়া কুটিয়া ধান ভানিয়া আপনার শিশু-পুত্রকে পালন করিতে লাগিল।

আস্‌মানী দয়াঠাকুরাণীর বাড়ী চাল চিঁড়ার উঠানা দিত। দয়াঠাকুরাণী যখন আস্‌মানীর হৃদয়ের ইতিহাস শুনিলেন, তাঁহার নিজের পতিপ্রেমনিষ্ঠ মাতৃহৃদয় আর একটি হৃদয়ে আপনারই প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনুরক্ত হইল; সেই দিন হইতে মোছলমান-বউ দয়াঠাকুরাণীর পরমাত্মীয় সখীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল। গ্রামের লোক দয়া-ঠাক্‌রুণের কাণ্ড দেখিয়া আরও ছি ছি করিয়া উঠিল।

দয়াঠাকুরাণী যখন আস্‌মানীর দীন কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আস্‌মানীর অন্তিমকাল। দয়াঠাকুরাণী তাহার শিয়রে বসিয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিলেন, "মোছলমান-বউ, আমি এসেছি। চিন্‌তে পার?"

আস্‌মানী চোখ মেলিয়া বলিল, "আঁ্যা কে? দিদিঠাক্‌রুণ এসেছ? খোদার বড় মেহেরবানি! দিদিঠাক্‌রুণ, আমার জহর রইল, তাকে দেখো, সে তোমার যষ্ঠীর নফর।"

দয়াদেবী অশ্রুমার্জন করিয়া বলিলেন, "জহর যষ্ঠীর নফর নয়, যষ্ঠীর ভাই! জহর, বোন, আমারই ছেলে।"

"এখন আমি সুখে মর্‌তে পার্‌ব। দিদি, জহরকে আমার বুকে দাও, আমি মরে গেলে জহর তোমারই গলগ্রহ!"

পুত্রকে বুকে লইয়া আস্‌মানীর মৃত্যু হইল। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মির মতো একটি ক্ষীণ হাস্যজ্যোতি তাহার সুখমৃত্যু ঘোষণা করিল।

২

জহর আলি এখন হিন্দুমাতার নিকট জহর লাল। সে ষষ্ঠীচরণের ক্রীড়া-সহচর, সে অশনে-বসনে, আদরে মমতায় ষষ্ঠীচরণের সমকক্ষ; উভয়ে একত্রে পাঠশালে যায়। কিন্তু সেই শিশু আপনার মাকে কি ভুলিতে পারিয়াছিল?

দয়াঠাকুরাণী যথেষ্ট স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত হইলেও ঠিক সহজভাবে জহরকে আদর-যত্ন করিতে পারিতেন না। একই ঘরে হইলেও তাহার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিছানা ছিল। শয়নগৃহ যথাসাধ্য আসবাবশূন্য করা হইয়াছিল, পাছে জহর সে-সকল স্পর্শ করে। অন্যান্য ঘরেও সর্বদা সতর্কভাবে শিকল দেওয়া থাকিত, বালক জহর প্রবেশ না করে। আহারের সময় ষষ্ঠীচরণ ও জহরকে একটু তফাতে তফাতে বসানো হইত, ষষ্ঠীকে মা খাওয়াইয়া দিতেন এবং জহর অন্ন স্পর্শ করিবার আগেই তাহার ভাত মাখিয়া গ্রাস ভাগ করিয়া দেওয়া হইত, এবং বালক জহর ভালো করিয়া খাইতে না পারিলে, দয়া ঠাকুরাণী একটু তফাতে বসিয়া বাক্যে ইঙ্গিতে তাহাকে উপদেশ দিতেন। কখনো কখনো বা বাড়ীর কৃষাণ আলিজানকে ডাকিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। খাইতে খাইতে এক-একদিন শিশু জহর অকারণে কাঁদিয়া ফেলিত, তাহার সে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সহজে থামিতে চাহিত না। সেই শিশুচিত্তে স্নেহ-তারতম্য কি আঘাত করিত? শিশুচিত্ত কি এত সূক্ষ্ম অনুভবনশীল?

একদিন বর্ষার বিরল সন্ধ্যায় চারিদিক মেঘে গম্ভীর আচ্ছন্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল; সিক্ত শীতল বায়ু একটু জোরেই বহিতেছিল। অঙ্গনে কর্দ্দম, গগনে অন্ধকার। এমনি দিনে নরনারীর প্রাণে একটা নিবিড় মিলন, একটা মধুর সঙ্গ, একটা প্রগাঢ় স্নেহ লাভ করিবার ব্যাকুল বাসনা জাগ্রত হয়। নিষ্কর্মা শিশুচিত্ত আজ দোলাই জড়াইয়া ঘরের দাওয়ায় চুপটি করিয়া বসিয়া থাকাকে বড় ক্লান্তিকর মনে করিতেছিল। ষষ্ঠীচরণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জহর বসিয়া বসিয়া স্তব্ধ গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। দয়াঠাকুরাণী মালাজপ করিতে করিতে বলিলেন, "জহর, ঘুম পেয়েছে? যাও বাবা, ঘরে আপনার বিছানায় গিয়ে শোওগে, আমিও জপ সেরে যাচ্ছি।"

জহর শুধু বলিল, "এখনো ঘুম পায় নি!" শিশুনেত্রের ঘুম আজ কিসে টুটিয়াছে?

দয়াঠাকুরাণী মালাজপ শেষ করিয়া আপনার নিদ্রিত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "চল জহর, ঘরে চল।"

জহর বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "শোও বাবা, শোও।"

জহর নড়িল না।

দয়াঠাকুরাণী আবার বলিলেন, "শোও বাবা, রাত হয়েছে, ঘুমোও।"

জহর তথাপি নির্বাক নিশ্চল।

দয়াঠাকুরাণী ষষ্ঠীকে বিছানায় শোওয়াইয়া উঠিয়া আসিয়া জহরের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাহার দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, বল কি চাই?"

তখন সেই বৎসরের বালক মাথা নীচু করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল বলে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া অতি করুণ মিনতির স্বরে বলিল, "মা, তুই আমাকে একবার আপনার মার মতন কোলে নে না।"

শিশুর মুখে এ কি নিদারুণ বাণী! দয়াদেবীর প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মতন হইল, তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দু-বাহু মেলিয়া জহরকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাহাকে কোলে উঠাইয়া তাহার মুখ চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, হিন্দুবিধবার সকল আচার আজ হৃদয়ের কাছে, প্রেমের কাছে, খর্ব হইয়া গেল! জহরকে

কোলে করিয়া দয়াদেবী বড় কান্নাটাই কাঁদিলেন, আর মাতৃস্নেহ-রসতৃপ্ত জহর তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পরম সুখে হাসিমুখে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দয়াদেবী আপনারই শয্যার এক পার্শ্বে তাহাকে শোওয়াইয়া নিজে উভয় পুত্রের মধ্যে শয়ন করিলেন। সে দিন হইতে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। দয়াদেবী গ্রামে পতিতা হইলেন।

৩

ষষ্ঠী ও জহর বড় হইয়াছে। তাহারা উভয়েই এফ-এ পাশ করিয়াছে। ষষ্ঠী ঠিক করিল সে বি-এ পড়িবে; জহর বলিল, সে পুলিসের দারোগাগিরি পরীক্ষা দিবে। ইহা শুনিয়া ষষ্ঠী বলিল, "ছি ছি, যে চাকরী দেশের লোকের হেয়, তাই তোমার চরম অবলম্বন ঠিক করলে।"

জহর গম্ভীর ভাবে বলিল, "না করে করি কি? যত শীঘ্র হয় নিজে উপার্জন করতে হবে, আর কতকাল পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব!"

ষষ্ঠী আর তাহাকে কিছু বলিল না, কথাটা মাকে বলিল।

দয়াঠাকুরুণ জহরকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে জহর, আমি তোর পর, আর তুই আমার গলগ্রহ!"

জহর নিরুত্তর হইয়া শুনিল মাত্র। কিন্তু আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

শৈশবে মাতৃস্নেহ লইয়া উভয় শিশুর মধ্যে যে ঈর্ষা জন্মিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বঞ্চিত জহরের সেই ব্যথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এবং ক্রমশ জহরকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সে আজ স্বাধীন হইবার জন্য, ষষ্ঠীর মার অনুগ্রহ এড়াইবার জন্য অকস্মাৎ বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠী থাকিতে না পারিয়া রাত্রে আবার জহরকে বলিল, "জহর, ভালো করে ভেবে-চিন্তে কাজ কোরো। আজ যে-তোমাকে লোকে যতটা শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, সেই তোমাকে কাল পুলিসের পোষাক-পরা দেখে ততটা শ্রদ্ধা, ততটা বিশ্বাস করতে সঙ্কুচিত হবে; এমন ঘৃণ্য অধম যে জীবিকা তার চেয়ে কি মার স্নেহ-দান হেয়?"

"হেয় শ্রেয় আমি জানি না, অত কথার মারপেঁচও বুঝি না। দেশের হাজারো লোক পুলিসের কাজ করচে, আমিও করব। আর, পুলিসে যে কাজ করে সেই কি বদমাইস, ভালো লোক কি পুলিসে নেই?"

"থাকতে পারে। কিন্তু আমি জানি কত লোকে আগে দেবতার মতো ছিল, পুলিসের কাজে পিশাচ হয়েছে। পুলিসের অনেকেই মন্দ বলেই তো দুর্নাম। আমাদের অন্ন যদি এই বারো বৎসর হজম হয়ে থাকে, তবে আরো কিছুদিন হজম হবে, তুমি মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাও।"

"ও বাবা, পাঁ— আঁচ বচ্ছর?"

"তবে বি-এ পাশ করে বি-এল দিয়ো।"

"সেও তো চার বচ্ছর।"

"তবে পি-এল পড়।"

"তবু দুবচ্ছর।"

"তবে মোক্তারী দাও।"

"এফ-এ পাশ করে মোক্তার?"

"ক্ষতি কি! পুলিসের চেয়ে ভালো।"

"ছি! কক্‌খনো না।"

"তবে দারোগা হওয়াটা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়?"

"নিতান্তই।"

"বেশ!"

দুই ভায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া গেল।

এবারে মার বুঝাইবার পালা। দয়াঠাকুরাণী জহরকে বলিলেন, বাবা, চাকরীই যদি তোর নিতান্তই করতে হয়, অন্য চাকরী কর্ না; আরো তো ঢের আপিস আছে।"

"অন্য চাকরীতে মা পয়সা নেই, পুলিসের চাকরীতে দু'পয়সা তবু আছে।"

"ছি বাবা, এ কি তোর কথা? এ কি আমার ছেলের উপযুক্ত কথা! মাইনের অতিরিক্ত যে উপরি-পাওনা সে তো চুরি?"

"না মা, চুরি না করেও পয়সা রোজ্‌গার করা যায়, অনেক জমিদার বড় লোকে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে উপহার দেয়।"

"সে উপহার নয়, ঘুষ।"

"ষষ্ঠী তোমায় এই রকমই বুঝিয়েছে। আমার কথা তুমি বুঝবে না। যাই হোক, আমি আর ষষ্ঠীর অন্নদাস হয়ে থাক্‌চিনে। ষষ্ঠীর অনুগ্রহ পেয়ে জীবন ধারণ করা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

"ষষ্ঠীর অনুগ্রহ না মনে করে তোর মার স্নেহদান মনে করলেও তো পারিস।"

"সে তো কল্পনা, সত্য যে অন্যরূপ।"

দয়াঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, "সত্য কি তা' ভগবান জানেন, একদিন তুইও জানবি। জহর, তুই আমার বড় দুঃখের ছেলে। তোকে যেদিন থেকে কোলে পেয়েছি, সেদিন থেকে অনেক দুঃখ আমায় সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু সে সবের চেয়েও আজ আমার বড় দুঃখ যে, তুই তা বুঝলিনে। আমি আর কি বলব, ঈশ্বর তোকে শুভমতি দিন।" তাঁহার মনে পড়িল এই জহরের জন্য তিনি কতখানি ত্যাগ, কতখানি নিন্দা, কৃতখানি নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, সে কথা তিনি ষষ্ঠী বা জহর কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আজ সেই দুঃখপালিত জহরকে বিদ্রোহী দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে বেদনা জাগিয়া উঠিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

৪

জহর চারি বৎসর দারোগা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন নবাবগঞ্জে আসিল, তখন ষষ্ঠী এম-এ পাশ করিয়া নবাবগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এতকাল পরে আবার দুই ভাইয়ের মিলন হইল। ভবিতব্য!

জহর সুখচর ছাড়িয়া ষষ্ঠী বা তাহার মাতার কোনো সংবাদই রাখে নাই। এতদিন পরে ষষ্ঠীকে দেখিয়া সে বিশেষ খুশি হইল না। জহর এখন পুরাদস্তুর পুলিস, হৃদয় নামক পদার্থটা প্রশ্রয় না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নবাবগঞ্জ স্বদেশীভাবের প্রধান আড্ডা, জেলার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জহরকে ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি লিখিলেন, হুঁসিয়ার! জহর প্রত্যুত্তরে লিখিল, যো হুকুম খোদাবন্দ! জহর গোপনে গোপনে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি কাগজের পাঠকের নাম সংগ্রহ করিতে লাগিল; কে কে সাধ্যপক্ষে স্বদেশীব্রত পালন করিতেছে তাহাদের সন্ধান হইল; কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য পড়িল তাহার ষষ্ঠীচরণের উপর।

একদিন এক স্বদেশী-দ্রব্য-বিক্রেতা আসিয়া ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মাষ্টারবাবু শুনেছি দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমায় যদি রক্ষা করেন।"

ষষ্ঠীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

দোকানদার বলিল, "দারোগাবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে বলেছেন, তাঁকে দুশো টাকা না দিলে তিনি আমার দোকান আর বাড়ী লুঠ করাবেন।"

শুনিয়া ষষ্ঠীচরণের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। ষষ্ঠী জহরের সঙ্গে দেখা করিয়া তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "জহর, তুমি অধঃপাতে গেছ জানি। এ সব কি ব্যাপার? দুর্বল নির্দোষীকে পীড়ন করায় তোমার কী পৌরুষ?"

এ ভর্ৎসনায় জহরও ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, "যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। আমি তো আর তোমার স্কুলের ছাত্র নই যে, চোখ-রাঙানি দেখে ডরাব।"

ষষ্ঠীচরণ উদ্যত ক্রোধ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিল, "ষষ্ঠীচরণ নবাবগঞ্জে থাক্‌তে তুমি কোন জুলুম কর্‌তে পার্‌বে না।"

জহর একটু হাসিয়া বলিল, "সে দেখা যাবে।"

সেইদিন হইতে জহর সপ্তাহে সপ্তাহে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস-সুপারিটেণ্ডেন্টের কাছে ষষ্ঠীচরণের নামে নানাবিধ রিপোর্ট করিতে লাগিল। ষষ্ঠী স্কুলের ছেলেদের লইয়া বাজারে লোককে বিলাতী দ্রব্য কিনিতে বাধা দেয়, ক্রীতদ্রব্য কাড়িয়া জ্বালাইয়া লোকসান করে, বিলাতী পণ্যের ব্যবসায়ীদিগকে মারপিট করিবার ও ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখায়, এবং সর্বোপরি ষষ্ঠী কার্লাইল সার্কুলার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজদ্রোহে তালিম করিতেছে।

উপর হইতে গোপন হুকুম আসিল, যেমন করিয়া পার ষষ্ঠীচরণকে জব্দ কর। জহর চিঠি পড়িয়া মুচ্‌কি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিল।

সেইদিন বাজারের মাতব্বর গোল্‌দার সলিম-উল্লা, দারোগা সাহেবের আহ্বানে থানায় গিয়া, ঘণ্টা দুই গভীর পরামর্শের পর বড় গম্ভীরভাবে ফিরিয়া আসিল।

সেই দিন রাত্রি প্রায় দুটার সময় সলিম-উল্লার বিলাতীপণ্যের দোকানে আগুন লাগিল। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। বাজারে মহা চীৎকার, ব্যস্ততা ও শোর্‌গোল লাগিয়া গেল। ষষ্ঠীচরণ এই গোলমালে ঘুম হইতে উঠিয়া দিগ্‌দাহকর বহ্নিশিখা দেখিল এবং অমনি তূর্যধ্বনি করিয়া স্কুলের ছাত্রগঠিত আশাবাহিনীকে আহ্বান করিল। স্কুলের প্রথম তিন ক্লাসের ছাত্রগণ ত্বরিত ষষ্ঠীচরণের গৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ষষ্ঠীর পশ্চাতে পশ্চাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে নৈশ গগন ধ্বনিত করিয়া বহ্নিনির্বাণ করিতে ছুটিল। ষষ্ঠীচরণের নেতৃত্বে আশাবাহিনী হাটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জহর আলির আদেশে কনষ্টেবলগণ তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এই বাধা পাইয়া ছাত্রবৃন্দ ক্ষেপিয়া গেল, পুলিসের সহিত "বন্দেমাতরম্" হাঁকিয়া মারামারি জুড়িয়া দিল। ষষ্ঠী ব্যাপার বুঝিয়া বালকদের থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিবার পূর্বেই উভয় পক্ষেই রক্তপাত হইয়া গিয়াছে এবং সকলে পুলিস ও ক্রুদ্ধ দোকানীদের দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে গভীর রাত্রে বিলাতীপণ্য-ব্যবসায়ীর দোকানঘর জ্বালানো, দোকান লুঠ, মারপিট ইত্যাদি বহুতর অপরাধের নালিশ সহ ষষ্ঠীচরণ ও ছাত্রবৃন্দ জেলায় চালান হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচার, আসামীদের জামিন নামঞ্জুর করা হইয়াছে, আসামীরা হাজতে।

দয়াঠাকুরাণী পুত্রের বিপদের কথা শুনিলেন। তিনি নিজেই জেলায় গিয়া হাজতে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিলেন। ষষ্ঠীচরণ মাকে দেখিয়া ক্ষোভে রোষে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "মা, জহর এই কাজ করেছে।"

মা শান্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই! তার ওপর তুই রাগ করিস্‌নে। সে আমাদের ছেড়েছে বলে আমরা তাকে ছাড়তে পারিনে। তুই আপন কর্তব্য করেছিস, ফলের ভার ভগবানের উপর। যে পবিত্র বন্দেমাতরম্ নাম গ্রহণ করে তুই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিস, তাতে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য কর্‌তে পারিস, আমি আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ব। আর এক কাজ তোকে কর্‌তে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্মসমর্থন করতে হবে।"

ষষ্ঠীচরণ মার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কহিল, "আত্মসমর্থন কর্‌তে গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া তো উপায় দেখি না মা।"

মা অকম্প কণ্ঠে কহিলেন, "তবে তোর আত্মসমর্থনে কাজ নেই। কিন্তু নিরপরাধী বালকগুলির কি উপায় হবে?"

অমনি কতকগুলি কচি কোমলকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "মা, আমরাও তোমার কুপুত্র নই, আমরা একটুও ভয় পাইনে, আমরা কেউ কিছু বলব না; আদালত যা খুশি তাই করুক।"

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, "আশীর্বাদ করি, বাপসকল, এই হৃদয়বল লাঞ্ছনাতে দ্বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা করে ব্রত গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।"

৫

আজ ষষ্ঠীচরণের বিচার। এজ্‌লাস লোকারণ্য। উকিল যাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সকলের একই উত্তর, "বলব না।" আসামী পক্ষের উকিল বলিলেন, তাঁহার মক্কেলেরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না; সাফাই সাক্ষীও দিবেন না; আদালতের যাহা খুশি করিতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের কথা বিশ্বাস করিয়া এবং জহর আলি দারোগার কর্মপটুতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া ষষ্ঠীচরণের ছয় মাস ও পাঁচ জন বালকের দুই মাস করিয়া কারাদণ্ড বিধান করিলেন। অন্যান্য বালকেরা সনাক্ত করার গোলমালে ও প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইল।

জহর আলি যখন উৎফুল্ল হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া থানায় ফিরিল, তখন একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া থানায় লাগিল। গাড়োয়ান গিয়া সেলাম করিয়া দারোগা সাহেবকে জানাইল, একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। জহর আলির মনটা আজ প্রফুল্ল ছিল; তাহার উপর স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া গাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইল এবং গাড়োয়ান গাড়ীর মুখের পর্দা উঠাইয়া ধরিল।

জহর বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা!"

গাড়ী হইতে নামিয়া দয়াদেবী বলিলেন, "হাঁ বাবা জহর, তোর মা। আমি তোকে তোর মায়ের বুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।"

অকস্মাৎ এই স্নেহের আহ্বান জহরকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে মার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা, এলে যদি তবে আর কিছুদিন আগে এলে না কেন?"

মা পদানত সন্তপ্ত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া বলিলেন, "এর আগে এলে তোকে ফেরাতে পার্‌তাম না, জহর; — তুই মনে কর্‌তিস আমি বুঝি ষষ্ঠীকে বাঁচাবার কৌশল পেতেছি। আজ আমি পুত্রহারা, আজ তোকে ফির্‌তেই হবে, আজ তো আর তোর মার স্নেহের শরিক কেউ নেই।"

জহর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "মা, আমি ফির্‌ব, আবার তোমার ছেলে হব।"

মা পুত্রকে বুকে চাপিয়া বলিলেন, "জহর মানে রত্ন; এতদিন আমি মণিহারা হয়ে ছিলাম!"

জহর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি কি ভুলে গেলে যে আর এক জহরের মানে বিষ? আমি ঢের জ্বালিয়েছি। নিজে জ্বলেছি। কিন্তু আর না, এবার মা তোমার কোলে ফির্‌ব!"

জহর সেইদিনই পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। সাহেব তখন জহরকে ইন্‌স্পেক্টর করিবার সুপারিশ লিখিতেছিল। জহর সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র দিল। সাহেব পরম বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া জহরের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল কি এক প্রসন্ন দৃঢ়তা তাহার মুখে দীপ্তি পাইতেছে।

স্বদেশী ও বিলাতী

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'মিষ্টার' সেন সুমধুর শারদীয়া রজনীর দ্বিতীয় যামে স্বদেশের পুরাণো পুষ্করিণীটার পাড়ে সটান লম্বা হইয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ। বনবাদাড়-ভরা ভাঙ্গা পাড়ের অন্ধকারভাগে ঝিল্লীকুল বিষম চীৎকার করিতেছিল। দেশীয় শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিষ্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকালের জন্য দার্শনিক বিচার-পরায়ণতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল। গোটাকতক অন্ধকার ও গোটাকতক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধরিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। গোটাকতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটাকতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারি সারি দাঁড়াইয়া চন্দ্রকরে নৃত্য করিতে লাগিল।

মিষ্টার সেনের হৃদয় চিরকালই উদার। সম্মুখের ছবিগুলি তাঁহার পক্ষে একটু নূতন বোধ হইল। অতএব বিদেশীয় সিগারেটটার প্রথম ধূম একবার টানিয়াই অবশিষ্ট ভাগটা একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিলেন।

তখন বঙ্গের প্রথম পরিবর্ত্তনের সময়। বঙ্গনিশি প্রতি শিশিরকণায় শতাব্দীর দূষিত হৃদয়-রক্ত অন্ধকারে পরিবর্জ্জন করিতেছিল। অতি ব্যথা-পরিপূর্ণ, অতিশোকক্লিষ্ট বঙ্গনৈশবায়ু পুরাতন চঞ্চলতা রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ নিশীথিনীর সহিত ঘোর অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছিল।

বাগানের ও পারে প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে মিষ্টার সেন বাল্যসখা বিনোদের হাত ধরিয়া অনেক দিন পূর্ব্বে স্বদেশের হিতচিন্তা করিয়াছিলেন।

বিলাতী ভাবগুলি পশ্চাতে রাখিয়া এবং দেশীয় ভাবগুলির হাত ধরিয়া মিষ্টার সেন মাঠ ভাঙ্গিয়া বিনোদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মিষ্টার সেনের আলোক ও মিষ্টার সেনের ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সেই পুরাণো ভগ্নবাড়ী! সেই বহুকালের ভগ্ন মণ্ডপ! শ্রীহীন, শক্তিহীন, বাল্যস্মৃতির পরিত্যক্ত তীর্থ! এখানে, ওখানে, কোথাও জনমনুষ্য নাই; কোথাও দেবতাও নাই। কণ্টকাবৃত দুর্গম উঠানে পদচারণ করিতে করিতে মিষ্টার সেন ডাকিলেন, —

"বিনোদ আছ।"

একটি বৃদ্ধ লগুড়-হস্তে নিকটস্থ বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বৃদ্ধ উমাচরণবাবুকে চিনিলেন। উমাচরণ গুপ্ত বিনোদের পিতা।

বৃদ্ধ বলিল, "কে তুমি বাবা?"

মিঃ সেন। আমি অপূর্ব্ব। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। বিনোদ কি এখানে নাই?

"না বাবা, সে কোথায়ও নাই, বিনোদ যে সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছে—"

মানব-হৃদয়ের গভীর স্তরে শোক-নামক একটা পদার্থের মহিমা আছে। সেটা স্বদেশী। শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতার করুণ স্বর অপূর্ব্বকৃষ্ণের হৃদয়কে টানিয়া বৃদ্ধের সম্মুখীন করিল।

ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে অনেকক্ষণ বসিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বাল্যসখা বিনোদের শেষ ইতিহাস শুনিলেন। শারদীয়া রজনী কাটিয়া গেল।

২

বিনোদের শেষ ইতিহাস ক্ষুদ্র। প্রায় ছয় মাস বিনোদ মিঃ সেনকে পত্র লেখে নাই। এম্. এ. পাশ করিয়া বিনোদ কলিকাতার একটি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াছিল।

বিনোদ তিন মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল।

অপূর্ব্বের হৃদয়ের বন্ধু-সম্মিলনের মহান্ উৎসাহ বন্ধুবিয়োগের কঠোর কুঠারাঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। মিঃ সেন ভাবিলেন, "দেশে থাকিয়া কি হইবে? আবার বিলাতে যাই।"

ভাবিতে ভাবিতে মিষ্টার সেন বাটীতে গিয়া ধুতিচাদর পরিধান করিলেন। বিনোদ স্বদেশভক্ত ছিল; স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। স্বদেশের হিতে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া বিনোদ জ্বরাক্রান্ত হয়। সেই জ্বরই তাহার শেষ।

বেলা পাঁচটার সময় পোর্টম্যান্টো প্রভৃতি টানিয়া বাঁধিয়া গুছাইয়া মিষ্টার সেন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। মিষ্টার সেনের কলিকাতার বাটীতে তাঁহার জননী থাকিতেন। সংসারে আর কেহ ছিল না।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিলেন, "মা! তোমাকে দেখিতে দেশের বাটীতে গিয়াছিলাম।" জননী বলিলেন, "বাবা! আমি কি জানিতাম, দেশের বাটীর এত ভাগ্য হইবে? তাই আমি কলিকাতায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

মিষ্টার সেনের ধুতিচাদর ও প্রণামের বন্দোবস্ত দেখিয়া জননীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ স্বদেশী প্রস্রবণে উছলিয়া উঠিল। জননী পুত্রকে কোলে লইলেন।

অপূর্ব্ব ভাবিল, "যদি এ সময়ে বিনোদ থাকিত!"

৩

কাঁসারিপাড়ার রামহরি গুপ্ত স্বদেশী আন্দোলনে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার অজীর্ণ হইল। "এ দেশটা কি পাগল? বিলাতী মদের কাছে কি স্বদেশী মদ? কি দুর্গন্ধ!"

পাড়ার দুষ্ট বালকগণ গুপ্তজার ভৃত্য নিধিরামকে শাসন করিয়াছিল, "দ্যাখ্ ব্যাটা! যদি তোর বাবুর জন্য বিলাতী লইয়া যাস্, তবে মাথা ফাটাইয়া দিব।" এই সুশাসনের গুণে নিধিরাম এক টাকা দরের রসা-ডিষ্টিলারির মাল লইয়া যাইত।

চতুর্দ্দিকে ঘোর বিপ্লব দেখিয়া রামহরি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। "ছোঁড়াদের জ্বালায় কি একটু স্ফূর্ত্তি করিবার যো নাই?"

মানসিক ও নৈতিক অবসাদের চরম অবস্থাপন্ন রামহরি গুপ্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং ইতস্ততঃ তাকাইয়া মধ্যে মধ্যে হরি-নামটাও করিলেন।

ইতিমধ্যে মিষ্টার সেন উপস্থিত। কি আহ্লাদ! কি অভাবনীয় সাক্ষাৎ! "সেন! তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ! সেন! স্বদেশী তরঙ্গে প্রাণটা যায়,—রক্ষা কর লাউসেন!"

মিঃ সেন। আমার নাম অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন।

রাম্‌হরি। বাবা, অবস্থাবিশেষে এখন তুমি লাউসেন। তোমার নেক্‌টাই-টা কোথায়?

মিঃ সেন। দেশী নেকটাই যন্ত্রস্থ।

ওঃ! সময়ের কি গুণ? রামহরি ডাকিলেন, "অনিলা, এ দিকে আয়,— অপূর্ব্বের অবস্থা দেখে যা—বিলেত-ফেরত অপূর্ব্ব alial লাউসেন—for the present".

হাসিতে হাসিতে অনিলা আসিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে মিষ্টার সেন অনিলার সহিত একটু বিলাতী ধরণের কোর্টশিপ করিয়াছিলেন। সেটা কিন্তু বিশেষ রকমের গভীর নহে; অর্থাৎ, উভয়ের মধ্যে কাহারও বিরহের ভাব হয় নাই, এবং মতিগতির কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

অনিলা অনেকটা বিলাতি। চক্ষু কটা; কিন্তু কটার মধ্যেও স্বদেশী বেগুনের মত একটু মাধুর্য্য ছিল। অনিলা আনন্দময়ী। অনিলা পিতার শিক্ষায় গা ঢালিয়া দিয়া বিলাতী ভাবে ও বিলাতী উপাদানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনিলার পশ্চাতে যে একটা স্বদেশী ভাব ছিল, সেটা কেহই জানিত না। কাজেই মিষ্টার সেনের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনটা অনিলার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। অনিলা বড় সুখী হইল।

অপূর্ব্ব! মিস্ গুপ্ত! — আজ আপনাকে আবার স্বদেশে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।

অনিলা। আমিও আপনাকে অনেকটা পরিবর্ত্তিত দেখিয়া সুখী হইলাম।

অপূর্ব্ব। কেন?

অনিলা। আপনি শেক্‌হ্যাণ্ড করেন নাই।

অপূর্ব্ব। ওটা কি বিরক্তিজনক?

অনিলা। বোধ হয়।

অপূর্ব্ব ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

৪

অনিলা বুঝিতে পারিল, এবং অপূর্ব্বের হাত ধরিয়া দ্বিতলে লইয়া গেল।

অনিলা পূর্ব্বে চঞ্চলভাবে হাসিত, এখন স্থিরভাবে হাসিল। "আপনাকে গোটাকতক নূতন জিনিস দেখাইব।"

অনিলার সুন্দর ঘরে আর সে বিলাতী ছবি নাই। কেমন সুন্দর তূলিকারঞ্জিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি! সে অনিলা টানিয়াছে। আর অনিলা বলিল, এই দেখুন।"

তখন বড় বড় তোরঙ্গ খুলিয়া অনিলা রাশীকৃত মাথার ফিতা, রেশমের গলাবন্ধ, মসলিনের লেস বাহির করিয়া একে একে মিষ্টার সেনকে দেখাইল।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। "অনিলা! এগুলি তুমি বুনিয়াছ?"

অনিলা। না। এগুলি যাঁহার কারিকুরি, তিনি দেবী। তিনি চিরবিষাদিনী। আপনার বাল্যসখার বিনোদ বাবুর বিধবা স্ত্রী শান্তি।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ একটি রেশমের রুমাল বাছিয়া লইলেন। তাঁহার বিশাল নয়নে শোকাশ্রু সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উছলিয়া পড়িল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ গবাক্ষ-পার্শ্বে গিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিলেন।

স্বদেশী হৃদয় দুর্ব্বল। তাই কি কেবল কাঁদিতে জানে?

৫

?? ষোড়শী শান্তি সেই ঘরের এক কোণে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলা, মগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনিলা সুন্দরী, কিন্তু শান্তির সৌন্দর্য্য স্বর্গের।

শান্তি মুগ্ধা; কেন না, অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেখিতে ঠিক বিনোদের মত। বাল্যকালে উভয়কে যমজ সহোদরের মত দেখাইত। শান্তি মুগ্ধা, কেন না, অপূর্ব্ব বিনোদের প্রাণের সখা। বিনোদ মরিবার সময় বলিয়াছিল, "শান্তি, যদি সংসারে কখনও সহায়হীনা হও, যদি কখনও হৃদয়ে বল না পাও, তবে অপূর্ব্বের সাহায্য লইও। তাহাকে লজ্জা করিও না। সে ও আমি এক।"

কিন্তু শান্তি বিধবা। শান্তির শক্তি থাকিয়াও নাই। হৃদয়ের যে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিনোদ চলিয়া গিয়াছিল, সে মায়া আবার জাগরূক হইলেও শান্তি অপূর্ব্বকৃষ্ণের শোকের গণ্ডীর মধ্যে যাইতে পারিল না।

শান্তি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব গবাক্ষ হইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"অনিলা! তিনি কোথায়?"

অনিলা। কে?

অপূর্ব্ব। বিনোদের শান্তি?

অনিলা শান্তির নিকট গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। অনিলা বলিল, "এই সেই শান্তি। আপনি একবার ও বাড়ীতে গিয়া শান্তির দাদাকে ডাকিয়া দিন।"

৬

বিনোদের শ্বশুরালয় অনিলার বাটীর পার্শ্বে। বিনোদের শ্বশুরের সহিত অনিলার পিতার কোনও দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতির একটু সম্বন্ধ ছিল। বিনোদের শ্বশুর বড়মানুষ। শান্তি বড় আদরের মেয়ে।

শান্তির দাদা নরেন্দ্র রামহরিবাবুকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। নরেন্দ্র বিনোদের চেলা! নরেন্দ্র স্বদেশপ্রিয়। নরেন্দ্র ভাবিত, "আমিও বিনোদের পথে যাইব, কিন্তু আমি এ জন্মে বিবাহ করিব না।"

বিধবা ভগ্নীর মুখ দেখিয়া নরেন্দ্রর হৃদয় ভগ্ন হইয়াছিল।

অপূর্ব্বকে দেখিয়া নরেন্দ্র আহ্লাদে আলিঙ্গন করিল। নরেন্দ্র বলিল "মিষ্টার সেন! তুমি আমাদের বিনোদের প্রাণের সখা। তুমি বিনোদের পবিত্র স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বিলাতীটুকু একেবারে ছাড়িয়া দাও।"

অপূর্ব্ব। কি করিতে হইবে?

নরেন্দ্র। বিলাতীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইবে, এবং স্বদেশী কুশাগ্র পর্য্যন্ত ধরিবে।

অপূর্ব্ব। বেশ ভাই, তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।

নরেন্দ্র। সেটা স্বদেশী না বিলাতী?

অপূর্ব্ব। বিলাতী!

তখন অপূর্ব্ব নরেন্দ্রের কানে কানে একটি কথা বলিল। তাহার পর উভয়ে কি ভাবিল, এবং উভয়ে চক্ষুর জল মুছিল।

৭

নরেন্দ্র অনিলার বাটীতে গিয়া শান্তিকে লইয়া আসিল। শান্তির সহিত অনিলা আসিল। অনিলা নরেন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জা করে; আগে করিত না; এখন করিতেছে।

নরেন্দ্র বলিল, "শান্তি! অনিলার মাথায় ওটা কি?"

শান্তি। "বিলাতী পুঁটুলি।"

এটা অনিলার পূর্ব্বেকার বিলাতী সাজসজ্জা। অনিলা বাহিরে আসিয়া মিষ্টার সেনকে বলিল, "আপনার বিলাতী সাজগুলা আমাকে দিন।"

তখন অপূর্ব্বের পোষাক ও অনিলার সরঞ্জাম একত্রিত হইয়া স্তূপাকার হইয়া পড়িল। চতুরা অনিলা তাহাতে একটা দীপশলাকা জ্বালিয়া দিল।

বিলাতী ও দেশী ভাব তুমুল সংগ্রামপূর্ব্বক ধূম আশ্রয় করিল। অনিলা হাসিল। সে হাসি নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিল।

নরেন্দ্র অপূর্ব্বকে ডাকিয়া বলিল, "সেন! তোমার পরামর্শ মন্দ নয়। আমার বোধ হয়, দেশী ও বিলাতী মিশিয়া যাহা হইয়াছে, তাহার নাম স্বদেশী।"

৮

বাস্তবিক তাহাই। কেন না, বিধবার বিবাহটাই স্বদেশী হইলেও কেমন কেমন বিলাতী ধরণের। যাহাই হউক, মিষ্টার সেন শান্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া সজল-নয়নে কর চাহিলেন।

শান্তি কাঁদিল। কোনও কথা কহিল না। পরে শান্তি বলিল, "আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই, কেহই নাই। আমাকে ও কথা বলিবেন না। আমি বিধবা। আমি অনাথা।"

কিন্তু শান্তির আর্ত্তস্বরের মধ্যেও যেন একটা সংসারের গুঞ্জন ছিল। সেটা মায়া। তাহাই বন্ধনের মূল।

* * *

অনিলার কটা চক্ষু বিলাতী হইলেও নরেন্দ্রের পক্ষে মন্দ নয়। বোধ হয়, আরও একটু কজ্জল আবশ্যক।

(সাহিত্য, পৌষ ১৩১৪)

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলনের

উপন্যাস



বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে শিল্পীদের ভূমিকা এই পত্রিকাতেই দেখা গিয়েছিল

ঘরে-বাইরে

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

[১৩২২ সালে সবুজপত্র-এ প্রকাশের পর ১৯১৬ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত বহু অংশ বর্জিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত পরিবর্ধিত সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণে বর্জিত অংশের সমস্তই পুনরায় গৃহীত হয়। বর্তমান সংস্করণ সেই সংস্করণের অনুসারী।]

বিমলার আত্মকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শ্যামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়— আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাতে দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি,তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিন্তু কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় নাহয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন,

ও কি বিমল,করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়— সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগলপাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এই জন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম— মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলোর 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চীনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো— পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়— নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে— প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা— আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না— দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে

পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে, তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্বণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা!

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম— এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফ্যাশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন— সেই-সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বার বার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে— দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি নায্য কি অনায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত তখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি,আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বার বার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করে তা হলে তিনি— সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন,আইন কিংবা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে।— সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের

রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐরকম দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না। — যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন— সে আমার অপরাধ— কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না— মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই— একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও তোএকদিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, নাহয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি— কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারো উপরেও না, সে কেবল— সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন— তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল— মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই যে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়— ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না— এই বলে আমি তাঁকে ও-মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি।এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছে ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে— আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে— তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সইতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সইতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন?

এ কথা নানা রকম আকারে বার বার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না— সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙ্গায় বসে অপেক্ষা করে— তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন; তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, তাকে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দের রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরেজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে— এই কথাই বার বার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব।

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি— আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে,একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না! আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে— সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার— না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রির সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র— কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠত,শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবছিস? আমার বয়সে আমি তিনবার ও সম্পত্তি রিসিভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী,ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট্ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগতো সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুযে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন,স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে— নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি— আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল,নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি না হয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি— ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবনাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ— এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক্‌-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জায় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোন ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গা! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্‌বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভিতরটা গুর গুর করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্। আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি নে কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া— চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ— এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে— কিন্তু থাক।

কিন্তু, সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না— বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের

ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন— তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিতছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেক বার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন, আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে বলব, যদি কোনোরকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারও মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কি সাজ দেখলে?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত-ছেড়েছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন— মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম,আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল। নিজেকে হাজার বার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম!

কোনোরকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পর অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরম বন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তাই বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়েএসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন?

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠীতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল যে, আর-এক জনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর-একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে— খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি?

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্‌ফ্ যে একেবারে—

ওগুলো কী জান? প্যুনিটিভ পুলিসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়— আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে— কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলংকার মাত্রই যে অত্যুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছপালা-পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে— মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে? তিনি ফিস্ ফিস্ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল,তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি, মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরার কল্পনা করেছিলুম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেছি আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষ্যটুকু ছাড়তেন না।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই— এতোবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক— মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রবেশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ- বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্য চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসি জর্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও তাই করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না— ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না,আমি বলছি,তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব— যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠলেন, হুরা! হুরা! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে— সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর— পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে
ফিরুক সঞ্চরি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন— কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে

তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল!

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিংবা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন— কিংবা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনোদিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কী? এ কী? কী হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসে ছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ী টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল ব'লে সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে— যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই নটা বছর

মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতে অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে। — ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

জোর করে অহংকার করে কী করব? না হয় মাথা হেঁট করেই বললুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়— কিন্তু এ সমস্ত তর্ক করা কেন। ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য,অযোগ্য, অযোগ্য! না হয় তাই হল— কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্য তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে— সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছে ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে? না,তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন ক'রে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়; অন্য-সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারি নে, কারও উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু-একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়।

আমি জানি আমার এই সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে; আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠছে যখন দেখছে আমি 'বন্দে মাতরম্' হেঁকে চারি দিকে যা-ইচ্ছে তাই করে বেড়াই নে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবছে ভিতরে আমার কু মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ ব'লেই জেনে, মানুষকে মানুষ ব'লেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা বলে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়েযাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয়-কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বললে, তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই, সেইজন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্তিকে তুমি সত্য করে দেখতে পার না। দেখলুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেননা, এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয়; সেইজন্যে সেটুকুতে মিলন-গানে তাল কেটে যায় না। বড়ো সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়ো; সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেল বাতি থাকতে পারে, কেবল শিখার অভাব! আমি তো বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চকমকি পাথরের মতো আলোকহীন; তাই এত ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরোয়— সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহংকার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারী। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝি নি তাই নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনোরকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়,কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে— হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন— তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না, কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চার দিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বললে, দু রকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিংবা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিংবা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যেভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্‌, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষ মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা করবেন না; মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী; আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-একদিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও; তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্‌।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নেতা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর-জবরদস্তি? কিসের জন্যে! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতি মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা এক দল লোক আছে— নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ংবরের মালা পড়তে চায় না। নহবৎখানায় রোশনচৌকি বাজছে— লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল? আসমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল নাকি? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চী চী গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখতে চাও; সুতরাং আমি যা চাই তা

আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল ক'র, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এত চীৎকারে সে-সব কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়। তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল; আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

এক দলমানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব; ওবে নির্জীব বললেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি; কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্ দিকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।

আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো— তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয়। তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ,ও এইরকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক্— আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি—আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই, তা এতে আমাদের বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চলছে তারা এই নিয়মেই চলছে, অথচ বলছে অন্যরকম কথা। এইজন্যে তারা জানে না এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয়, জীবনে তারএকটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মতো ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়— সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ-ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা— চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে, এই দুর্দম ইচ্ছাই হচ্ছে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর-কাউকে মানতে চায় না বলেই চার দিকে জয়ী হচ্ছে। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর-কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আসমানের দিকেই নিয়ে যাক; দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কতদূর ওঠে আর কতদিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

'অ্যাফিনিটি!' জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এইজন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন। অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতিরে আর-সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ।

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার একটুও সময় পাই নি— আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে ঘূর্ণার মতো ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায় নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজো জা হাসতে হাসতে আমার স্বামীকে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বল ভাই ছোটোরানী? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে-সজ্জায় ভাবে–গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল, তার লেশমাত্র মেজো জায়ের চোখ এড়াতে পারেনি। আজ আমার এ কথা লিখতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা, সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে-সুঝে করি নি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভালো লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সামনে আমার স্বামীকে একদিন বললেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষীরানীকে আমি প্রথম দেখলুম— সেই জরির-পাড় দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখদুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে— যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এইরকম করে তাকিয়ে— তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল— মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই তো চাই, এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষীরানী,আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আর-একদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী— তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা— কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল— আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর জন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নূতন করে সৃষ্টি করলেন? তার এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন, তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে বললেন, মউচাকের মক্ষীরানী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড়ো জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজো জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে; সে এমন-একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করি নি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই-যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল এ জিনিসটা কী, সে নিয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না; এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়; এ যেন আমার বাইরেকার,এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোটো বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সংকোচ বোধ হত, কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বলতুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলই বলতেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গড়েছেন। শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাই নি।

দেশের চারি দিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আসত, সে সমস্তই আমি পড়তুম এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক-এক দিন সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দু দিন পরে সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আরো দেখতে পেতেন এবং তখনই আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে,অথচ কাজ কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উলটোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই-সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব; তাদের হৃদয়াবেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে তখন অন্য দিকে তাদের

আর-কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো; কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচরজাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনই জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগাল যে আর -কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী শেল্‌ফ্‌ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে , তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন!

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বললুম,আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু, যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে; যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শামলা, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শামলা— কী তেজ আর কী ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও।

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না, নিষেধ যখন আছে আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিতস্বরে বললে, না,আপনি যাবেন না, ঘরে আসুন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্‌সিল দিয়ে কী লিখে বেহারাকে ডেকে বললে,বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি,দরোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই, ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম; ভাবলুম সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই?

মক্ষী বললে,তা কেমন করে বলব!

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হুজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষী বললে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খটকা লাগল। ওর খটকার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে তো নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে— দরোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে তা তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়— নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায়এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে; কোনোরকম প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমন করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায় জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছনো— সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা!

সত্য নয় তো কী! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে! যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফরমাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বল, বিশ্বাস বল, কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্‌কার, কত হাহাকার, কত শাসন! কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায়? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়— সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা! তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি! আর, এই ছলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা, বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়া- আবরণ পরে বেড়াতে হয়। যে-রকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়— যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পচ্ছি। ঐ-যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে; ঐ-যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে! ঐ-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু,রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কাল বৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা! ঐ যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ-যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ,মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়; এইজন্যে তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না।,মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর-কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতেই ছাড়ব না— মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডবনৃত্য— তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে, সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ করি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল সেই চেয়ে-থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না,আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না, আমি কিচ্ছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়েছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর-একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের; কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গ লতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না, আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি, তা হলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললে, কেন?

আমি বললুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে— যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষী বললেন, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে; কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল; তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয়?

আমি মনে মনে হাসলুম— ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্ টস্ করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে— এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত ক'রে কাহিল ক'রে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে। আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ ক'রে ক'রে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখে পড়ে দিচ্ছি। বাইরেই পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ— তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়েজাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পুজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না; সে বললে, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে; তারা জানে পুরুষজাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে। সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না; পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন?

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না; আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু না। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক; জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ; কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে,আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে, সেইজন্যেই পুরুষ পুজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এই-সব মাস্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চলল; সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুলমাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির।

আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষী, তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েন্টস্‌ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ধরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন— 'মাপ করবেন, আমি'— কথাটা শেষ করতে না-করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে-আর বললে, মাস্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিংবা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে,তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি। — তাই করো-না। মাস্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টারমশায় নই, আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি, ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না— আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো; তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনো দিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না; আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি,মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন; বললেন, তবে আপনারা কী চান?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টারমশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব; তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন না-হয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে,যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্‌ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্‌ফট্ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছট্‌ফট্‌ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যেই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয়, আর এই ইস্কুলমাস্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ ক'রে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে। এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে; তাই আমি বলছিলুম, এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয়?

নিখিল বললে,এইরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, তার অর্থটা কী?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে, আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাসপোস্ট যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম, দেখো নিখিল,ধর্মনীতির সোনাবাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখ, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল-মাস্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কিনা। কিন্তু বেশি করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে, সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে; এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়ো জোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না।

তোমরা আমাকে বল আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র; আমি নই, সে তোমরা— মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

একি তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে, বুঝেসুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল আর মক্ষীরানী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেয় না কেন? আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কী করে। বিমল যদি ওকে বলে 'তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি' তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে,তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, এ কথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ওরকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি; ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষী, বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে, একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর,আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে, তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি— রাগ বল, ভয় বল, লজ্জা বল, ঘৃণা বল, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, ঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে— আমরা যেমন করে আপিস করি— কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ন নয়। 'মডার্ন' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরাগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরেবেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে!

এই টেবিলের উপরকার ফটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই খুলে তার পাতা ওলটাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের; তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইইকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই— ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল, আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর, সব জিনিসকে বড়ো বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর-কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত না চোখে ঘুম থাকত?

কেবল নিজেকেই সেই-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর,তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্-না। সেখানে যুগযুগান্তরের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে।

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায় 'না, আমি আমিই' তখনি আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি! ওটা কি একটা সত্য! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি, একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত

বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেইসঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আমার গাম্ভীর্য! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল? ও-সব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে! তা যাক। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন-কি তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে; এইজন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে— সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে; সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমার মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পূজা করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি লোভী; আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই; তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফরমাশ খাটছেন না কি?

তা হলে আজ একবার সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে; মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ংবরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন, আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব; আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ করা রোগা আমি নয়; সে বিধাতার শক্ত হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন,নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন?

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করছি এমন সময়ে আমার জানালার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে; কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি; আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম— কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সর ভিতর ভরে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে! লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে— কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না— সে সত্য, সে সত্য— এইজন্যে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব; ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না, না,ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখি আসি আমার বিমলকে, সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটা চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব, সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে— কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও— তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ংকর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিন রাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

আর, কৌতূহলের অন্ত নেই— যে মানুষকে ভালো করে জানি নে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য— কী প্রচণ্ড, কী বিপুল! এ তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহু দূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেছি মাত্র, এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি,জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন-কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং বীণাটাকে— কিন্তু, বীণা তো বাজল! আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা-কিছু আছে যেটা— কী বলব? যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাস্টারমশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে, তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই— বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু, কী হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি নে। আমার ননদ মুনুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত,তার পরে মেরে অনুতাপে হাউ মাউ করে কাঁদত, শপথ করে বলত 'আর কখনও মদ ছোঁব না', আবার তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত— দেখে আমার সর্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে

ভয়ানক— এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না— রক্তের ভিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে। কী করি! এমনি করেই কি জীবন কাটবে?

এক-একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন, এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়া-জাদুকরের মতো কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর মতো রঙে রঙে রঙিন করে তুলেছে। এ যে কী হল, কেমন করে হল কিছুই বুঝতে পারছি নে।

একদিন আমার মেজো জা এসে হেসে বললেন, আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে। অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না; তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল টিকতে পারত— এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রাক্ষুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিরি কিরকম হয়ে গেছে!

এ-সব কথা একদিন আমার মনে লাগতই না, তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারি দিকে এতটা ভাবের আবরু ছিল; তখন ভেবেছিলুম, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমার লজ্জা-শরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা, মডার্ন কালের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি; সেই-সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাই নি; আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইল না। কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বললুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না, মরে গেলেও না।

দু দিন বাইরে গেলুম না। সেই দু দিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে, যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল, তবু নিজে দাঁড়িয়ে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারির ভিতর জিনিসপত্র এক ভাবে সাজানো ছিল, সে-সমস্ত বের করে ঝেড়ে-ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলো চুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে; তা নিয়ে কাউকে বকতে সাহস হল না, পাছে এ কথা কেউ মনে মনেও জবাব করে 'এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা'।

সেদিন ভূতে পাওয়ার মতো এইরকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জানলার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ওপারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি তো

চেয়েই আছি। নিজেকে মনে হল আমি যেন পরশুদিনকার আমির ভূতের মতো, সেই-সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম— সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগল যেন উঠোনটার উপর,বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে রেগে উঠছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যদি পারতেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে।

ওলো, অবাক করলি যে! — এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা, ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানি চিঠি আমার হাতে দিয়েবললে, সন্দীপবাবু দিলেন। — সাহসের আর অন্ত নেই! বেহারাটা কী মনে করলে! বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল— চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে, 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।'

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানাঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই।

বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে; সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাব, আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট্ সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি,অহংকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। একদিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে— সে যেন দামি হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই!

তাই একবার মুহূর্তকালের জন্যে ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই, এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, এই-যে আপনি এসেছেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই!

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়েছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কী কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী?

আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, তার তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে? আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেছি তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে কথা কি আপনাকে বলি নি? ভূগোল বিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়; শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন,তবেই তো জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি; তবেই তো সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোল বিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল— কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল। সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব! এই-সব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে—

তার অনেক কায়দা-কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেছে।

এর পর আমার কিছু বলার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল এখনি সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি, সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে! যতদিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধনির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সে অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল, সেই দীপ্তিই লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনই কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না! আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন যা মন্ত্রের মতো এখনি সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়!

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও,আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন— হাউ হাউ হাউ হাউ!

কী? ব্যাপারটা কী?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে; তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি, 'আচ্ছা, সে আমি বিচার করব' কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনই অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে একমনে মাথা নিচু করে সুপুরি কাটছেন, মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করছেন 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে'— ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সকালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসরটি মাটি ক'রে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে, একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত— লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে! তা ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকালবেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া,আমার চিরকালের

অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময়ে বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টলমলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো,আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না— সেইজন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে— তা এতে যে ছোটোরানীর অপমান হবে এ কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে পূজার দিক থেকে যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ-যে মেজোরানী নিশ্চিন্তমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজেরধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব— না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কী করে!

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়েপা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক হয়ে আছে। এম. এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামি এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক-টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ ক-টি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি, আশা আছে আবার আর-একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে, অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি, আশ্চর্য এই যে সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলগা হল না— তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছ-দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা। তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে; তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছ।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার রাগ হয়।

তিনি বললেন, রাগ আমার উপরে করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ংম্বরসভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ংবরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ংবরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে কর আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়পোঁছ করবার উপলক্ষে সেই ফটোস্ট্যান্ডখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পুজো করি নে, তাকে প্রণাম করা চলে না; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর মধ্যে ঢাকা, সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বার বার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'— সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা 'আমরা চাই'। 'আমি চাই' এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী; সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আগুন হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত; মানুষকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে— হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর; আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না; পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে; তখন এতদিনের বোবা শক্তি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গর্জন করতে করতে ছুটবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি— আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে, এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনই ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল , কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল— মেজের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে , আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে, সেই বাষ্পে সে ঘেরা; তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ- মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে এইজন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট। যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না; মনে হয় সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকে আঁকছি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি ,যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে , যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে; আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নে, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি , যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে উঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বল, জাত বল এ পর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে, নইলে ১ এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ , অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনি দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনি কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া , এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে — সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে; কিন্তু যেখানে আমি -- নিজের দোষে না, ভাগ্যদোষে -- দুর্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না; এইজন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ-জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই; সেই

জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রকফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিংবা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ফেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাৎ ঝাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখছ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বললে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, সেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায়; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটেই হল আমার মুশকিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি— ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই— তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একেসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে।

সেই কথাই তো বলছিলুম, যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়, ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে, সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি! ওর যত রস যত মাধুর্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই; সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে; আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে,তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না— শুধু আমিই জানি; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে. কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না,তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করছি কী? দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে? ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি; ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরের মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই— এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি. এ. পাস করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজেরহাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো; সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম, আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। 'আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব'— এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছটফট করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত— ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি দুবার তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না, সেও বুঝতে পারছিল এখনই একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে যাবে— সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি, এই সময়টুকুর মধ্যে একটা-কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি, নিঃসংকোচে বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত! এই রকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের একতলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি,তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করেগল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে— এমন-কি, যা কখনো করি নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয়না— এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখা না হলেই বাঁচি। এই সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি-না কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি; আমার অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ংবরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে— সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা— সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম— সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারি দিক টলমল করছে; কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিল্‌মিল্ করছে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠছে— এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে

পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে— কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহ'র বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপর যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতছে— সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়— তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দু বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে; তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে, সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল; বিমলের মনে পড়েছে কি না জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও— দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।

আমার মনে হচ্ছে যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-শরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটি ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কী করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলুম তার রঙ এত লাল নয়, কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্ গুন্ করে মরছি—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এতো বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেলফ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা,মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের শিশি, সেইসঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো— একদিন যখম বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম , যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পুজো কর, আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পুজো করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও, তুমি অমন করে বোলো না, তা হলে কক্‌খনো ও জুতো পরব না। — এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর। এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ, এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তারএই নীরস কালো মূর্তিতেই গ্রহণ করলুম— কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়ৎটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল— কিছু দেখতে বা শুনতে. বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না— যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল, ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটা কতেক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু? এ কেন?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপর সে গরিবের একশেষ, ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন দিতে যাচ্ছি তখন ও জোড়হাত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্ দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

অ্যামিয়েল্‌স্ জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো ছোটো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটাতে যায়, সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে— তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলা দেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে,তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ-ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যেই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি, বিমলকে জায়গা দিতে হবে ব'লে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি পরিয়েছি শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি; মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টারমশায়; তিনিই আমাকে যতটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে, আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টারমশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লাল দিঘি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম, নাহয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম. এ. পাস করে চাকুরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনি আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না— তাকে এতবড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্ট্রেন্স স্কুলের হেড্‌মাস্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না। এই কিছু দিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগোরাটা দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনি মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোকলোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন—

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন রাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। যাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল— কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না— সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল; বললে; এই-যে আমি!

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম— অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল : অয়মহং ভোঃ!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেইজন্যে মনে হল, আমাদের সব দুঃখ তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এই হল বলে হল বলে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না, তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়— আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি অবিশ্বাস করছ?

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এইরকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রোশনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না।

বলে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হাল্কা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা; নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়? রাজি আছি,তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরান পূরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিকতে পারব না, আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে,
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন। সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্য দেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর গুর করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল ব'লে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দেমাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'— কোন্ অজানাকে,অপূর্বকে কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি, এই সুপ্ত রাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি, যেন পৌঁচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই। না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই।

আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আজ আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে; আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে; তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পুরো ইস্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এ দিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারও উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তাঁর চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ থাকে না।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর-কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন?

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তার একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো,শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি— আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস

হয়ে গেছে। অনেকদিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না সাজিমাটির ডেলা? আমি বুঝি জানি নে? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলেছে, একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়-কাচা চলতে লাগল।

আর-একদিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে তো আমার চাই। মাথা খাও, আমাকে এক বাণ্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজোরানীর ঘরে বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরানো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালেভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে, সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কাণ্ড! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কী? কত খুশি হয় বল্ দেখি। ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর তো কোনো নেশা নেই— এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই— এইখেনেই ও মজবে!

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো। মেয়েমানুষ অত সোজা নয়— সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না নয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্য গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাটবাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে; এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জরবদস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করেই বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিনী! তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন; তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-একদিন গান ধরতেন—

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি— নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে— আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে— ঐ আমার ভক্তকে— ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতি ক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। একদণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে? একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক-রকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন; তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার ঊর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল-তোলা ঘাড়ের উপর— হায় রে, সে কথা আর কেন।

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বলল, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে, এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী! ডাক্তার-খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিনে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে। মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে?

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করল। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না; সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা,তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি', সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না— কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কী পাপ করেছিলুম?

এ দিকে যে ব্যবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ যে মাস্টারমশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষকালে মাস্টারমশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘরদুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী! মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা যায়।

হ্যান্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি; ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় আনিয়ে চাষিদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু বা ধান, কিছু বা পাট কিছু বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দু মাসের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এইরকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিল। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টারমশায় ছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে—

মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন।

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন দিশি চিনি দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে— ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না— ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত— আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব,তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আপনার হাটে রাখিয়েছি; এমন-কি, অন্য এলেকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়,আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়,যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স্ ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম ব্যবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয়তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে— আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব'লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।

মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওর অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি। ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে— লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল,তার পরে একশো টাকা জরিমানা। — এরাই সন্দীপের পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল,বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষী দেবে না।

কেউ সাক্ষী দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষী দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না,তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষী বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষী দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে, তোমাদের সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিকবে।

মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে, এ কথা যে লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টারমশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম করে সাধন করেছে তারা ব্যাবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তার রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন ক'রে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য— আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টারমশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললে, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা; কাঁটাগাছ, তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টারমশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল? সন্দীপ অধার্মিক নয়,ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি। আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন-কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।

আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি 'প্যারাডাইস লস্ট্‌' -এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

মাস্টারমশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায়?

আমি বললুম, আপনি বলেছিলেন, যে বিঘে-কয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাঁচিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করছে। ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয়।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিসের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টর পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমিই মরব।

কেন, তোর কী করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে-সুদ্ধু নিয়ে পুড়ব।

মাস্টারমশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে, তুই ভয় করিস নে; তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর্‌, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেষ্ট্রি করে আমি দখল করে বসলুম। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চলল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিল না এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি,তার প্যাঁট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চু ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতীনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়; কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা

এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারও কারও জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে?

বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটোরানী? মনে হল একশো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম। শোবার ঘরে গিয়ে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম, যখন দেখা গেল সর্বাঙ্গে, বেশি নয়,অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত, যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো-না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কী কথা। ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবনপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপমালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে রকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাৎ করে দেখি নি।

আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই-সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন এক দল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে, বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে,আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করছে— আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজে অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপর এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তোলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্‌বুদ্‌ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতুবি হয়ে পড়ে রয়েছে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী। আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই— তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যার-ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার জয় হবে; আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম— যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবারএক-একদিন টন্‌টন্‌ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবারে চিনে নিয়েছি; তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার— তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও— কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতো দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলাপথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক! আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। বুঝলুম নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই, কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করেছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুল-মাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল; কিন্তু ঐ অস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে,এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম,বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী?

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা

করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্ করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনই ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম ব্যোম!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছে থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।

একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলেছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরি শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায়? আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধা-ভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন ব্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনও তাই করবে। তাদের তাতে শখ মিটবে না তা জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে

জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কি না। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না? আমি বললুম, দায়টাকে কারও ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজনের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, হুজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হুজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে 'পারব না'?

আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দিবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং! 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর ভাঙবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং!

বন্দেমাতরং!

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা,আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষদের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে,সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, আর শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম,পুরুষজাত এইজন্যেই তো সকর্মক, আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল,তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্‌রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন-কি, পনেরো আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনই একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকা ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে; লোকটা পুরানো দাগী, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছে থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝেছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন; নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি, কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক, টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনই যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হবে। আজকের দিনেরপাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যতকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্যকালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্‌গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানেরউপর দিয়ে চলেছে তখন সেটা তর্কে এসে নাববে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্‌, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলেঅনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।

নিখিল বলে,ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ— বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি জানি, সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুলবয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছুআছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের

স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়,আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে। এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তার পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে— আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে রকমের স্বভাব কিংবা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ব'লে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে বলে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এ দুই দেবী তারই দুইরকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেছে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বল, শিখ বল, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডুপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেড়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে যে রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেইরকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি— জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কিনা। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্যলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো চোখের কাজল মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তো ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে আসনে বসেছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে

চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জনি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি ! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল!

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না— কান্না— কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্‌। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়,এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাত ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনও লাল, চোখ তখনও বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে,তুমি গরিব কিসের? যার যা-কিছু আসে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনো দিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? অথচ আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয়ে ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে; বোধ হয় সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্যে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্‌লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা— 'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'। 'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!' বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক— সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম— যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই; আজ ওরা বুঝতে পারছে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে।

যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকমভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়—

আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা, কালই এনে দেব।

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছি, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-একজন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, 'স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাশ দিয়েছে। সে খবরও আমরা রাখি।' আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।'

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি. এ. গম্ভীরভাবে বললে, আমরাও শুনেছি দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম. এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বললুম, কে বললে নেই? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যাবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম. এ. বললেন,তা হলে ঐ দাস-ব্যাবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি. এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। এই যে ও পারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার,কিংবা সানকিভাঙার চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন; যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ. এ.- প্লাক্‌ড্‌ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, এরাই তো প্রভু। যারা ষোল আনা ইচ্ছে করতে জানে না তারা হয় এদের ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আর পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বললে, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি, পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে; কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয় নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতেপারে মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো; আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম; বললুম, তাই যদি হয়, তবে এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনি সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সে-ই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেইজন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা, সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম. এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘর বাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না, আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন?

হাঁ, আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার, মাস্টারমশায় যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চারদিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেছেন, তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী-পুজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল; তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মীড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই, কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্তের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই, এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত; মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি,ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয়-ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের-অমৃতে-ডুবে-মরবার মানুষটিকেই তুই কি চিরদিনের মতো হারালি নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টারমশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছুকাল আমি বাগানে যাই নি, আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায়? আমি ভাবছি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কিনা, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কিনা। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা!

সে চমকে দাঁড়াল। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করেচোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঁজরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টারমশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টারমশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টারমশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টারমশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর-কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বললুম, মাস্টারমশাই, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশায় ক'দিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এতবড়ো অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে; 'হাঁ'ও বলে না, 'না'ও বলে না; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথ-খরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথ-খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে— তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষীতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে, নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদদের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে! দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে, চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একাট জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতবড়ো

একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল। আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম সেই অমূল্যকে, আহা সে ছেলেমানুষ, কচি মুরলী বাঁশটির মতো সরল এবং সরস, সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হল কী? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরোনী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'— তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট! এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝর্না একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব!

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিঁকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এতবড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে? এ যে ভরপুর সত্য, দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই-যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে— ঐ যে বড়োরানী মালা জপছেন মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালির গান গাচ্ছেন— আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজার গুণ সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়, এনে দেব! কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কি একটা কথা! এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি! এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব, পারব, পারব! একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি,টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা,এই-সব সন্ধান করছি!

অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে? মনে দয়া ছিল না। যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনি আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল— কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকা দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না?

হায় রে, আমি সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললুম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বললে, বাজার লুঠ করে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে, আর কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে; ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বল কী অমূল্য! আমাদের রায়-মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায়? দেখুন, আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না. ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধ'রে; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না? কেন একে বলছে না, 'ওরে বাছা,আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম'?

জানি জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যতবড়ো সিদ্ধিই হোক, মা যে বাঁচতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যতবড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনই মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বললুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম; বললুম,অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন!

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়াল তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে।

ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি, তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি— আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি?

মরণ প্র্যাকটিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিল।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন ঊষার প্রথম অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল,আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একট উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ! এই কি আমার স্বভাব? কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে; কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে! আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরং! আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরং!

পাঁচ হাজার চাই? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে; তার পরে মাতালের উৎসব; অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না; তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে; সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই-হাওয়ায় উড়বে— কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পুজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়াছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান; এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। এই টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে। এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন; বলেছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি; আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ; তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পর অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন। বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন,আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি!

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামাকাপড় ছাড়েন, সেই জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল,মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত-পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে,আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব-ক'টি নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়! চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল! হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা!

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার! চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং! দেশ, আমার দেশ,আমার সোনার দেশ,! সব সোনা সেই দেশের সোনা, ও আর কারও নয়!

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্বল থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম। অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম, সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি,

দেশকেই লুটেছি; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজা, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরিতো পূজা নয়; এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব! চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি!

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরাবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে-রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব, সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক্, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছে থেকে চুরি হত। আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকাচুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো-চুরিরই মতো; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস-চুরি,ধর্ম-চুরি। ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দায় টবের গাছ-ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম,আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল,আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনি আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজোরানী বললেন, *তোদের দেবীচৌধুরানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।*

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী, প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল, এখন দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছট্‌ফট্ করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না, শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মানসম্ভ্রম যা-কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে? এর উপরে অল্প একটুখানিও আবরু রাখতে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না, প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বৈকি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম, আর সেই শুনেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে গান শুনে স্বর্গ হতে ধুলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধুলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তো তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল— সেই মা, সে যে একই মা! আহা, ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত,ও আমাকে বললে কিনা 'আমার হাতে বিষ তুলে দাও',আর আমি ওর হাতেই বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই রানী!—

রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থর্‌থর্ করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা!

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল; মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু-ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি।

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্ ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্টো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে। বিদ্যুতের মতো অমূল্যের

মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না, আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যের করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনিভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল, ছল্ ছল্ করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বললে, তা হোক,ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী, আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী!

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না; সে বললে, রানী তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। বলে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে,তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল! আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দেমাতরং!

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময় শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব তাই! ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে; অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে সেও আমি পারি নে, আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন; বললেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেইসঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যে-রকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তাঁর মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই তোমাদের বড়োরানীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে, দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার

চেয়েও বেশি। কী লো ছোটোরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু, তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজোরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা ঘন্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনি একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না; তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই। আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজোরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো; মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা,আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো। এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজোরানীর কাছে খুলে দিলুম; বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজোরানী।

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর-কি! চারদিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না; আমি সন্দীপকে বললুম,অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বললে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি, না, গয়না বিক্রি বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ও-সব কথা রাখো, আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স, আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্নমুখে রেখে দিলে; আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ-সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে এ কী লজ্জা। সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই, নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তিক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন, সংসারে যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সের উপর শাল চাপা দিলাম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয়নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই!

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, রানীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য,আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না,বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না,আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনি সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে,অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একটু শক্ত করেই বললুম,আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বলল, তুমি মনে করছ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে— আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে,আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজবরদস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আস্ফালন। আমি একটা কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান,ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া,আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়।

যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না— মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেইজন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল, সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখে করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল,ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম— মনে আছে ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটি তর্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কী,মনে নেই? সেই যে—

> She should never have looked at me.
> If she meant I should not love her!
> There are plenty ...men you call such,
> I suppose ...she may discover
> All her soul to, if she pleases,
> And yet leave much as she found them;
> But I'm not so, and she knew it
> When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই, বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্‌স্পেক্টর না

হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, সে খাসা তর্জমাটি করেছিল— পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
(যদিচ ভাই, আমি তাদের গনি নেকো মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধল ধ'রে বিদ্ধ ক'রে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ; নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, বোধ হয়, ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন 'কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং' আমাকে ধরবে-ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলবার উদ্‌যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি?

আমি খবর দিতে এসেছি,পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্‌বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্‌বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে। আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

মুসলমানের ভয়ে, না আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা, আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই— চুরি তোমারই, তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ— নাহয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার। এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান;

এখন আমার দূরে-যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান?
পুষ্পবনের ছায়া ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।

সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণও নেই— একেবারে আগুনের মতো নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বললে, রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন?

আছেন।

বোন?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব দিদিরানী।

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনও কাটা হয় নি তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস ছিল সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে?

যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে বিমলা মায়ায় তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টারমশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী পুজোর আয়োজন করছে। এই পুজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তার প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ-মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর; সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তাহলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্।

যাই হোক দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু, এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু-জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে আনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা, ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি; এতদিন ওরা রাজা ছিল,আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি করব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি, চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু 'দেশের হিত করব' বললেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যাবসা চলে নি— আর খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যাবসা হুহু করে চলবে?

এক কথায় বলুন-না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যাবসাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়ি চড়বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক' বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকিরাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তারপরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি, সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন

দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ— দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন— এরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে! কাল রাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল, আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই ডাকাতরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবার পুলিসের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শান্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্যে বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন! ঠাকুরপো, তুমি না হয় ওদের একটু মন রেখেই চলো-না। দেশসুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

এই সেদিন শুনলুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে! ছি! ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই— আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও— এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয়-ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করলে। অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ ওটা ভালো করছ না। কোন্‌দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে— আমি টাকার জন্যে ভাবি নে ভাই, কী জানি—

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা ও টাকাটা বের করে এখনি আমাদের খাতাঞ্জিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী বললেন, এই সকালবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে! ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে এই ব'লে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দারকে।

সেকি কথা! ঐ তো জখম হয়েছে।

জখম কিছু নয়; পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে, সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে, ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও এক দিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্‌পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন?

তিনি বললেন, না সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নি। ভয় নেই তোমার, বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না; কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল— চারশো-পাঁচশো লোক, এত-বড়ো-বড়ো বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ-সমস্ত বাজে কথা; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ; এমন-কি, তাদের এক্রাম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস।

আমি বললুম, দেখ্‌ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে। হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টারমশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ—

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে। দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েছি, পরশু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও; মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে,উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখো, নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠছে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি য়ুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না। সত্যের জন্যে মানুষ ম'রে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে। কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

আমার ঘরে আর কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারন্দায় গিয়ে দেখি বিমলা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী,তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ— তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে? সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে? হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড় হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল, তার পরেই সে কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিল, বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু, স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায় হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেই দিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে! আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে আর এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে,অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে— কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষ কালে আমাকেই দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী, এতকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও, আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব!

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ির ভিতরে মেজোরানীর কাছে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে মনটা সংকুচিত হল; তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটোরানী, তোর হল কী? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি— করো দিদি,আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোন দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন। আমার এখানে দুপুরবেলা তোর নেমন্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান, এমন কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি। সব ধুয়ে মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে,অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কী করে! বললুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক, আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন,আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্‌যোগ করছি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম; বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছক— অমূল্য রক্ষা পাক।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশি রানী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না; ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত। তা হলে এ সমস্ত গয়না আমার?

এই ব'লে সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে; মুখ শুকনো, উস্কখুস্ক চুল; একদিনেই তার তরুণ-বয়সের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

গয়নার বাক্স তোমারই নাকি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা করে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে?

তখনি সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে? ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার, এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না, কখনোই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না!

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নার যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, অমূল্য, তোমারও এত দিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে। মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিস তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করছি। এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘ'টে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়,পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে— এখনই তুমি বাড়ি যাও, যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটলি বের করে বললে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি— আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু যতবড়ো অন্যায় ততবড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম।

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জানো দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তেপড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না। এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে— ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস নে, এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রানীর লাবণ্য— না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে, পুলিস সেই নৌকাচুরির কোনো খবর পায় নি, ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে। — আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে? — সন্দীপ বললে, জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে। — আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। — সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে। — কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই,গিনিগুলো আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব। — সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বলো বন্দেমাতরং! ঘোর কেটে যাক। — তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দেমাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না; বললে, দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে তো নিয়ে যাও। বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে, তার পরে আমি বলব। এখন নয়। — আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। গিনি এনে দিচ্ছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে! এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিল না! আবার বলে কিনা, এ গয়না ওরই দান। আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত

করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না, অমূল্য, এখনই যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখো এসো। পারবে না লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সবচেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

এ কথা বোলো না দিদি। যে রাস্তায় চলেছিলুম, সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ— এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব, কোনো ভয় নেই। তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নেমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; বললুম, আচ্ছা।

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন! এত লোককে নিমন্ত্রণ! আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে! আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে বাজল সে শুনতে পেল না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কী রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনই জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ। আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এই লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো। একেবারে নিঃশেষে মারবে, না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত,বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি; বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল; ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে, এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌ গল্‌ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সে-রকম খাতা আছি নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দর্জির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে—

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন; খাতা-মুখস্তর ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না; একেবারে গর্জে উঠল,তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে মুহূর্তে খাটে না সে মুহূর্তেই ওর আর জোর নেই, রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়! দুর্বল! দুর্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে, অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যে-রকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন; বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ,মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অনুচর নাকি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর?

হাঁ, জোর।

আচ্ছা, বেশ, নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষীরানী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়— বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন, বড়ো সুন্দর এই বিনাশ। সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো; এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে; সেই বিষ পান ক'রে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো, এরা সবার ভালো করতে চায়— যেন সবই সত্য! কখনোই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে! আমি ভালো নই, আমি ধার্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই কিছু-আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে, কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়; তা নয়, যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে; স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা; কিন্তু তবুও— আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো; আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন! মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর-এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়; সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে— সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন; তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে

সত্যদেবেরই এই কাজ— মাতলামি স্বর্গের সাজ প'রে এসে তাপসদের সামনে নৃত্য করতে থাকে। বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বরণ করব; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে প'ড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে; মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম; আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল; আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম; তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব— এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম, এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকে খাওয়াবার উজ্যুগ হচ্ছে বুঝি?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে; আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা। এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ করে বললেন, অবাক করলে! তোর মনে একটুও ভয়ডর নেই?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পার না! কাছারি লুট করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে জামার পকেটে চাবি থাকে সে জামাটা তখনো আলনায় ঝুলছে। চাবির নিরং থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম,কাপড় ছাড়ছি। — শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে? ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজোরানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'বলি এত সাজ কিসের' আমি বললুম, জন্মতিথির।

মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি, এমন সময় সে এসে পেন্‌সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চলল,আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারও নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতবড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন; তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো'সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্‌বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলি নে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম, এরই মধ্যে কখন—

কেন, কী চাই?

শুনছি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চমকে চমকে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি বললুম, হাঁ ঠিক। মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁওয়া, স্বপ্ন।

এই-যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল ব'লে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে, এই সময়টাকে কেউ এক দিন থেকে আর-একদিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই; অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে

এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব,তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হয়ে যাবে— জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে- সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি—সে আমার বালকদেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম! ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠছে, পুলিস আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী- চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও। - ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, একথা বলি কার কাছে? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা, আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল; বললে রানীমা, এই বেনারসি কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী— থাক্ সে কথা কল্পনা করে হবে কী! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর - একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে, সেদিনও কি আমার সংসারের সব কটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পরে পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজোরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাকব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আসছে; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানীমা! আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে আমার এখন সময় নেই। — থাকো বললে, মেজোরানীমার বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি! এর মাঝখানেও গ্রামোফোন; তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছেই; ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না; তবু থাকতে পারলুম না, বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও। বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। অমূল্যবাবু নেই— সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে আর সে নেই। সম্ভব-অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে?

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না; কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘোরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে, তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইছে। কেননা আমি যে একলা; একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে, তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই, যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশির বিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে- চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যেও আরো ভয়ানক কান্না। যা -কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি— অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা -কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহন করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও ,সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম, একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এসো, এসো, এসো-তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপর এসে দাঁড়াও, প্রভু— আমি এই মুহূর্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে। আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম, ঐ পায়ের চিহ্ন চির জীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্ গে আমার কথা।

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কতদিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর-একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে আমি জীবনের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে; যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে; এবার বেরিয়ে পড়লুম,চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ— তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পারো প্রিয়ে? সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝর্না ঝরে পড়ছে। লক্ষ্মীর অমৃতভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল তার মানে কী বলো তো।

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারিনি।

মায়া কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু, এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি? তা হলে একবার এসো, একবার দেখো সে কত জিনিসের উপর আমার মায়া। — এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি; এই-সব দেখছ এক-এক-টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুনি, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কী মেজোরানী? এ-সব বাক্সয় তুলেছ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

সে কী কথা?

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে, সেইজন্যেই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারের বাহক ছিলুম আমি; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল; মেজোরানী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন, এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে; কত ঝগড়াও হয়েছে; বিষয় ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে মনে হয়েছে, বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখাপ্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ-পর্যন্ত কখনো একদিনের জন্যও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তার সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকাকড়ি-ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটোখাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে

বারবার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়; তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি, বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে, এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝিছিল আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম; বললুম, মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই, মেয়ে জন্ম নিয়ে আর নয়! যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হাল্কা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি; বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে 'আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা', এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি। —কখন বেরোতে হবে ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়, সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে, আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো; গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে দেখলেই মনে হয়, আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো, এখনি তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম,একবার দেখে আসি গে, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।

বলে তিনি আমাকে হাত ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই; সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্ গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গে। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধরে বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক

অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম।

মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো; দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য, বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে। এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানী ভরা গরবিনী! কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে! আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো, তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী,অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।

বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী?

দারোগা হেসে বললে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে,এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে— চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বললেন, মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে -সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব। — বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল; পড়তুম রিপন কলেজে, একদিন স্টাণ্ডে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ

ফসকে গেছে। — মহারাজ, এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাঁউ শব্দ করে মূর্ছা গেল; দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে?

ছোটোরানীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। সে একখানি সাদা শাল মাথারউপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল; পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি; সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে!

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দেমাতরং মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি— তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম, এখানে আমার আর দরকার নেই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছোঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে, যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার; আমরা নিবোনো; আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধহয় আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার; নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই-যে ঠাকুরপো, আমি বলি বুঝি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন,দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে, চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো—

মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না; সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজোরানীর সামনে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম। চারি দিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ছোটোরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের করে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন,আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে!

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের

দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম; জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা; কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি। পান নেই ঘরে? নাহয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে -না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয়নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল।

এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কিরকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না; কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন; আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে; কারও জীবন একলার জিনিষ নয়; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের চার দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে; আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফর্মাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক— আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো একটা ক্ষতের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব; একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে! তার পরে? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?

একটা কী খট্ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরে ঢুকবে কি না-ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল! সে থমকে দাঁড়াল, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বারবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বললে, না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পুজো করতে দাও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য— সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার ত ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না। তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না, তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন?

খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা -ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ওতো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা বলে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলের উপর খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল,ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচকাঁদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তু'র হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না— তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী! এই নাও!

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, সন্দীপ।

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মতো চললুম। তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই-কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী ক রতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিচ্ছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরেই মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন?

বেহারাকে বললেন, ডাক্ ডাক্ শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনোদিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা সকলে মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে। তাঁর মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম দিগন্তে গোয়ালপাড়ায় ফুটন্ত সজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নহবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী- যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়াসোয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলেছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচেআছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল, সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু এ পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘন্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর, খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপিচুপি বললে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাল্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, কী মনে করেন?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

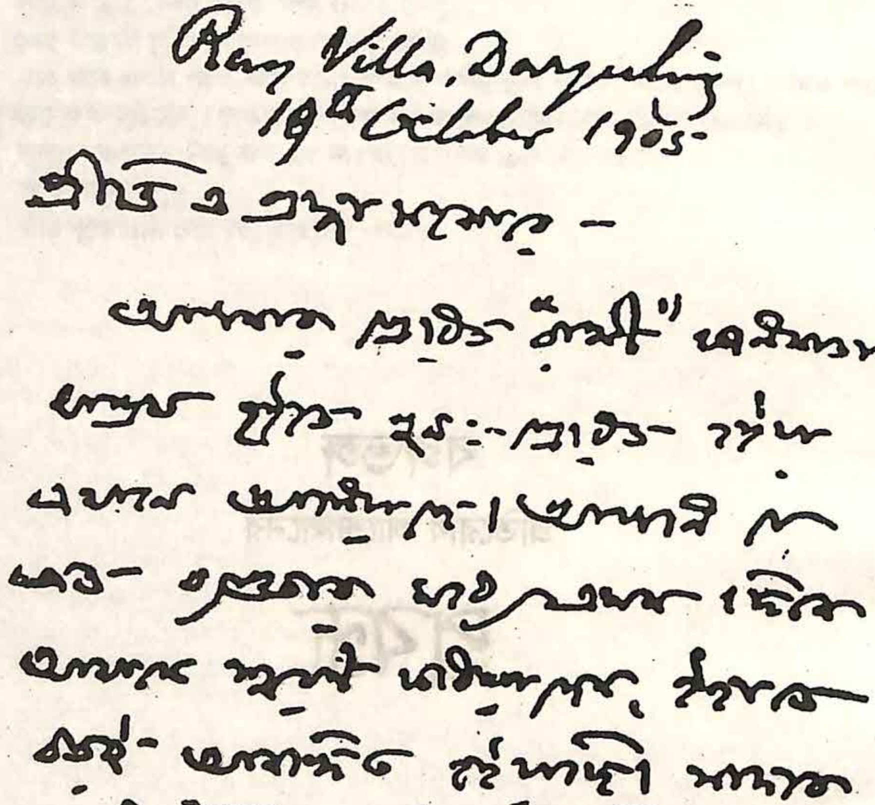
আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছে, তাঁর হয়ে গেছে।

বঙ্গভঙ্গ

প্রতিরোধ আন্দোলনের

প্রবন্ধ



Ray Villa, Darjeeling
19th October 1905.

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্ভাষণ —

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

'রাখী' পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা শিবনাথ শাস্ত্রীর চিঠি

বঙ্গবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতা দিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই—এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণ ব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলাকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেক দিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না-আছে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ, চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয় আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা তোমরা এ দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও, এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে এমন যদি সন্দেহমাত্র জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি—অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে, ওরিয়েন্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি, আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরোপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোলো আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরাজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন : Spare him not, crush him like a worm! কিন্তু বাঙালি সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক

জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, 'আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্।' পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই। সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই — আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ, কিন্তু বাঙালির তদপক্ষো কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্ত-মাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে—যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি তাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে 'তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব', তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে।

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন— অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, 'তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, 'তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'!

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্ম ও যথানিয়মে পালিত হয় না, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয় তাহা গ্রহণ না করি কেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে—সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি-উপলক্ষেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি-বা কপট ভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তায় ঘাটে, আপিসে আদালতে, রেলে, ট্র্যামে, কাগজে পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মন জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালি জাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে

পারিত তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন। গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না—আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রটা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম। বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম। আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই; এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনি আন্তরিক ঐক্য উদ্‌বেল হইয়া উঠিবে—তখনি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে -দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা; ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে—যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে—তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, যে পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই; আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন। মনে করো-না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল 'তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব' তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, 'আমি ঝরনার নীচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া।' তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন 'তোমরা কোনো কর্মের নও'। আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল'। অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র

দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব, কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী। সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে। ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওআলিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউন-হল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে গবর্মেন্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পরিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ; অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন তখনি আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কী সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না—বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্‌সাল কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনা-দিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না। এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন্, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব—সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

অবস্থা ও ব্যবস্থা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখ ন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে তখন বুঝিতে হইবে ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে, ইত্যাদি। নানা মুখ হইতে এই-যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে-সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ বলিয়া বিবেচনা করে নাই আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে, পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ কথা আজ আমরা এক দিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি—বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব, আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে : শুধ শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধন সম্বন্ধে নিজের কাছে যে-সকল আশা করি না পরের কাছ হইতে সেই-সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মতো আঘাত বার বার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর-একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পরে যাওয়া যাইবে।

আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও'— এই যে-সকল দাবি আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসংকোচে উপস্থিত করিয়াছি ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে-সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহাদিগকে ইঁহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন এমন ইঁহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইঁহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখো, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়েছিলেন—তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুই-একটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিসর্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশীরূপে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরজাতি বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। ইহার সহিত ইংরেজ উপনিবেশগুলি ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় তো অনেকে স্টেট্‌স্‌ম্যান-পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে যে-সকল বাড়ি এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে-সকল হৌস ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যাবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটা Vigilance Association বা চৌকিদার-দল বাঁধিতে হইবে। সবায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের শহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন-কি ইংলন্ডের কোনো শহরে দেওয়া সম্ভব হইত। ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল না, সেখানে তাহাদিগকে 'লিঞ্চ' করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে 'লিঞ্চ' করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মতো উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয় তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয় জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ—এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য যে-সকল জাতিকে আমরা অনার্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে

বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি ডোম চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি, আমরাও আছি, তাহারাও থাক; বলিয়াছি, প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভালো। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায় তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে সে অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুই-একটা প্রমাণ আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষ্যা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজ নির্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-বাদী কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত বড়ো অধর্ম, যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্র পশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ, জগতে অ্যাংলোস্যাক্সন জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয় তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

অ্যাংলোস্যাক্সন যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপরহণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেক দিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্সন মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূমি করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেন্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় তো আর-এক দলের দয়া হইতে পারে। প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় তো, যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা তো আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না—এমনি আমাদের মুশকিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা হে। পৃথিবীর ইতিহাস ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটিতেছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে, একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্বভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যই কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম করিতে চান অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষ্যাবশত নহে; নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কী শক্তি, কী মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ংকর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত তাহা হইলেও হয়তো মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্ধাকে লালন করা হয়, এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্বকে খর্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই-সকল পোলিটিকাল সভা কৃতকার্যতার বল লাভ করিতে পারে না; একত্র হইবার যে শক্তি তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্তি তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে—আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক

তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্য আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন-প্রকৃতি-বশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূলে নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্যই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেন্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতরো সন্দিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না—এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন—যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ি যাওয়া। সে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুরবাড়িতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড়ো কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে—তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপরতাও হয়তো আমাদের সমাজে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয়তো স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিকেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ-সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে-সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের

অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিব। আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম বিলাস আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো-একটা কর্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে। ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই; ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবার বেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কী আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কী জাতির প্রকৃতিতে, কোনো-একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না, তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখ বহন করিতে, বিলাস ত্যাগ করিতে, ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মতো একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্‌বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে এক-মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান

আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায় তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজি স্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত—ইঁহার এই সহজ মুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনি আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য, যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না তাহারা চিন্তা করিতেছে, যাহারা পরিহাস করিত তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে, যাহারা কোনো মহান সংকল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত তাহারাও কাজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ভালো করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন। ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কলাকৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা-আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তি-দ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্‌যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত, বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি—পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে—সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে, 'পরিত্যাগ করো বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের বিলাস পরিহার করো'—সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না; এই কথা নিঃসংকোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থ ভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্তকাল গোপন থাকে না তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন, দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম, তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনোই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, কিন্তু সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে দুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি সেই জাগ্রত পুরুষ কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, 'গবর্মেন্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে-একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম

ও দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও।' তাঁহার অনুশাসন এই যে, 'বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য সকলের মনে যে একই উদ্যম জন্মিয়াছে ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ করো।'

অতএব, এখন কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া, এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি—আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায় তবে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে; বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরও দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে—সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু, অনির্দিষ্টভাবে সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সেদিন নাই—আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর-কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেইজন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ-উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা রুশীয় গবর্মেন্টের অধীনস্থ বাহ্লীক-প্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীক-প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না তাহা জানি না। সেখানে 'সকার্‌ট্‌ভেলিস্টি' নামধারী একটি জর্জীয় 'ন্যাশনালিস্ট' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—ইঁহারা 'কার্স্‌' প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্য জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন—

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have he invaluable characteristic of incorrupribility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had

previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে—বস্তুত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোকে যে গবর্মেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না? কেবল চাকরির পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরির খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুশি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরি আরও বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্মেন্টের আপিস রাক্ষসের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা আমাদের যে কী শক্তি আছে তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তাছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম যেখানে 'দেশের কাজ করিতেছি' এই ধারণা সর্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে 'দেশকে ভালোবাসে' এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে এক দিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্য দিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া, এমনতরো অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না—দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে-একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেন্টের আফিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেন্টের

দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একট অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়েৎ ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাসভঙ্গ করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এ দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে-সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন-অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে-গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত—এই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেন্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে কাজ করিত গবর্মেন্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিস আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব সেজন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে—পরের কাছ হইতে যাহা পাইব সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয় তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে—যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষিদের অধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না—অতএব গবর্মেন্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে 'তোমরা অল্প সুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো', তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের দেশের চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে? আমরা যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব—এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হউক তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব, আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন। গবর্মেন্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রসাদের প্রলোভন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য

বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই—কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে—আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেকদিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে এই বইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত আজ পর্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ এক মুহূর্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্বাচনপূর্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভান্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গপ্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজের পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয় লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলই দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই

অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে— ইহাতে মহান সংকল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালিকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া, বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিবার এই সাধনা, গর্বকে বিসর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে তখন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব তখন আমরা দাসত্ব করিব না—তা আমাদের প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন। জল যখন জমিয়া কঠিন হয় তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনি আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন; একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, এই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরার প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই যদি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনি ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখ দুঃখ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে তখনি ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য; তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

আশ্বিন ১৩১২

ব্রতধারণ[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি, বা আমার কোনো নূতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নূতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট সুস্পষ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার এই উদ্‌যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু-না-কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে দুর্যোগ বলিব কি? এই-যে দিগ্‌দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই-যে বিদ্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিণ্ডকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গেল—এই দুর্যোগকেই যাহারা সুযোগ করিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনি স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাঁধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর দুর্যোগের বেশে যে সুযোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্য শক্তিকেও যথাসম্ভব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে-এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদূতকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো দুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে : ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনোই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহ্য হইয়া যাইবে—অপমানে যাহা শিখিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভুলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্য প্রস্তুত হইব। যে দুর্বল নিশ্চেষ্ট তাহার ইহাই দুর্ভাগ্য—দুঃখ তাহাকে দুঃখই দেয়, শিক্ষা দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই দুঃসময়ের দান গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি।

---

১. কোনো 'স্ত্রীসমাজে' জনৈক মহিলা-কর্তৃক পঠিত।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকূলতা, আজ দৈবকৃপায় যদি তাহা আমদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিস্মৃত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে খাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না—তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে খাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক—পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার দুর্দিনে আমাদের পুরুষেরা কী কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে!

যে নির্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজদ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে। সমুদ্রের এ পারেই কী আর ও পারেই কী, অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে—তাঁহাদের বহুদিনের বিশ্বাসক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা খিলানে-খিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে—এখন তাঁহারা ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটীর আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্য একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে যে পুরুষেরা কীভাবে সাড়া দিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্যা নহি? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে? দেশের দুঃখ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না?

ভগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি—দুঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি তাই দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শয়নে স্বপনে বিলাতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া, তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া, বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে যাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শখ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক, মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাস-ক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয় তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ—ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার খাতায় সহি দেওয়া সহজ, কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে তখন ধর্মের শঙ্খ বাজিয়া উঠে, তখন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত তাহাতেই আনন্দ—সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, দুঃসাধ্য বলিয়াই সুখ।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্র শক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই; স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্যদ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গপ্রদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্য করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি। ভালোবাসা চাকচিক্যে ভুলিয়া নূতনের কুহকে চারি দিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে সুশ্রী হউক, আর কুশ্রী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না—সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ত দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে। যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা—তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একান্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমস্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীকন্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই রক্ষণপালনের শক্তি স্ত্রীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব স্ত্রীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নূতনত্বের বন্যায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্যার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের খোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশঙ্কা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেস্টর ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

সে কথা জানি। ম্যাঞ্চেস্টরের কল চিরদিন ফুঁসিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভারপুলে এঞ্জিনের আগুন না নিভুক। আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে

চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক, অন্তত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ঔৎসুক্যকে যে কায়ে-মনে-বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে—নতুবা দুই দিনেই তাহা যে বিস্মৃত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিনে আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অসুবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে—সে যেন অহংকার অনুভব না করে। অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা স্মরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি। আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অনুকুল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অনুকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কষ্ট হয়, তবে সে কষ্টই আমাদের মন্ত্রকে ভুলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা-কিছু পরবশ, তাহাই দুঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ, তাহাই সুখ।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্য কামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে—তবেএই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ভাদ্র ১৩১২

বিজয়া-সম্মিলন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশে কতকাল হইতে কত বিজয়া দশমীর পরে ঘরে ঘরে প্রীতিসম্মিলনের সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে, কিন্তু অদ্য এখানে এই-যে মিলনসভা আহূত হইয়াছে, আশা করি, আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সভা চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আশা করি, আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-সম্মিলন যে-একটি নূতন জীবন লইয়া অপূর্বভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, সেই জীবনধারা কোনো দুর্দিনে কোনো সুদূরকালেও যেন শীর্ণ না হয়; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে মিলন-উৎস বিধাতার সংকেতমাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আমাদের পাপে কোনো অভিশাপ কোনো দিন তাহাকে যেন শুষ্ক না করে।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম; এ কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়; সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে সুবর্ণমণ্ডিত এই-যে নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালি জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে। সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বহুদূর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুলধারা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়া-মিলন বহুকাল পরে আজ একটি দেশপ্লাবী সুবৃহৎ ভাবস্রোতের সহিত সংগত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গঙ্গাযমুনার মতো আর-কোনোদিন বিচ্ছিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধবসম্মিলন নহে আমাদের জাতীয় সম্মিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

যাহা আমাদের চিরপরিচিত তাহাকে আমরা যথার্থভাবে চিনি না, এমন ঘটনা আমাদের নিজের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে একান্তই জানি বলিয়া মনে করি—হঠাৎ একদিন ঈশ্বর আমাদের চোখের পর্দা সরাইয়া দেন—অমনি দেখি যে তাহাকে এতদিন বুঝি নাই, দেখি যে আজ তাহার সমস্ত তাৎপর্য একেবারে নূতন করিয়া উদ্দীপ্ত হইল। সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম—এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই, যাহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইবার তাহাকে আমাদের ঘরের দাওয়ার উপরে বসাইয়াছি। আজ বুঝিয়াছি, যে মিলন আমাদিগকে বর দান করিবে, জয় দান করিবে, অভয় দান করিবে, সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে—তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তি দান করে।

বন্ধুগণ, আজ আমাদের চোখের পর্দা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেছে সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্তা বাংলায় কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি : জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল? এ কি কোনো বক্তৃতায়, কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে? তাহা নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষস্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক-আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেইজন্যই আমাদের সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদৃষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালির বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল—আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ কথা বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সেইজন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে, আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে না—আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল। বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন-ধারণ করিয়া আছি, আমরা ধন্য হইলাম।

বন্ধুগণ, এতদিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র, একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি, আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা সত্যরূপে না লাভ করি তাহার সহিত আমরা যথার্থ ব্যবহার স্থাপন করিতে পারি না, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্য দুঃখ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি, যতই কথা কই, সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই-যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে—যাহা আমাদের পিতা-পিতামহগণকে বহুযুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অমৃতবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে, আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালোবাসিতে পারি—কেবলমাত্র ভাবরসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দিই। আমরা যেন ভালোবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি সত্যরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালোবাসি, তাহাকেই আমরা সকল দিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই, সকল দিক হইতে এমনি করিয়া সেবা করি, এবং সেই আমাদের সেবার সামগ্রী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমি যে একটা আমি নাহি, আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময় চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য যতদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি—ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরানি সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী? তাহার কারণ, তাহারা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালির সহিত এক বলিয়া অনুভব করিয়াছে। যতদিন তাহারা নিজেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিত ততদিন তাহারা ভুল জানিত। ইহাই মায়া। এই মায়াই তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে, অপমানিত

করিয়াছে। মানুষ যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও এই ভ্রমবশতই করে। সে মনে করে, আমি বুঝি স্বতন্ত্র, সুতরাং মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সহিত মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিলেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়, কারণ তখন আমি জানি সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই জাপানের শত সহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। আমরা যে নিজের প্রাণটাকে টাকার থলিটাকে একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া বসিয়া থাকি, নিজেকে একা বলিয়া জানাই ইহার একমাত্র কারণ। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই 'আমি' বলিয়া জানিতে পারি তবে আমার ভয়কে, আমার লোভকে, দেশের মধ্যে মুক্তিদান করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারি, অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তখন যে নিতান্ত ক্ষুদ্র সেও বৃহৎ হয়, যে নিতান্ত দুর্বল সেও সবল হইয়া উঠে। আজ কতকাল পরে আমরা বাংলাদেশে এই সত্যের আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহার কাছে যাহা প্রত্যাশা করি নাই তাহাও লাভ করিলাম। সেইজন্য আমরা আপনাতে আপনি বিস্মিত হইয়াছি। সেইজন্য আজ আমাদের বাঙালির চিত্তসম্মিলনের ক্ষেত্র হইতে যাঁহারা পৃথক হইয়া আছেন তাঁহাদের ব্যবহার আমাদিগকে এমন কঠোর আঘাত করিতেছে—যাঁহারা ভয় পাইতেছেন, দ্বিধা করিতেছেন, সকল দিক বাঁচাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের অবজ্ঞা এমন দুর্নিবার বেগে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাসে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহারা বিলাস-উপকরণের জন্য লজ্জিত হইতেছেন, যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া জানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, যাঁহারা বিদেশী আড়ম্বরের অগ্নিশিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলয়দীপ্তি আর প্রলুব্ধ করিতেছে না। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ, আমরা সত্য বস্তুর আভাস পাইয়াছি, সেই সত্যের আবির্ভাবমাত্রেই আমরা বৃহৎ হইয়াছি, বলিষ্ঠ হইয়াছি।

এখন ঈশ্বরের কাছে একান্তমনে প্রার্থনা করি, এই সত্য যেন ক্রমশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, এই সত্যকে যেন আবার একদিন আমাদের শিথিল মুষ্টি হইতে স্খলিত হইতে না দিই, অদ্যকার সংঘাতজনিত উত্তেজনা যখন একদিন শান্ত হইয়া আসিবে তখনো যেন জীবনের প্রতিদিন এই সত্যকে আমরা অপ্রমত্তচিত্তে সকল কর্মে ধারণ ও পোষণ করিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে, আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কোনো আইন পাস হউক বা না-হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না-করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশে। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্রবহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। যে পথ কঠিন, যে পথ কন্টকসংকুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না—দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ লাভক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্‌যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয় তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে বিজ্ঞভাবে বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত

পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।।

কার্তিক ১৩১২

শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী ও বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষালাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিতসাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে-পাঠশালা যে-টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে, সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছি। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এ দেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল-পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে তখন সে ক্ষতি কোনোপ্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিমনি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল সেই তার সেই চিমনির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি -না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনই জাগ্রত হইব তখনই সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এদেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরও অনেকগুলি শক্তি আছে যাহার উৎকর্ষ-সাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই-সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে-মানবে কোনোদিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল—এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমত সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে সে পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না; আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তহা অপেক্ষা যে-শক্তিলাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে—বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয় তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশীবর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পর মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধি-বিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভার্সিটিকে 'বয়কট' করিব; আমরা এ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময় প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘ কাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্‌বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে-উদ্যোগের লক্ষ্য আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য কেশসাধ্য মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই। পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে, এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী। গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তুবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমনকি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনোমতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্ত স্বদেশপ্রীতির প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবলই এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই-যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের

যাঁহার যতটুকু মনের-মতো না হইতেছে, যাঁহার যে-পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্‌যোগকে আগাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না, 'আচ্ছা হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক; কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁত সুন্দর এবং সর্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায় যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।'

বাংলাদেশের স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহাকিছু স্থির করিতেছেন তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমতো প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শ রচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে আদর্শ রচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে। পাঠশালায় ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা, এ কেবল সেই প্রকার বৈঠকেই শোভা পায় যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে, এই শিক্ষাব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তনব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই; তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে, গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য, আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না, দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকদ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্যে করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকে, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক, কাল পুনরায় এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের প্রয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।

"বয়কট" এবং "স্বদেশীয়তা"

প্রমথনাথ চৌধুরী

গত ৭ই আগষ্ট টাউন হলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা কক্ষের প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন না গভর্ণমেন্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙ্গালী বৃটিশ মাল বয়কট (boycott) করবে। তার পরে, অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ আস্ত থাকুক কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবলমাত্র স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করবার পণ ছাড়ব না। একদলের মতে বয়কট-ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজার অধিকার বজায় রাখা। অপর দলের মতে—"স্বদেশীয়তা" শুধু একটা অর্থ নীতির চাল, উদ্দেশ্য—প্রজার দারিদ্র্য মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকী আমাদের সকলের নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা দুয়ে মিলে একটা ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীয়তাই বল,—সাধারণের কাছে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিসটা কি চাই, কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল আছে তাই নিয়েই চিৎকার করতে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যাঁর মনোভাব এই যে, তাঁর মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এইরকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ দুই একই জিনিস কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে ত পার্থক্য কোথায় সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ আমি "স্বদেশীয়তা" সম্বন্ধে দুটি চারটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্তু প্রচারের কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হ'ল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্যব্যবহার্য্য সকল জিনিষ বিদেশ থেকে আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এইরূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের মত শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ এমত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য একথাও কেউ অস্বীকার করবেন না। এ সব জেনেশুনেও দু'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেননি। আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন মিছিমিছি economical laws-এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা নিজেদের অদৃষ্ট দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা ভগবানের হাত দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে; তাদের দুর্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিই নি। আমাদেরও তাতে বিশেষ দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি-কোটি ইতরসাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে supply তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের

গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি করতে পারিনে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগৎকে আমরা কায়দা কর্‌তে পারিনে। পিপাসা বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিশেষ কোন সাহায্য হয়নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হ'লে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্তু চোখ নেই, সেই জন্য কলেগড়া জিনিষ আমাদের কাযে লাগে, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাযের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম। Economy ছেড়ে aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশী শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের "স্বদেশীয়তা" এই অবস্থায় ছিল।

এখন বয়কটে আসা যাক্। বয়কটের অর্থ হচ্ছে, তোমার জিনিষ ছোঁব না। তুমি সস্তাতেই দাও আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিষ কিন্‌ব না। ফি রকম জিনিস যদি বেশি দামে কিন্‌তে হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিষ কিন্‌ব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে জিনিষ না পাওয়া যায় তাহলে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয় তাও স্বীকার, আমাকে নানারকম স্বার্থত্যাগ কর্‌তে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা বিশেষ কোন আঘাত না লাগলে জন্মায় না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্ত্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্ দূর ভবিষ্যতে তাঁতি, ছুতোর, কুমোর, কামারের অবস্থা একটু ভালো কর্‌বার জন্য বর্ত্তমানে নীজে দুরবস্থায় পড়্‌তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালীমাত্রেই বৃটিশ নাম বয়কট কর্‌ব এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দুদিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা কর্‌ছে। কেবল Economics-এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব এ দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তারা পার্টিসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের উপায়স্বরূপ মনে করি। ইংরাজজাতের পকেটে টান পড়্‌লে, চাই-কি বাঙ্গালীর প্রতিও তাঁদের নজর পড়্‌তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটের জন্ম। আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব ইংরাজের কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশী চিজ—সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মঘট করা দোকান-পাট বন্ধ করা প্রভৃতি, রাজার অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা। এই ধর্ম্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের হাতে একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট কর্‌বার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্ম্মঘটও চিরকাল রাখা যায় না, বয়কটও চিরকাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধাণ উপায় দেশী জিনিষ প্রস্তুত করা। পরের কিন্‌ব না বলায় কোনই লাভ নেই। যদি-না নিজের মাল বাজারে ফেল্‌তে পারি। সুতরাং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশী বস্তু প্রচার করা নয়, প্রস্তুত কর্‌বার উপর নির্ভর করছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয়। স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতিস্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেক স্বজাতিবৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চ্চা করার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায় যে উদ্দেশ্যে একায করা তার যতদিন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না হয়ে যায়। ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্ত্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটে কৃতকার্য্য

হই, যদি ইংলণ্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্ব্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক কি মিছে, তা'বলবার আমাদের অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের "স্বদেশীয়তা" প্রাণলাভ করেছে। এই ঝোঁক আমরা কিছুদিন রাখতে পার্‌লেই আমাদের স্বদেশী শিল্পের উনতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কার্য আরম্ভ করা গেছে অর্থ-নৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ করবো। উপরে যা বললুম তার সারমর্ম্ম এই;—যাঁরা বলেন, বয়কট, রাজনীতির কথা তাদের কথাও ঠিক; যাঁরা বলেন, "স্বদেশীয়তা" অর্থনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক। আর আমরা অপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুইই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ; আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

অভয়বাণী

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভর হও, আমরা তোমাদিগের উৎসাহে বাধা দিব না, তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমাদিগের যিনি জননী, তিনি আমাদিগেরও জননী; মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমরা যে সঙ্কল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরাও ধারণ করিলাম; তাঁহার সেবার জন্য তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমরাও গ্রহণ করিলাম।

বঙ্গরমণী কবে কোন্ কঠোর ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে মার দুঃখ নিবারণ অভিপ্রায়ে, পিতাভ্রাতাপতিপুত্রের মঙ্গলকামনায় ইহকাল, পরকালের হিতার্থে চিরদিন তাহারা কঠোর ত্যাগস্বীকারে শরীর পতন করিয়া আসিতেছে। আর আজ জন্মভূমির পূজায় কষ্ট স্বীকারের ভয়ে তোমাদিগের সহিত যোগদানে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে?

তোমরা নির্ভয় হও, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আজ আমাদের মহোৎসব। আজ পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী, পতিপত্নী সকলে মিলিয়া আমরা মহাব্রত ধারণ করিতেছি; এত পুণ্য এত আনন্দ আমাদের স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত। এই পুণ্য আনন্দলাভের জন্য কোনও কঠোরতা স্বীকার করিতেই বঙ্গরমণী কষ্ট বোধ করিবে না।

কিন্তু এ ব্রত অভূতপূর্ব্ব ব্রত। ইহাতে উপবাস নাই, শরীর পতন নাই, কোন কষ্টই নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই ব্রত! তবে তোমরা কি মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব? বিলাতি চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখারুলি পরি, বিলাতি সাবান বিলাতি সুগন্ধীদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মত চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতি লেশ না দিয়া দেশী চিকণ লাগাইয়া পরি, সূক্ষ্ম বিলাতি মজলিন পায়নাপল প্রভৃতির বদলে, দেশের চেলি বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই আর বিলাতি সুলভ শাড়ির বদলে, সামান্য বেশিদরের শাড়িই ব্যবহার করি, তাহা কি ত্যাগস্বীকার? না কোন কষ্টনামবাচ্য? আর গরীবলোকের পক্ষে সুলভ বিলাতি বস্ত্রের বদলে সামানা চড়াদরের বস্ত্র কেনাও কষ্টকর। কিন্তু আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য এক ব্রত। একের অর্থ অন্যের পরিশ্রম মিলিত করিয়া তাঁহারা দেশের কল কারখানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ধনী গরীব নির্ব্বিভেদে সকলেই দেশীবস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। এসময় আমরা ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরণীগণ, যদি বিলাতি তেল, বিলাতী সুগন্ধী, বিলাতি জ্যাকেট, এবং অন্যান্য নানাবিধ সৌখিন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তবে কত অপব্যয় নিবারণ করিতে পারি এবং এইরূপে সমস্ত অর্থ দেশের উন্নতিতে প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে আমরা কতদুর সহায়তা করিতে পারি? দেশের কার্য্য করিবার, স্বামীর ও পিতাপুত্রের সহায়তা করিবার এই সুযোগ, এই অবসর কোন বঙ্গ রমণী না হাস্যমুখে গ্রহণ করিবেন।

আশ্বিন মাসে মা আসিতেছেন, এসময়ে নূতন বস্ত্র পরিধান আমাদের চিরন্তন প্রথা, কিন্তু তোমরা যদি দেশীবস্ত্র যোগাইতে না পার তাহা হইলে এ সময়েও আমরা নূতন বস্ত্র পরিব না। আমাদের বংশানুক্রমে রক্ষিত পুরাতন চেলি বারাণসী পরিয়া, এমন কি পারতপক্ষে আমরা পুরাতন ধৌত বস্ত্র পরিয়াই দেবীকে প্রণাম করিব, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিব, তথাপি এসময়েও আমরা বিলাতি বস্ত্র পরিব না। আমরা বুঝিয়াছি ইহাতেই দেবী ভগবতী অধিক সমাদৃতা হইবেন; তাঁহার পূজার যথার্থ ফল হইবে। অতএব হে বঙ্গসন্তানগণ, যদি তোমাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বঙ্গরমণীর পক্ষ হইতে এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছি যে তোমাদিগের সঙ্কল্পই আমাদিগের সঙ্কল্প, তোমাদিগের ব্রত আমাদিগেরও ব্রত। তোমরা নির্ভয় হও, তোমাদের প্রতিজ্ঞা অটল রহুক্, তোমাদিগের ব্রত অবাধে উদ্‌যাপিত হউক।

— ব্রতধারিণীদিগের পক্ষে নিবেদিকা

কোন ব্রতধারিণী।

স্বদেশি-তত্ত্ব

[চাবুকরাম চৌবে]

'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ বটে, স্বদেশ যে রে
তোদের নয়।'

স্বদেশী কে? যিনি স্বগ্রামের, স্বজেলার, স্বপ্রদেশের ও স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ চেষ্টা করেন তিনিই স্বদেশী। কলিকাতার স্বার্থের জন্য যিনি আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য যিনি কলিকাতার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং ভারতের কল্যাণ সাধনে যিনি বাঙ্গালার স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত, দেশহিতৈষী মাতৃভূমির সুসন্তান।

স্বদেশীর অনুরাগে শঠতা নাই, প্রেমে আবিলতা নাই, সেবায় স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই। স্বদেশীর জীবন তাহার বিলাস-সিদ্ধির জন্য নহে, জন্মভূমির কর্ম্মসাধনের নিমিত্ত। স্বদেশীর উদ্দেশ্য স্বদেশ, সাধন স্বদেশ, আরম্ভ স্বদেশ, পরিণতি স্বদেশ। স্বদেশ তাঁহার অস্থিমজ্জা, স্বদেশ তাঁহার প্রাণ, স্বদেশ তাঁহার ধ্যান ধারণা, স্বদেশ তাঁহার যোগসাধন।

স্বদেশকে যে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে, তাহার স্বতঃই ইচ্ছা হইবে, স্বদেশ-সেবা করিতে। যাহাতে স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে স্বদেশের কোনরূপ অকল্যাণ না হয়, যাহাতে স্বদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৃষি শিল্প-ধর্ম্ম-নীতি-বাণিজ্য-সম্পদ-সম্পন্ন ও যশো গৌরবে গৌরবান্বিত হয়, ইহাই স্বদেশ সেবকের কামনা, লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয়। কল্যাণ বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহা পরিণামে শুভফলপ্রসূ। রুগ্ন সন্তানের কল্যাণের জন্য জননীর যেমন যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও কাতরতা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য দেশহিতৈষীর তেমনই চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক। চিত্তবৃত্তি সংযত করিয়া ধীরভাবে বিচক্ষণতার সহিত সকল অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে, জন্মভূমির ভাবী মঙ্গল কি এবং তাহা কিরূপে সম্ভব।

ইংরাজ রাজ্য আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পর আমরা ইংরাজী পড়িয়া, ইংরাজের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের ধরণ করণ দেখিয়া, তাহাদের অনুকরণে স্বদেশ প্রেম বা পেট্রীয়টিজ্‌ম শিখিয়াছি। ইংরাজের ভাব ও ভাষা, শাসন প্রণালী ও আইন, নীতি ও সংসর্গ আমাদিগকে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচরণ শিক্ষা দিয়াছে। ফলে আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই, স্বরাজ দাবী কবি, রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করি, রাজপুরুষদিগের কার্য্য সমালোচনা করি। বিদেশী মাল বয়কট করি, ও স্বদেশী গ্রহণের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা করি। ইংরাজ গুরু হইয়া যাহা শিখাইয়াছেন, আমরা শিষ্য হইয়া তাহা শিখিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ ও রাজনৈতিক অধিকারভোগ ইংরাজ চরিত্রে রন্ধ্রগত। স্বদেশ প্রেম ইংরাজের অস্থিমজ্জা ও মেদমাংস ভেদ করিয়া শোণিতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ধার করা স্বদেশ-হিতৈষণার সাময়িক উত্তেজনা আমাদের স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব আমাদের আছে ভাব, কল্পনা ও ভাষা। তাহাদের আছে বেদনা, অনুভূতি ও ক্রিয়া। আমাদের আছে অভিনয়, তাহাদের আছে জীবনমরণ সমস্যা; আমাদের আছে স্বার্থসাধন, তাহাদের আছে স্বার্থত্যাগ; আমাদের আছে কপট প্রেম, তাহাদের আছে সহজ সরল প্রাণের টান; আমাদের আছে হুজুগ ও চীৎকার; তাহাদের আছে ধীরতা ও সুবিবেচনা; আমাদের আছে স্বদেশ সেবার নামে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বোদর পূরণ, তাহাদের আছে দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ ও সর্ব্বস্বত্যাগ। এই হেতু তাহারা প্রতি কার্য্যে কৃতকার্য্য, আমরা প্রতি পদে লাঞ্ছিত ও বিফল-মনোরথ।

আমাদের স্বদেশ প্রেম আদ্যন্ত পোষাকী ধরণের, কৃত্রিমতা দুষ্ট। সুতরাং আমাদের স্বদেশীর বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন হইয়াছে। স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত স্বদেশ প্রেমে মত্ত আমাদের আদি স্বদেশী করি, বীণাতানে

ঝঙ্কার দিয়াছিলো, 'বাজরে বীণা বাজ এই রবে।' এবং ইংরাজের অনুকরণে স্বাধীনতার উত্তেজনায় বীরদর্পে উদ্দীপনা-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন ঃ—

'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়!'

কিন্তু তিনি জানিতেন ইংরেজরাজ শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করিয়া এদেশকে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব তিনি মামলা মাথায় দিয়া ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণে যুক্ত করে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

আর এক স্বদেশী কবি আমাদের মির্জাফরকে ধিক্কার দিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে টিটকারী দিয়া ওজস্বিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন—

'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র-কিরণ!"

কিন্তু স্বয়ং আজীবন ঘৃণিত দাসত্বে বিবেক বিক্রয় করিয়া অন্তিমে আত্মজীবনীর শবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের সম্মুখে গুপ্ত ব্যাধি উদ্ঘাটন করিয়া অমর হইয়াছেন।

আমাদের আর একজন স্বদেশী কবি দাসত্বোপার্জ্জিত ঘৃতান্ন ভোজন করিতে করিতে কল্পনার ঘুমঘোরে সেতারে সুর বাঁধিয়া গাহিয়াছেন—"হেলায় লঙ্কা করিল জয়"। আমাদের স্বদেশী সাহিত্য সম্রাট সকলের গায় 'বন্দেমাতরম্' মনের লঙ্কার ঝাল ছিটাইয়া দিয়া স্বয়ং শ্যাম-অঙ্গে রায় বাহাদুরের চন্দন বিলেপন করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আমাদের শেষ স্বদেশী কবি সম্রাট্ ভক্তিভরে স্বদেশস্তোত্র গাহিয়াছিলেন—

'অয়ি ভুবণমনোমোহিনি! এবং

'প্রথমসামরব তব তপোবনে।'

এই অনুকরণযুগের বাঙ্গালী কবি এখন বলিয়া ধন্য হইয়াছেন —"The East is wedded to the west on the alter of humanity."

আমাদের বাক্যে ও কার্য্যে কত অন্তর।

আমরা ইংরাজী পড়িয়া সাহেব সাজিয়া করি সখের স্বদেশী মেলা*। ইংরাজেরা ও জীবিত দেশের লোকেরা তাহাদের ভাবে অবস্থার প্রেরণায় জীবন-সংগ্রামে জীবিকার উপায়ের নিমিত্ত উদ্ভাবন করিয়াছিল, 'শিল্প প্রর্দশনী মেলা', স্বদেশীর সামরিক উত্তেজনায় আমাদের বাগ্মী নেতাদিগের বক্তৃতায় চঞ্চল হইয়া আমরা স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে চারিদিকে দেখিতে পাই, কেবল সুবাসিত তৈল, এসেন্স, সাবান ও জীবন-বীমা কোম্পানী'। মুম্বাই অঞ্চলে লোকেরা বঙ্গভঙ্গের বহুপূর্ব্বে স্বদেশী করিয়া মোটা কাপড়ের কল করিয়া চীন ও জাপান হইতে অর্থ আনিতে শিখিয়াছিল। এখন আমাদের বাঙ্গালায়ও তাহারা বসনের জাল ফেলিয়া ধন ছাঁকিয়া লইতেছে, জীবন-সমস্যার প্রধান রহস্য লৌহ কারখানার যৌথ কারবারে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া ধনবান ও যশস্বী হইয়াছে। আমরা গড়িতেছি, কেবল পুতুলের ছাঁচ। স্বদেশের নামে অর্থ তুলিয়া আমরা রাতারাতি বড়মানুষ হইয়াছি। স্বদেশী যৌথ বাণিজ্যের হুজুগ তুলিয়া কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, ষ্টোর সাপ্লাই, ভাণ্ডার ও প্রভিডেন্ট ফান্ড আরও কত বহু বঙ্গের ছাতার ন্যায় বোগাস কোম্পানীর নামে বিধবার মুখের গ্রাস, দরিদ্রের কষ্টোপার্জ্জিত কড়ি কাড়িয়া লইয়া আমরা ত্রিতল অট্টালিকার বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় সুখে নিদ্রা যাইতেছি এবং মনে মনে ভাবিতেছি, আমরা কি চতুর।

আমাদের সকল স্বদেশী-চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ কি? আমরা রোগ না বুঝিয়া যে যাহা বলিতেছে, তাহাতেই নাচিয়া উঠিতেছি, আর ভাবিতেছি, মুক্তি বুঝি এই পথে। কেহ নামের ও যশের জন্য, কেহ স্বার্থসাধনের জন্য, কেহ শুধু 'একটা কিছু' করিবার জন্য, কেহ বা কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও বুদ্ধির

---

* সে স্বদেশী মেলায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটে, তাহার বিজ্ঞাপন ছাপা হয় বিলাতী কাগজে, সেখানে নহবত বাজে, বিলাতী দ্রব্যে প্রস্তুত করা এসেন্স তৈল, চাটনির নিত্য লীলা। সেখানে স্বদেশীপূত ম্যাজিক ও বায়োস্কোপ দেখান হয়, চা চুরুট বলে নানা ভেল্কী ও নানা রং বেরংয়ের কত আনন্দ, কত উচ্ছাস, কত কেলী। প্রকৃত 'স্বদেশী' নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে সে জন্য একটুও দুঃখ নাই, আনন্দের উচ্ছাসে সকলে বিভোর।

দোষে ভুল বুঝিয়া স্বদেশ-সেবার নামে যে হুজুগ তুলিয়া দিতেছে, আমরা তাহাতেই মাতিয়া তাহাদের যুক্তি ও উপদেশ নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতেছি। তাহারা চতুর, আপনা বাঁচাইতে জানে আমাদিগকে গাছে তুলিয়া দিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িতেছে এবং শেষকালে দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে পরামর্শ দিতেছে। আমরা মুর্খ! আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অতিকায় দৈত্যের সহিত বামনের বন্ধুত্ব হইলে যে পরিণাম, আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতেছে।

যাহারা নিজে অন্ধ, তাহারা নেতৃত্ব করিয়া অপরকে চালাইতে গেলে যে ফল হয়, যাহাদের উদ্দেশ্য সাধু নয়, তাহারা চালক হইলে যে পরিণাম হয়, যাহারা দায়িত্ববোধহীন, তাহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, যাহাদের সততা নাই, তাহাদের উপর সাধারণে নির্ভর করিলে দেশের যে দুর্গতি হইতে পারে, যাহারা স্বার্থের কীট, তাহারা স্বার্থত্যাগের ভাণ করিয়া স্বদেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে গেলে যাহা হওয়া উচিত, যাহারা বচন-সর্ব্বস্ব কর্ম্মে অপটু, তাহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া মোড়ল হইলে যে ফল আশা করা যাইতে পারে, এবং যাহারা কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের দাস, অপর দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি পড়িয়া আমাদের ভিন্ন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহার প্রয়োজন না বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে তৎপর, তাহাদের পতাকার নিম্নে মেষপালের ন্যায় দন্ডায়মান হইলে অদৃষ্টে যাহা হওয়া উচিত তাহা সকলই হইয়াছে। বুদ্ধিমানের নিকট আমাদের জয়ের আশা কোনদিনই ছিল না এবং এখনও নাই। আমাদের স্বদেশী উদ্যম ব্যর্থ হইবার কারণ কেবল 'necessary mental and technical equipment' এর অভাব নহে। আমাদের এ নিষ্ফলতা কৃতকার্য্যতার সোপান নহে। (failure is success in the embryonic stage–in a state of chrysalis)। আমাদের এ অকৃতকার্য্যতা জাতীয় আশা ভরসার সমাধি।

আমাদের যাঁহারা নেতা হইয়াছেন, আমরা নেতা না বলিলেও যাঁহারা আপনাদিগকে জননেতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কেহ নিঃস্বার্থভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বদেশী করেন কিনা, জানি না। কিন্তু স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে, তাহা হয় তাঁহারা ভাবেন নাই, অথবা ভাবিয়া ও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনার বশে কল্পনাবলে যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তাহারই করিতে যাইয়া তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয়কুলই হারাইয়াছেন। তাঁহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া যে ডাল ধরিয়াছেন, সে ডালই ভাঙ্গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, বিলাতী মাল বয়কট কর, আমাদের নান্যঃ পন্থা। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা কর। বিলাতী মাল ছুঁইও না, খাইও না, তাহার নামও করিও না, 'কালরূপ আর হেরব না"। কিন্তু তখন বিলাতী মালে আমাদের বাজার পরিপূর্ণ। আমাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি অনুযায়ী দ্রব্য আমাদের দেশে অল্পই জন্মিত। অতএব বয়কট করিয়া আমরা বহুদিনের অভ্যাস, প্রয়োজন ও রীতিনীতি হঠাৎ পরিবর্তন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। প্রকৃতি ও অবস্থার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলাম। নেতাদিগের যুক্তি, বয়কট করিলেই স্বদেশে আবশ্যকতানুযায়ী জিনিস প্রস্তুত হইবে। গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া না জুতিয়া তাঁহারা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুতিলেন। যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইল না। আমাদের প্রতিজ্ঞা জল বুদবুদের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইল। এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধী যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নহে, যাহারা প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল তাহারা। নেতৃগণ স্বয়ংই জনসাধারণের বহুপূর্ব্বে সখাত সলিলে ডুবিয়াছিলেন। আমাদের শিল্পী ও কারিগরগণ আসরে নামিয়া তাহাদের বন্ধু বণিকগণের সহযোগে স্বদেশী হুজুগে সদুপায়ে হউক অসদুপায়ে হউক, যত রাবিশ মাল চালাইয়া অর্থাগমের উপায় করিতে লাগিল। কাকের মাংস কাকে ভক্ষণ করিল। যে সকল দরিদ্রের একটী পয়সা জীবন মরণ, তাহাদের বুকের রক্ত শুকাইল বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া উল্টা প্রতিজ্ঞা করিল, 'নেড়া আর বেলতলায় যাইবে না।"

কেহ কেহ ধুয়া তুলিলেন—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেশে এই ধুয়া চলিতেছিল—টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ কর, বিলাতে আমেরিকায়, জাপানে অসংখ্য যুবক ছাত্রসেনা প্রেরণ কর। তাহারা লোহার কাজ শিখিয়া আসিবে, কলের কাজ শিখিয়া আসিবে, নানা কারখানার ফন্দীতে ও কাজে ওস্তাদ হইয়া আসিবে, তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে। দলে দলে আমাদের সোণার চাঁদেরা কেহ পড়িয়া কেহ বা না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া

লঘুক্লেশে গুরুলাভ বলিয়া বিজয় পতাকা উড়াইয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু এখন তাহাদিগের আহার যোগাইবে কে? আমাদের যৌথ কারবার ও স্বদেশী কারখানা সকল সততা অভাবে আত্মকলহে, প্রভুত্বের প্রলোভনে ও হঠকারিতায় মাটী হইয়া গেল অতি লোভে তাতি নষ্ট। আমাদের টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা ষাঁড়ের গোবর লইয়া উদারান্নের জন্য এখন সাহেবী কোম্পানির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কেহ বলিলেন, তোমাদের বসন-ভূষণ তোমরা প্রস্তুত কর, লজ্জা নিবারণের জন্য পরের দ্বারস্থ হইও না। আমরা তাহাই বুঝিয়া একবেলা উপবাস করিয়া কষ্টে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমাদের স্থূলোদর হিতৈষীদিগের হস্তে সঁপিয়া দিলাম। বুঝিলাম না, পরিণাম কি? আমাদের দেশে বিদেশীয়েরা চটের কল করিয়া রাজা হইয়া গেল, আর আমরা কাপড়ের কল করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম! আমরা মুম্বাই হইতে তূলা আনিয়া বাঙ্গালায় কাপড়ের কল করিয়া লাভবান হইব, বক্তৃতার দেশে এ আশা দুরাশা। থাকিত যদি আমাদের সেই সততা, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেই দায়িত্ববোধ, আমরাও মানুষ হইতাম। আমরাও মুখ উঁচু করিয়া আজ বলতে পারিতাম, 'আমরা স্বদেশী'। আমরা পরের ধন হাতে পাইলে লোষ্ট্রবৎ মনে করি—তখন আমাদের নিকট 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই জন্যই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না। যে কারণে অপরকে সমালোচনা করি, সেই কারণ উপস্থিত হইলে নিজেও আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের যৌথ কারবার টিকিতে পারে না। আমাদের অতিবুদ্ধি সম্মিলিত ব্যবসায়ের প্রধান পরিপন্থী।

আমরা স্বদেশী করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইবে, আমাদের ধনাগমের পথ খুলিয়া যাইবে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে লাভবান হইল পাঞ্জাব, মুম্বই, ইয়ুল কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানীর, এলগিন-মিল, লালইমলী প্রভৃতি এবং কিছু পরিমাণে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। আমরা বঙ্গবাসী স্বদেশী নেশায় বিভোর হইয়া বোতাম, পেন, নিব, পুতুল, ছবি, মোজা, গেঞ্জি, মোমবাতি, এসেন্স, সাবান ও সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনতার ও শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছি। যে কাজে আয়াস নাই, মূলধনের আবশ্যকতা নাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহাতে খুব তৎপর। এমন আরাম-প্রিয়, শ্রমবিমুখ, সততাশূন্য, চরিত্রহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত, কুটিলমতি, পরশ্রীকাতর, হিংসুক জাতি স্বর্গে গেলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। মেকলের গালি শুনিয়া আমার চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, ইংরাজের প্রতি রোষ জন্মে। কিন্তু আমরা যদি মানুষ হইতে পারি, শত মেকলে শতমুখে আমাদের প্রশংসা করিবে। আমাদের স্বদেশী কবিও কি আমাদের চরিত্র দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে বলেন নাই—

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি?

স্বদেশী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, আমাদের সকল উদ্যম নষ্ট হইবার কারণ আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা। সভাসমিতি বল, শিল্প বাণিজ্য বল, জ্ঞানচর্চা বল, সকলের মূলে জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক বল, জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমষ্টি গঠন করতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে যদি মানুষ হই, লোকে আমাদিগকে মানুষ বলিবে, আমাদিগের স্বজাতি মানুষের জাতি বলিয়া জগতের জনসমাজে গণ্য হইবে। আমাদের যদি সৎসাহস থাকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শঠতা-কপটতার প্রতি ঘৃণা থাকে, শ্রমবল, বুদ্ধিবল ও জ্ঞানবল থাকে, একতা ও স্বদেশপ্রেম থাকে, চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে, বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে, ধৈর্য্য, বিচার ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকে, আমরাও মানুষ, আমরাও জাতি, আমরাও দশজনের একজন হইব। আমাদের নামেও বাহবা পড়িবে, আমাদের জয় জয় কার ও দশের মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

প্রকৃত স্বদেশী তাঁহারা, যাঁহারা ধান, যব, তিল, কলাই, আলু, মূলা, কচুর চাষ অপেক্ষা মানুষ-চাষে অধিক মনোনিবেশ করেন। আমাদের এ আন্দোলনে প্রকৃত স্বদেশী ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, লর্ড হার্ডিং ও কারমাইকেল, মাননীয় গোখেলে ও সার আশুতোষ, যাঁহারা লোকশিক্ষার বিধান করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার হইলে, দেশে মানুষ প্রস্তুত হইলে, গ্রীসের ন্যায় পাথরের দেশে, ইংল্যান্ডের ন্যায় কয়লার রাজ্যে, আমেরিকার ন্যায় মহারণ্যেও সোণা ফলিতে

পারে। দেশে মানুষ থাকিলে তাহারা যাহাতে হাত দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবে, জঙ্গলে মঙ্গল হইবে, ছাই মুষ্টি ধরিলে তাহা সোণা মুষ্টি হইবে। আমাদের নরনারী যে দিন এক এক জন এক একটী বীর বা বীরপত্নী হইবেন, সেদিন আমাদের গৃহে গৃহে আবার রাজপুতনার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। একজন গারিবল্ডী, একজন ওয়াশিংটন, একজন নেপোলিয়ন, একজন অশোক, একজন সেকেন্দার, একজন বুদ্ধ, একজন মহম্মদ, একজন সেক্সপিয়র, একজন কালিদাস, একজন হোমার, একজন বাল্মীকি, একজন গেটে,একজন দাঁতে, একজন ভল্‌তেয়ার, একজন নিউটন, একজন এডিসন যে জাতি প্রস্তুত করিতে পারে, সে জাতি ধন্য, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। তবে আমাদের দেশের বালবৃদ্ধযুবা পুরুষরমণী একমন একপ্রাণ হইয়া সেই স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিবেন, যাহাতে গৃহে গৃহে মানুষ প্রস্তুত হইবে? ভেজালের জঞ্জালে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইল। চটকে ভুলিয়া, মোহে মজিয়া সময় নষ্ট করিবার আর অবসর নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জনসাধারণ সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে আপন আপন গৃহে শিশু-বালক-যুবকদিগের সুশিক্ষার বিধান করিয়া মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিলে যথার্থ স্বদেশসেবা করা হইবে, স্বদেশের কল্যাণ হইবে। ইহারই নাম আসল স্বদেশী। যতদিন সকল হুজুগ ও বৃথা আন্দোলন ত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রকৃত স্বদেশী অনুষ্ঠিত না হইবে, ততদিন

বাবুই তোর মিছে আশা,
ঘর থুইয়ে বনে বাসা।

শ্রী চাবুকরাম চৌবে

(নব্যভারত, আশ্বিন ১৩১৯)

স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কৈকেয়ী রাণী মন্থরার প্ররোচনায় দুইটি বর চাহিয়াছিলেন; এক বরে (নন্দিগ্রামপ্রবাসী) ভরতেরে করিব দণ্ডধর, আর বরে (অযোধ্যাবাসী) রামচন্দ্র হবে বনচর। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুরের হালের দুই একটা ব্যবস্থায়, ত্রেতা যুগের কতক কতক কথা মনে পড়ে। তাঁহারা সম্প্রতি, কাহার প্ররোচনায় জানি না, দুইখানি সার্কুলার জারী করিয়াছেন। একখানিতে মফস্বলবাসী শিক্ষকগণকে দণ্ডধর (special constable) নিয়োগের প্রস্তাব, অপরখানিতে সহরবাসী কতকগুলি ছাত্রের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের আজ্ঞা। ছাত্রগণের অপরাধ, তাহারা নাকি পলিটিক্স্ ঘাঁটাইয়াছে; আর নিরীহ শিক্ষকগণের অপরাধ, —এই সব ছাত্রদিগের শিক্ষার ভার তাঁহাদিগের হাতে।

কোনও একটা নূতন বস্তু সম্মুখে পাইলে, বৈজ্ঞানিক তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার প্রয়াসী হয়েন। পলিটিক্স্ জিনিসটাকে ঠিক নূতন বলা যায় না। ইহা বহুকাল হইতে আছে। কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কোন্টা পলিটিক্স, কোনটা পলিটিক্স্ নহে, ইহা স্থির করা শক্ত। কথাটার কেহ রাজনীতি, কেহ রাষ্ট্রনীতি বলিয়া অনুবাদ করেন, কিন্তু ইহা ত অনুবাদ; অনুবাদে জিনিষটার নিদান কি, তাহা বুঝা যায় না। একবার এক জন ছাত্র, আর এক জন ছাত্রকে শালা বলিয়া গালি দিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের নিকট নালিশ হইয়াছিল। সাহেব গালিটার ইংরাজীতে অর্থ জানিতে চাহিলে, ছাত্র বলিয়াছিল, —"এ গালির তর্জ্জমা করিলে ইহার (force) জোর থাকে না। আমাদের দেশে পলিটিক্স্ শব্দেরও এইরূপ তর্জ্জমা চলে না। এক জন য়ুরোপীয় সমালোচক, গ্রীক্-দৃশ্য-কাব্যপ্রণেতা Aeschylau এর মাহাত্ম্য বুঝাইতে গিয়া তাঁহার কাব্যগুলিকে untranslatable (অনুবাদের অসাধ্য বলিয়াছেন; politics মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও সে কথা বলিতে ইচ্ছা করে। আলঙ্কারিকের পরিভাষায় শব্দটি পরিবৃত্ত্যসহ। একটা উদাহরণ দিই আমাদের ছাত্রজীবনে, ইল্‌বার্ট-বিল লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল সাহেব মেম ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী হইলে, এদেশের হাকিম তাহার বিচার করিতে পাইবে কি না, ইহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কথাটা অতি সহজ, আইন ও আইনগত অধিকার লইয়া। কিন্তু এদেশের জল-বায়ুর দোষে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে, বিষয়টা অনতিবিলম্বেই পলিটিক্স্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আবার আজ কাল স্বদেশী আন্দোলন হইয়া নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—ইহা পলিটিক্স্ কি না? দেশের লোক দেশের শিল্পীর প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে, বিদেশী জিনিস কিনিয়া বিদেশীর পায়ে অজস্র টাকা ঢালিয়া দেশটাকে দিন দিন নিঃস্ব করিয়া তুলিবে না; ইহারই নাম স্বদেশী-আন্দোলন। কথাটা অত্যন্ত সোজা। পলিটিক্স্ বলিলে সহজবুদ্ধিতে লোকে যাহা বুঝে, ইহা ত তাহার ত্রিসীমানায়ও আসে না। এটা অর্থনীতির কথা, বড় জোর রাজনীতির কথা, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির নহে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের ঘোষণা অন্যরূপ। লোকে দেখিয়া শেখে, এবং ঠেকিয়া শেখে। আমরাও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহাতে বিজেতা জাতির স্বার্থের সহিত বিজিত জাতির স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ অপরিহার্য্য, এবং সে সঙ্ঘর্ষে বিজেতা জাতির স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, তাহাই ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে পলিটিক্স্ আখ্যা লাভ করে। ইহার অভিধানসম্মত (definition) সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, আমাদের দেশে ইহার অর্থ এইরূপ। বিশ্বকোষ-কার এই বিশুদ্ধ সংজ্ঞাটি লইতে প্রস্তুত আছেন কি?

সংক্ষেপে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝাইয়াছি। দেশের লোকে যাহাতে দেশের টাকা দেশেই রাখে, বিদেশী জাহাজ বোঝাই জিনিসের পরিবর্ত্তে, জাহাজ বোঝাই করিয়া টাকার রাশি বিদেশে না পাঠায়, সেই

কথাটা কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি কিছু দিন হইতে দেশের আপামর সাধারণকে বুঝাইতেছেন। উদ্যমশীল ছাত্রগণ যৌবনসুলভ উৎসাহবশতঃ এ কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দেশের ইতর ভদ্র সকলের মধ্যে কথাটা লইয়া তোলাপাড়া হইতেছে। অনেকেই দেশের হিত বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যথাসাধ্য স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিব।" সভাসমিতি বক্তৃতা প্রবন্ধ দ্বারা, দেশের লোকের মতি-গতি ফিরাইবার চেষ্টা হইতেছে, অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ করিয়া লোককে সুপথে আনিবার চেষ্টা হইতেছে। শেষোক্ত কার্য্যে নাকি ছাত্রগণই অগ্রণী। ইহার জন্য এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও বেআইনী কাজ করা হয় নাই, করিবার প্রয়োজনও নাই। করিলে তাহার দণ্ডও হাতে হাতে হইবে, ইংরাজ গভর্মেন্ট ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্র নহেন।

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াই লওয়া যায় যে, ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহা হইলে সে কাজটাই কি অত্যন্ত গর্হিত? উপন্যাসে পড়িয়াছি বটে, এক জনকে এক-শ-কুঠারি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতে অনুমতি দিয়া, সেই সঙ্গে বলিয়া রাখা হইয়াছিল, আর সকল কুঠারি ইচ্ছামত খুলিতে পার, কিন্তু একটি কুঠারি খুলিও না, খুলিলেই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ছাত্রগণের পক্ষে রাজনীতি দেখিতেছি সেই নিষিদ্ধ কুঠারির ন্যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রগণ যোগ দিলেই যে 'ভাগবত অশুদ্ধ হইল, আমাদের ত এরূপ বিবেচনা হয় না। তাহাদিগের চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য, তাহারা যাহাতে মানুষ হয় এই জন্য, ক্ল্যাসের পড়া মুখস্থ করা ছাড়া, তাহাদিগের আরও অনেক ভাবে মানসিক শক্তির নিয়োগ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগের তর্ক-সভা, বক্তৃতা-সভা প্রভৃতি আছে। সেগুলিকে এ যাবৎ কর্ত্তৃপক্ষ উৎসাহ দিয়াই আসিতেছেন। এই সকল সভায় সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। ইংরেজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়সংযুক্ত এই সকল ক্লাবে গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি মহাত্মা ছাত্রজীবনে বাগ্মিতা অভ্যাস করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। আমাদের দেশে তাহার অনুকরণ কি দোষাবহ? অবশ্য সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। ছাত্রেরা ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাতে কিছুই অন্যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি প্রবল উৎসাহে ঘরে আসিয়া শালগ্রাম শিলা ছুঁড়িয়া ফেলে, বা ঘরের বর্ষীয়সী মহিলাগণের বিধবা বিবাহ দিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে অবশ্য তাহা কাহারও চক্ষে ভাল লাগিবে না। সেইরূপ, ছাত্রেরা যদি রাজনীতির হুজুগে পড়িয়া দেশময় বিপ্লব উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে বাড়াবাড়ির সকলেই নিন্দা করিবে। কিন্তু আমাদের ছাত্রগণ, রুসিয়া, জার্ম্মানী, ফ্র্যান্স প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণের ন্যায় রাজবিপ্লব ঘটায় নাই, ঘটাইবেও না। ছাত্রগণ রাস্তায় রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইলেই ইংরেজ-রাজত্ব টলমল করিবে, সরকার বাহাদুরের কি শাসনদণ্ড এতই দুর্ব্বল! এই দুর্ব্বলতার জন্যই কি আমাদের ছোটলাট সাহেব একা গোটা বাঙ্গলা দেশটা শাসন করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াছিলেন!

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"। সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা, স্কুল কলেজের ছাত্রবর্গ ধীর ও শান্তশিষ্ট হইয়া ক্ল্যাসের পড়া মুখস্থ করিবে। দেশে ভাবের প্রবল বন্যাই ছুটুক, আর দেশের আকাশে ঝঞ্ঝাবাতই বহুক, অথবা প্রলয়ের মেঘই উঠুক, কিংবা উদ্দীপনার অগ্নিশিখাই জ্বলিয়া উঠুক, ছাত্রগণ হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচলভাবে যোগাসনে বসিয়া নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া স্বকার্য-সাধনে রত থাকিবে। তাহাদের বিদ্যার জ্যোতি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত জ্বলিবে। আশে পাশে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, সে সংবাদে তাহাদের প্রয়োজন কি? বাইবেলে পড়িয়াছি য়িহুদীজাতির উপর জীহোবার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল; তাই যখন যীহোবার ক্রোধে সমগ্র মিশর দেশে শিলাবৃষ্টি ও অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন য়িহুদীজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত গোষেন নামক প্রদেশে নির্ম্মল আকাশ ও প্রসন্ন রৌদ্র ছিল। ছাত্রগণের প্রতিও সরকার বাহাদুরের অপার করুণা, তাই তাঁহাদের ছাত্রদিগের হৃদয়-আকাশ দেশের এমন দিনেও নির্ম্মল ও প্রফুল্ল রাখিতে চাহেন। যীহোবার অলৌকিক ক্ষমতায় আর এক স্থানে আর একটি অত্যদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। যখন সমুদয় প্রান্তর শিশিরসিক্ত, তখন এক খণ্ড মেষলোম সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল। সরকার বাহাদুরেরও ইচ্ছা, ছাত্রগণের হৃদয়ক্ষেত্র ঐ মেষলোমের ন্যায় শুষ্ক থাকে; স্বদেশপ্রেমের অশ্রুকণা তাহাদের হৃদয় আর্দ্র না করে। তবে এটা হিন্দুর দেশ, বাইবেল-বর্ণিত অলৌকিক ব্যাপার এখানে বড় ঘটে না। আমাদের

শাস্ত্রে আছে, পরমযোগী মহাদেবেরও দুইবার চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল। একবার দক্ষযজ্ঞে দেবাদিদেব মহাদেবকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইলে, তিনি সতীর অবমাননায় যজ্ঞধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আর একবার কামনার পূর্ণমূর্ত্তি কন্দর্পের বিলাসহাস্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ধীরচিত্ত ছাত্রগণেরও দুইবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। একবার বঙ্গদেশ ছাঁটিয়া বাঙ্গালাবিভাগ গড়াতে মাতৃভূমির অবমাননায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। আর একবার বিলাতী বণিকের বিলাসোপকরণ সিগারেটের রাশি সজ্জিত দেখিয়া তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। এ উত্তেজনা স্বাভাবিক, ইহা রোধ করা উঁশ্মপ্রধান বৃদ্ধেরও অসাধ্য, উষ্ণশোণিত যুবকগণের ত কথাই নাই। একটা কিংবদন্তী আছে, "পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভূমিকম্প হইলেও কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। কেন না কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর আছে।" কর্ত্তৃপক্ষেরও সেইরূপ ধারণা, সমস্ত বঙ্গসমাজ আলোড়িত হইলেও ছাত্রদিগের হৃদয় স্পন্দন অনুভব করিবে না, কেন না, তাহারা পেড্লার সাহেবের ত্রিশূলের উপর আছে। এই ত্রিশূলের এক ফলা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক ফলা শিক্ষাবিভাগ (department fo public instrticen), তৃতীয় ফলা পাঠ্যনির্ব্বাচনসমিতি Text-book committee রূপে বিরাজমান। ত বে এ কলিকাল কি না, তাই কাশীতেও ভূমিকম্পের কথা শুনি। আমাদের শাসনতন্ত্রেও ঘোর কলির প্রকোপ, তাই ছাত্রদিগের হৃদয়ও উদ্বেজিত হইয়া পড়িয়াছে!

এরূপ জাতীয় আন্দোলনের দিনে যদি ছাত্রগণ কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা হইলেও কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে সহানুভূতিপূর্ণ মৃদু ভর্ৎসনাই প্রযোজ্য। যদি সত্য সত্যই কোনও বে-আইনী কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও school boy freak বালকসুলভ চপলতা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। কর্ত্তৃপক্ষ কথায় কথায় আমাদের দেশের ছাত্রবর্গের অবিনয়ের কথা তোলেন। তাঁহাদের নিজের দেশের ছাত্রবর্গের মতিগতির কথা আমরা জানি না, এমন নহে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহাদের দেশের মদ্যমাংসাশী ছাত্রগণ যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ষণ্ডামি (school boy freak) র পরিচয় দেয়, শাক-মাছ-ভোজী বাঙ্গালীর ছেলে তাহার তুলনায় নিষ্পাপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও রুসীয় ছাত্রগণ তত্তৎ দেশে রাজবিপ্লব পর্য্যন্ত সংঘটিত করেছে, তাহার কি সরকার বাহাদুর খবর রাখেন না? আমরা তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, ষন্ডামি ও বিদ্রোহিভাব এ দেশের ছাত্রদিগের পক্ষে অসম্ভব। তঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। বালকসুলভ চপলতা দেখিয়া একটা প্রলয়কাণ্ডের আশঙ্কা করিবেন না। মশা মারিতে কামান পাতার উদ্যোগ করিয়া সাধারণের উপহাসাস্পদ হইবেন না।

আমাদের বেশ মনে আছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ছাত্রাবস্থায় ঠিক এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ইলবার্ট-বিলের আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের জেল, এই দুই ব্যাপারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের জেল হওয়াতে দেশের আপামর বিচলিত হইয়াছিল, নগরে নগরে সভাসমিতি বসিয়াছিল, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ, এমন কি, সরকারী কর্ম্মচারিগণ সেই সকল সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সে সময়ে খুলনা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটা (Student Case) ছাত্রঘটিত মোকদ্দমাও হইয়াছিল। অবশ্য তথাকথিত পলিটিক্সের সঙ্গে এই সমস্ত মোকদ্দমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। বলা বাহুল্য, সে সময়েও সরকার বাহাদুর ছাত্রদিগের অবিনয়ের কথা তুলিয়া শিক্ষাবিভাগে ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষা-দানের ব্যবস্থার জন্য সার্কুলার জারী করেন। জুলুমবাজ পুলিশের কারসাজিতে ছাত্রগণ হায়রান পের্শান হইতেও ত্রুটি হয় নাই। যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয়, সে সময়ে, সরকারী কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ ও সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার ছাত্রদিগের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, এবং সরকার বাহাদুর ছাত্রদিগকে শাস্তি দিবার জন্য শিক্ষাবিভাগে কোনও সার্কুলার জারি করেন নাই। তখন রীপণের রামরাজত্ব। যে সকল পুলিশকর্ম্মচারী ছাত্রদিগকে অনর্থক জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের যথোচিত শাস্তি হইয়াছিল।

সরকার বাহাদুর বলেন, এ সমস্ত ব্যাপারে যোগ দিলে ছাত্রগণের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে। কোনও কোনও বিজ্ঞ অভিভাবক ও শিক্ষক এ কথায় সায় দেন। অবশ্য, সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া

করে, নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে, ইত্যাদি অনেক কথা শিশুশিক্ষায় লেখে বটে। কিন্তু উপরওয়ালাদের কি সত্য সত্যই ধারণা যে, ছাত্রগণ এই আন্দোলনের পূর্ব্বে শিশুশিক্ষার উপদেশ-অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছিল? আজ হুজুগে পড়িয়া তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে? বস্তুতঃ ছাত্রগণ পূর্ব্বে বাজে কাজে বাজে গল্পে অনেক সময় নষ্ট করিত। রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শন বা নিজেরাই সখের অভিনেতার দলগঠন, খেলাধূলা, সভায় অধিষ্ঠান প্রভৃতি নানা খেয়ালে ব্যাপৃত থাকিত, সর্ব্বক্ষণ নোট মুখস্থ করিত না। এই ভাবে তাহাদের যে সময়টা নষ্ট হইত, এখন সেই সময়টা দেশের কাজে দিতেছে। ইহাতে লাভ বই লোকসান ত দেখি না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় যে আন্দোলনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে যোগদান করিয়া সে বৎসর কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ছাত্রগণ পরীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় নাই; এফ.এ.ক্ল্যাসের যে সকল ছাত্র দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহারা সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল!

পদ্যপাঠে পড়িয়াছি "সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।" কিন্তু সেটা কিরূপ বিদ্যা? সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বহু পুস্তক পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়, জানি। কিন্তু ছাত্রগণ এইভাবে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হস্তপদবিশিষ্ট বিশ্বকোষে পরিণত হইলেই কি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? সাহিত্য, মনুষ্য-জীবন ও সমাজের সহিত নিত্যসম্বন্ধ; সাহিত্য পাঠ করিয়া মানবজীবনের জটিলসমস্যা ও মানবহৃদয়ের অনন্ত ভাবলীলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, পাঠকের হৃদয়ে উদার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, মহৎ ও পবিত্র উদ্দীপনার আবির্ভাব হইলে, সাহিত্যপাঠের প্রকৃত ফল হয়। সুধু গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্ত, গ্রন্থ প্রণয়নের সন তারিখ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকগণের মতামত, ব্যাখ্যা ও পদপরিবর্ত্তন জানার নাম সাহিত্য-পাঠ নহে। ভূগোল পড়িয়া গোটাকতক দেশের নাম মুখস্থ করিয়া অথবা বড় জোর পৃথিবীর কোথায় কোন্ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, কোন্ দেশের গাছপালা কিরূপ, জীবজন্তু কিরূপ, আব হাওয়া কিরূপ, ইত্যাদি জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে না পারিলে ভূগোলপাঠের প্রকৃত ফল হয় না। ইতিহাস পাঠ করিয়া গোটাকতক যুদ্ধের সন তারিখ ও ফৌজ-সংখ্যা মনে রাখিলে তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস-জ্ঞান বলা যায় না। অতীতের ঘটনাবলি হইতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভেই ইতিহাসপাঠের প্রকৃত ফল হয়। এইরূপ অর্থনীতি ও রসায়ন প্রভৃতি পাঠ করিয়া কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলে ঐ ঐ বিষয়পাঠের প্রকৃত ফল হয় না। অধীত বিদ্যায় ব্যবহার শিখিতে হইবে, সেই শক্তি দেশের কাজে লাগাইতে হইবে, তাহাই হইল প্রকৃত শিক্ষা। স্বদেশী আন্দোলনে যদি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকে, দেশের লোকের সুখ দুঃখের দিকে ছাত্রগণের মন ফিরে, তাহাতে কি প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় হইবে?

ক্যাপিটালের মিষ্টার ম্যাক্স্ না কি আমাদের পরম বন্ধু। যাহাতে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, দেশেই দেশের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, এবং এই উপায়ে সাধারণের অভাবমোচন ও দেশের ঘনবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অনেক সুপরামর্শ দিতেছেন। আমাদিগকে কুমীরের চাম্‌ড়া, বাঘের নখ, শজারুর কাঁটা, নারকেলের ছোব্‌ড়া প্রভৃতি হরেকরকম নূতন বাণিজ্যদ্রব্যের রপ্তানি করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সুধু তাঁহার কেন, উদারচেতা ইংরেজমাত্রেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমরা বিলাতী জিনিস 'বয়কট্' করার যে ধুয়া তুলিয়াছি, তাহাতে সুবুদ্ধি ম্যাক্স সাহেব হাসিতেছেন, এবং এ কার্য্যটা নিতান্ত গর্হিত, ইহাও বুঝাইতে ছাড়িতেছেন না। আমরা কিন্তু এই প্রভেদটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না আমরা ত বুঝি, স্বদেশী দ্রব্য চালাইবার চেষ্টা ও বিলাতী বা বিদেশী দ্রব্য বন্ধ করিবার চেষ্টা, একই বিষয়ের দুইটা দিক্; ইহার একটা ধরিলে অপরটা ছাড়িবার যো নাই, বস্তু ও ছায়ার ন্যায়, কুব্জ ও ন্যুব্জ ভাগের ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন। ঈশপের গল্পে পড়িয়াছিলাম, এ ঘোড়াওয়ালা এক জনকে ঘোড়া ভাড়া দিয়াছিল; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাড়া লইয়াছিল, সে যখন ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে গেল, তখন তাহাকে বারণ করিল; কেন না, সে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছে, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দেয় নাই। ম্যাক্স সাহেবের কথাও এইরূপ। স্বদেশী দ্রব্যের কাট্‌তি হউক, কিন্তু বিলাতী জিনিস 'বয়কট্' করার কথা মুখে আনিও না। বিদেশী

জিনিস বন্ধ না করিলে কিরূপে স্বদেশী জিনিসের ঘাট্‌তি হইতে পারে, এ সমস্যা আমরা ত সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রত্যেক গৃহস্থই কি দুই প্রস্থ করিয়া জিনিস কিনিবে, একপ্রস্থ স্বদেশী—স্বদেশপ্রেমের খাতিরে, আর এক প্রস্থ বিলাতী—রাজভক্তির অভিনয় করিবার জন্য? না, তাহারা বিলাতী জিনিস কিনিয়া রাখিবে; এবং যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে বাজী না পোড়াইয়া সেইগুলির অগ্নিসৎকার করিবে? ম্যাক্‌স্ সাহেব হাজার হোক ইংরেজ, তাই বিলাতী জিনিসের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। কিন্তু ধীরভাবে প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গেলে বিদেশী পরিহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এই উপায়ে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নত করা হইয়াছে। তবে যে সকল দেশে সেই উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের ব্যবহারকারীদিগের ও আমদানীকারী মহাজনদিগের উপর যেরূপ দৌরাত্ম্য করা হইয়াছিল, এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই। তবুও আমরা সরকার বাহাদুরের বিরাগভাজন হইয়াছে।

যে সকল জিনিস আপাততঃ এ দেশে প্রস্তুত হয় না, সে সম্বন্ধে এই বিদেশীপরিহারনীতি অবলম্বিত হইবে কি না, ইহা এক্ষণে জিজ্ঞাস্য। জিনিসটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে সে জিনিসটা যতক্ষণ এ দেশে প্রস্তুত হইবে না, ততক্ষণ বরং তাহা ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিব, তথাপি বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা প্রশংসনীয়। অনেক সভ্য দেশ এরূপ পণ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের বেলায়ও যদি এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ত সে আরও উত্তম। তবে যে স্থলে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সে স্থলে জাপানী মাল লইব, কি বিলাতী মাল লইব, য়ুরোপের মাল লইব, কি অন্যান্য দেশের বা মার্কিন মুল্লুকের মাল লইব, ইহা লইয়া একটা তর্ক উঠিতে পারে। বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা হয় ত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "যেটা সস্তা ও টেকসই সেইটাই লইব, তার কে জানে মার্কিন, কে জানে জাপানী, আর কে জানে বিলাতী।" অনেকে নাকি কোট ধরিয়াছেন, "যেখানে স্বদেশী মাল পাইব না, সেখানে জাপানী মাল লইব, জাপানী না পাইলে মার্কিন লইব, জার্ম্মাণ লইব, তথাপি বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।" কথাটা বড় কর্কশ শুনায়; হাজার হউক, আমরা ইংরেজের মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিলাতী মাল ছাঁটিয়া ফেলিয়া অন্য বিদেশী মালের দিকে ঝুঁকিলে ইংরেজের প্রতি যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবজ্ঞা বা বিরাগ দেখান হয়। কিন্তু এ দোষটা কি একা আমাদের? ইহা কি সত্য নহে যে, ইংরেজের মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশে ভারতীয় শ্রমজীবীকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় না। দেওয়া হইলেও, নানাপ্রকারে তথার বসবাসের রাজনৈতিক-অধিকার-সঙ্কোচ করা হয়, এবং তাহাকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়? শুনিয়াছি ক্রিকেট-বীর রণজিৎসিংজীকে অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইবার সময় তথাকার গবর্মেন্ট তাঁহার বিশেষ খাতির করিয়া উক্ত আইন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রবেশের অধিকার দেন। যখন বিশাল ইংরেজসাম্রাজ্যে পূর্ব হইতেই এরূপ অসমদর্শিতা আছে, তখন আজ ভারতবাসী যদি ইহার অনুকরণ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহাকে দোষ দাও কি বলিয়া? ইহা ছাড়া এ দেশের শিল্প উৎসন্ন দিতে স্বার্থপর ইংরেজবণিক যেরূপ বিধিমত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা মনে করিলে হৃদয় অবশ্য ইংরেজবাৎসল্য রসে পুরিয়া উঠে না।

শত্রুপক্ষ বলিবেন, কথাটা ঢাকা দাও কেন? বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতক্রোধ হইয়া ইংরেজজাতির অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। স্বীকার করিলাম যে, বিলাতী-বর্জ্জনের মূলে একটু অভিমানের কথা আছে। ভারতসাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা যখন সমগ্র বাঙ্গালীজাতির শত শত আবেদন ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চরণে ঠেলিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও বাঙ্গালীর মর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, বিশাল ইংরেজজাতি যখন কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হেলাইয়াও ইহার প্রতি বিধান করিলেন না, আমরা অক্ষম জাতি বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, তখন বাঙ্গালীও দেখাইতে ছাড়িবে কেন যে, এই ক্রন্দনপ্রিয় বাক্‌সর্বস্ব ভীরু দুর্বল জাতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়ের খর্ব্বতা, আর্থিক ক্ষতি ও শ্রমের লাঘব কিঞ্চিৎপরিমাণেও করিতে সমর্থ? কথামালায় পড়িয়াছি, একদা এক সিংহ জালে পড়িয়াছিল, সামান্য একটা মূষিক তাহার জাল কাটিয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। আজ স্বল্পপ্রাণ বাঙ্গালী-মূষিক, বৃটিশ কেশরী তাহার চতুর্দ্দিকে যে বাণিজ্যের বেড়াজাল ছড়াইয়া

রাখিয়াছেন, তাহা ছেদন করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। দেখা যাউক, ক্ষুদ্র দন্তের কত ধার? ইহাকে ইংরাজদ্রোহ বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা রাজদ্রোহ নহে। আইনের কূটতর্কে, শাসননীতির ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া, এই পরাধীন অপ্রত্যাশী জাতির উপর রাজদ্রোহের অপবাদ আনিও না। ইংরেজের বাণিজ্যনীতির প্রভাবে আমাদের তাঁতীকুল বহুদিন হইল নির্ম্মূল হইয়াছে, এখন আবার শাসননীতির কঠোর বিধানে আমাদের বৈষ্ণবকুলও যায়, নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া যে আমাদের একটা সুনাম ছিল, তাহাও যে আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারের সহিত এই স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নহে। অনেক দিন হইতে ইহার সূচনা হইতেছে। এদেশে কন্‌গ্রেস্ স্থাপিত হইবার পর হইতে নানা ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালাদিগের নজর পড়িয়াছে। স্বর্গীয় ডিগ্‌বীর Prosperous India, মহাত্মা দাদাভাই নওরোজীর Un-british Rule in India ইত্যাদি গ্রন্থে ভারতের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ সকল পুস্তকে home chartes প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রাজনীতির কথা। কিছু দিন হইল মিঃ উইলরাম গঙ্গারাম কলিকাতায় আসিয়া স্বদেশী-শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দেন, এবং ইংরাজীতে উদ্দীপনাপূর্ণ গান রচনা করিয়া ছাত্রমহলে প্রচার করেন। তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। ইহা ছাড়া চিন্তাশীল কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষিতসম্প্রদায়কে অনর্থক রাজনীতিচর্চ্চা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণজ্বর উৎপাদন না করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে যে সকল কাজ আমরা নিজে হাতে করিতে পারি, তাহা করিতে পরামর্শ দিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন। পলিটিকস্-চর্চ্চা করিয়া দূরে থাকুক, ইনি পলিটিক্‌স্ পরিহার করিতেই পরামর্শ দেন, এবং তজ্জন্য তথাকথিত patriot দেশহৈষীদিগের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে নূতন করিয়া সেই কথাটিই উঠিয়াছে। যখন দেখা যাইতেছে, সহস্র চীৎকারে ও ফূৎকারে আমরা দেশের শাসননীতি বদলাইতে পারিব না, যখন এ দেশে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, আমাদের নাড়াবনে কীর্তন করিয়া কোনও ফলোদয় হইবে না, তখন সে পথ ছাড়িয়া যাহাতে আমাদের ক্ষমতায় যাহা আছে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, ও সেই উপায়ে দেশের আর্থিক-স্বচ্ছলতা-বিধান, সামাজিক নানারূপ হিতকর কার্য্যসাধন ইত্যাদি সেই দিকেই আমাদের যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। সে পথে গবর্মেন্টের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদের সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাইবার আশা আছে। গত কয়েক বৎসর হইতে কন্‌গ্রেস্ উপলক্ষে দেশীয় শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইতেছে, তাহাতে গবর্মেণ্টে অকুণ্ঠিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত করিলে হঠাৎ গবর্মেণ্ট চটিয়া উঠিবেন, এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির সম্পর্কবিরহিত, এমন কি রাজনীতি-বর্জ্জন করিবার জন্যই যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতেও গবর্মেন্ট রাজনীতির গন্ধ পাইবেন, এবং রাজদ্রোহের পর্য্যন্ত বিভীষিকা দেখিবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর।

ধরিতে গেলে, এই আন্দোলন আর একটা বৃহত্তর ও মহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ। জাতীয়তা-রক্ষার দিকে এখন আমাদের মন ফিরিয়াছে। আমরা আচার ব্যবহারে, আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, জাতীয়ভাব পোষণ করিব, এই বিষয়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের একটা ঐকান্তিক স্পৃহা জন্মিয়াছে। সকল দেশেই প্রকৃত শিক্ষা ফলবতী হইলে ভিন্ন জাতির অনুকরণস্পৃহা লোপ পায়, এবং জাতীয়তার ভাব আসে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে এই প্রবৃত্তিটা আরও বলবতী হইয়াছে। সকলে বুঝিতেছে, সরকার বাহাদুর যখন শাসনের সুবিধার জন্য (তা যে অর্থেই বুঝুন) বাঙ্গলা দেশটাকে দ্বিখণ্ড করিয়া 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই', করিতেছেন, উভয় অংশের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য, একটা জাতীয় ঐক্যসাধন করিয়া 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই', এই জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করি। ইহাতে ইংরাজদ্রোহও নাই, রাজদ্রোহও নাই। আশা করি, এই জাতীয়তার ভাব ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া all India movement হইয়া দাঁড়াইবে। এই ঐক্য দেশীয় সমাজ লইয়া, ইহাতে পলিটিক্‌সের সম্পর্ক নাই। এই চারি

দিকে কেরাণী, কম্‌পোজিটর, কন্‌ডক্‌টর প্রভৃতি মহলে ধর্ম্মঘট হইতেছে, ইহারও মূলে এই জাতীয়তার ভাব আছে। ইহারাও বুঝিতেছে যে, আমরা একটা বিশাল জাতির অন্তর্ভুক্ত, আমাদের ক্ষমতা অল্প হইলেও আমাদের সমগ্র জাতি যদি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করে, তবে অচিরে আমাদের কষ্টনিবারণ হইতে পারে। ইহারা অনেক দিন হইতেই অনেকরূপ অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছিল, শ্বেতপুঙ্গবগণের pretty tyranny দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছিল; আজ তাহারা বড় আশা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মুখ চাহিয়া সেই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার চাহিতেছে। ইহাতে বিদ্রোহিভাব নাই, ইহাও জাতীয়তার স্বাভাবিক স্ফুরণমাত্র। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বাঁধন ছিঁড়িতেছে, অধীনতার শিক্‌লি কাটিতেছে, ত্বরায় জাপানের ন্যায় স্বাধীন হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি ভাষায় টিট্‌কারী করিবারও প্রয়োজন নাই, সরকার বাহাদুরের ডরাইবারও কোনও হেতু নাই। উৎকট কন্‌গ্রেসওয়ালারাও কখনও বলেন নাই যে, তাহারা ইংরাজকে দূরীভূত করিয়া দিয়া দেশটাকে স্বাধীন করিতে চাহেন। তাঁহারা কেবল ব্রিটিশশাসনের কলঙ্কস্বরূপ কতকগুলি অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে চাহেন, এবং শাসন, বিচার, প্রভৃতি কার্য্যে অধিকতর দেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়া নিজেরা নিজের দেশের কাজ করিতে পারে, স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই সকল সংস্কার প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রজার মতে রাজা চলিলে তাহাতে রাজার সিংহাসনের ভিত্তি আরও বড় হয়, 'broad based upon the people's will', এ কথা ইংরেজ কবির মুখেই শিখিয়াছি। ইংরেজ এই ভাবে স্বায়ত্তশাসনের ভার দিয়া এ দেশে রাজচক্রবর্ত্তী (suzerain power) হইয়া থাকুন, ইহাই শিক্ষিত ভারতবাসীর কামনা। ভারতবর্ষে যেরূপ নানা জাতি নানা ধর্ম্ম ও নানা ভাষার সমাবেশ, তাহাতে এখানে ইংরেজের ন্যায় নিরপেক্ষ রাজা মাথার উপর না থাকিলে প্রজাবর্গ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে দেশ অরাজক হইয়া উঠিবে, দুর্ব্বল জাতি সবলের হস্তে নিগৃহীত হইবে, এমন কি সেই রন্ধ্র দিয়া বহিঃশত্রু পর্য্যন্ত দেশে প্রবেশ করিয়া দেশ কবলিত করিবে, তাহা শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিলক্ষণ বুঝে। ইহা ছাড়া, ইংরেজ এ দেশের রাজা হইয়া বর্ণনির্ব্বিশেষে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিয়াছেন, এই সুশিক্ষার প্রভাবে অনেক সামাজিক কুপ্রথা ধীরে ধীরে উৎহাদিত হইতেছে, নানারূপ দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, সাহিত্যচর্চ্চা, সমাজগঠন, ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণ প্রভতি মহৎ ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ হইতেছে; ইংরেজ এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, আর্থারের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যে বর্ব্বরতা আসিয়াছিল সভ্য জাতির সংস্পর্শবিরহিত হইলে আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে, তাহা কি আমরা বুঝি না? যাহাতে এই সকল মঙ্গল স্থায়ী হয়, তাহাই আমরা প্রার্থনা করি। স্বায়ত্তশাসনের ভাব আমাদের হস্তে দিলেই যে ইংরেজরাজত্ব শিথিল হইল, রাজপুরুষেরা এরূপ ভাবেন কেন? লর্ড মেকলে বাঙ্গালী জাতিকে অনেক গালি দিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসী কোনও দিন স্বায়ত্তশাসনের ভার লইতে পারিবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই দিন ইংরেজের গৌরবের দিন হইবে। লর্ড কর্জ্জনও আমাদিগকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী ছিলেন। এই প্রভেদটুকু দেখিলে 'কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি শ্লোক মনে পড়ে।

আজ যদি লর্ড মেকলে বা লর্ড রীপণ ভারতে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে, এই স্বদেশী আন্দোলনে, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিপ্রয়াসে তাঁহারা কত না আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন! যাহাতে দেশীয় শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়, দেশীয় শিল্পদ্রব্যের কাট্‌তি হয়, দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, দেশের লোক দু'মুঠা খাইতে পায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা ত গবর্মেণ্টেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বরাবর মুখে ও কাগজে কলমে এ কথা বলিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু যখন দেশের লোক সেই দিকে অগ্রসর হইল, তখন তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, গবর্মেণ্ট একেবারে বাঁকিয়া বসিতেছেন। এটা inconsistent নহে কি? তবে কি আমরা বুঝিব, ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া ভারতের শিল্পদ্রব্যের উন্নতি করা ইংরেজ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত নহে? স্বজাতিবাৎসল্য কি রাজধর্ম্মের অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল? গবর্মেণ্ট যদি এই আন্দোলন একটা বৃথা হৈ চৈ মনে করেন, তবে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেই ত পারেন। আর যদি ইহা প্রকৃত কাজের চেষ্টা

মনে করেন, তবে ত উৎসাহ দেওয়াই রাজধর্ম্ম। ইহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ বা ভীত হইবার ত কোনই কারণ দেখি না।

যাক্, গবর্মেণ্টের শাসননীতির সমালোচনা না করিয়া এক্ষণে ঘরের কথা বলা যাউক। এই দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন কি টিকিবে? ইহা ক্ষণিক উত্তেজনা, না চিরস্থায়ী ভাবাবেশ? চারি দিকে যে সব লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে ত বুঝিতেছি, এ আগুণ নিবিবে না। মুটে মজুর জেলিয়া ধোপা জুতা ভদ্র পর্য্যন্ত এক ভাবে বিভোর হইয়াছে, চাষা ভদ্রের এক সাধারণ মিলনক্ষেত্রে হইয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাসে এমনটি কখনও ঘটে নাই। ইহাতে ত বোধ হয়, বাঙ্গালীর একপ্রাণতা জন্মিয়াছে। যেখানেই দশ জন লোক একত্র হইয়া গল্পগুজব করিতেছ, সেখানেই এই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা, দেশের অভাবমোচনের কথা; পরনিন্দা ছাড়িয়া এখন লোকে দেশের কথা বলিতেছে, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা? ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া এখন সকলে এক হইতেছে। কবির কথায় বলিতে গেলে আজকাল সকলে "ছেড়ে দলাদলি করে গলাগলি, ছেড়ে রেষারেষি করে মেশামেশি।" যাঁহারা কন্‌গ্রেসের গলাবাজিতে বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও পূর্ণ উৎসাহে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতেছেন। এই ত ভিতরকার অবস্থা। ইহার উপর ইংলিশম্যান পত্রিকার তীব্র কশাঘাত, ম্যাক্সের মিঠেকড়া উপদেশে ও সরকার বাহাদুরের এইরূপ দুই চারিখানা সার্কুলার চলিতে থাকিলে, বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি।

শত্রুপক্ষ এই আন্দোলনকে কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। এক হিসাবে ধরিতে গেলে আন্দোলনমাত্রই কৃত্রিম। সকল আন্দোলনেই জনকতক মহাপ্রাণ ব্যক্তি দেশের কল্যাণ বা সমাজের কল্যাণসাধন করিতে অগ্রণী হয়েন। তাঁহাদের বাগ্মিতার প্রভাবে ও বিষয়মাহাত্ম্যে সমগ্র দেশ জাগিয়া উঠে। তখন দুর্ব্বল বল পায়, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্দেহ ধাঁদা দূর হয়, স্বার্থপর লজ্জার খাতিরেও স্বার্থবিসর্জ্জন করে, আত্মসুখতৎপর ব্যক্তি আত্মসুখের মোহ কাটাইয়া দেশের হিতের জন্য ছুটে। একটা প্রবল ভাব যে একেবারে না বলা না কহা সকলের মন হইতেই স্বতঃউৎসারিত হয়, এরূপ ঘটনা অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। অতএব বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা হইলেই যে আন্দোলন কৃত্রিম হয়, এমন কথা বলা চলে না। আন্দোলনের প্রকৃতি দেখিলেই তাহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম বুঝা যায়। আজকালকার আন্দোলনে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যোগ দিয়াছেন। সমগ্র দেশের লোক কি জনকতক বক্তা ও লেখকের কৌশলে পুঁতুল-নাচের পুঁতুলের ন্যায় নাচিতেছে? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আন্দোলনের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ নাই। তবে আন্দোলনটি দ্বারা স্থায়ী ফললাভ করিতে হইলে সকলে মিলিয়া সমস্বরে হৈ চৈ করিলে চলিবে না। কার্য্যের বিভাগ (division of Labour) চাই; সকলেই সব করিব বলিয়া আস্ফালন করিলে সব পণ্ড হইবে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবে না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে,— Rome was not built in a day; আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় লাগিবে। শনৈঃ পন্থাঃ। একেবারে সব দিকে দেখিতে গেলে কোনওদিকই হইবে না; ইহাকেই ইংরাজীতে বলে too many irens on the fire; ফরাসীবিপ্লবে বার মাসের নাম পর্য্যন্ত বদ্‌লান হইয়াছিল, সেরূপ ঢালিয়া সাজার এক্ষণে সময় হয় নাই। এখন আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত অর্থ একটি কাজে লাগাইতে হইবে—কাপড়ের কল ও তাঁত-সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সুতা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। ইহাই হইল আমাদের প্রধান অভাব। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্নদেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এই বস্ত্রের অভাব দূর হইলে, অন্নের অভাবও থাকিবে না। আমাদের এখন বুলি হওয়া উচিত 'গাঁয়ে গাঁয়ে চালাও তাঁত, তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত'। মনে রাখিতে হইবে, স্বদেশী বস্ত্র কিনিব, বিদেশী বস্ত্র কিনিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ তদপেক্ষা অনেক কঠিন। সস্তায় ও প্রভূত পরিমাণে দেশী কলের ও তাঁতের কাপড় প্রভৃতি সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করা বহুব্যয়সাধ্য ও বহু আয়াসসাধ্য। বাঙ্গালীর ব্যবসায়বুদ্ধি

নূতন করিয়া উন্মেষিত করিতে হইবে, অজ্ঞাত ও অনভ্যস্ত কাজে মন দিতে হইবে; এখন এই প্রশ্ন সমাধানেই সকলকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে; অন্য পাঁচটা কাজ লইয়া শক্তি ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিলে এই কঠিন সমস্যার পূরণ হইবে না, ইহা অবধারিত। এ ক্ষেত্রে কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই একটা সাধারণ কর্ত্তব্য আছে। সকলকেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য (যথাসাধ্য) বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং অন্যকে তর্ক যুক্তি দ্বারা, অনুনয়-বিনয়ে, প্রয়োজন হইলে মৃদু ভর্ৎসনায়, বর্জ্জন করাইতে হইবে। ইহাতে প্রথম প্রথম হয় ত আর্থিক ক্ষতি হইবে, বিলাসস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। কিন্তু দেশের মুখ তাকাইয়া সেটুকু ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অধিকারিভেদ নাই। তাহার পর সম্প্রদায়গত কর্ত্তব্য আছে। ধনী সম্প্রদায় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া সরকার বাহাদুরের মেদবৃদ্ধি না করিয়া, তেলা মাথায় তেল না ঢালিয়া, সেই অর্থে কল কারখানা সংস্থাপন করুন, বিলাতী Capitalist গণের অনুকরণ করুন, তাহাতে স্বদেশী নামে কলঙ্ক হইবে না। শিল্প-সম্প্রদায় কুলিগিরি, কেরাণীগিরি বা অন্যরূপ উঞ্ছবৃত্তি ছাড়িয়া পৈত্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন। কবি ও লেখকগণ গদ্যে পদ্যে গানে গল্পে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে একটা বিরাট্ সাহিত্য প্রস্তুত করুন, তাহাতে স্বদেশী ভাবের পূর্ণ উদ্দীপনা হউক। ভিখারী বৈষ্ণব গান ও ছড়া গাহিয়া দ্বারে দ্বারে এই জাতীয় ভাবটিকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত ও ফলিত করুক। গৃহস্থের প্রাঙ্গণদ্বারে, আয়না, চিরুণী, ব্রুস প্রভৃতি সৌখীন জিনিসে, কাপড়ের পাড়ে, রুমালের কোণে, চিঠীর কাগজে খামে, পোষ্টকার্ডে, মুখরোচক মিষ্টান্নে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র অঙ্কিত হউক। এই জাতীয় মহাভাব আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জাতে মজ্জাতে, প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করুক। আমরা ধন্য হই।*

পরিশেষে, একটি ক্ষুদ্র ইংরেজস্তোত্র পাঠ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। আমরা পৌরাণিক হিন্দু। পৌরাণিক দেবতাদিগের দ্বিবিধ স্বরূপ দেখা যায়। লৌকিক কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিতে হইলে শিব ও কৃষ্ণ লম্পট শিরোমণি। আবার শাস্ত্রের প্রকৃত বাণী, দেবাদিদেব মহাদেব নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় পরমযোগী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, 'যথা কৃষ্ণ স্তথা ধর্ম্মঃ।' সেইরূপ কলির দেবতা ইংরেজরও দুই মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে ইংরাজ পশবলে দৃপ্ত, স্বজাতির গৌরবের বা স্বজাতির বাণিজ্যস্বার্থের জন্য অন্যায় যুদ্ধ ও নরহত্যাদি অত্যাচার করিয়া পৃথিবীতলে স্বীয় প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট। চীনও সেদিনকার বুয়রযুদ্ধ তাঁহার এই তামসিক প্রকৃতির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ অপর মূর্ত্তিতে ইংরেজ বিজিত প্রদেশে লোকশিক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার দান, স্বায়ত্তশাসন প্রচলন, সমাজিক কুপ্রথা-নিবারণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান দ্বারা সভ্যতর আলোকবিস্তারে উৎসাহশীল। এই মূর্ত্তিতে ইংরেজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্যায় যুদ্ধ হইলে দুর্ব্বলের ও নিরীহের সহায়। এই মূর্ত্তিতে ইংরেজ নৃশংস দাসব্যবসায় রহিত করিবার জন্য দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজের এই সাত্ত্বিক প্রকৃতি শেক্সপীয়র, মিলটন, টেনিসন প্রভৃতি মহাকবির কাব্যে, বার্ক, মেকলে প্রভৃতি বাগ্মিগণের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে, কার্লাইল, রাস্‌কিন প্রভৃতি মনীষিগণের গম্ভীর রচনায় স্পেন্‌সার, মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণের তত্ত্বগ্রন্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান। আমরা ইংরেজের সাহিত্য ইতিহাস পাঠ করিয়া ইংরেজের এই মূর্ত্তি ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তাই ভক্তিভরে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভু, তোমার ব্রড্‌রিক্, কর্জ্জন, ফ্রেজার, ফুলার মূর্ত্তি সংবরণ কর, এবং রীপণ, কটন, হিউম, ডিগ্‌বী, কেন, ওয়েডারবর্ণ মূর্ত্তি প্রকট কর, জগৎ তোমার মহিমায় উদ্ভাসিত হউক।

* যে সময়ে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় কার্লাইল-সার্কুলারের আভাসমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি সেই সময়ে রচিত। তাহার পরে পূর্ব্ববঙ্গে (ও খাস বাঙ্গালায়ও) সরকার বাহাদুর যে প্রকার শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা প্রবন্ধলেখকের সংযত লেখনীর অসাধ্য।—লেখক

স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্জ্জনের মাত্রা ও প্রকার ভেদ

স্বদেশীত্ব ও বিদেশীবর্জ্জন সম্বন্ধে সমুদয় বাঙ্গালী একমত নহেন। অনেকে স্বদেশীর পক্ষপাতী কিন্তু বিদেশীবর্জ্জন চান না। যাঁহারা স্বদেশী ও বিদেশীবর্জ্জন দুই চান, তাঁহাদের মধ্যেও সামান্য মতভেদ আছে। আমরা পূর্ব্বেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব।

প্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে বিদেশী জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদি, এবং অন্যান্য বিষয়েও কার্য্য করিবার উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না; করা উচিতও নহে। বিদেশী বিলাসদ্রব্য, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রব্য, অহিতকর ফ্যাশন, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সমুদই বর্জ্জনীয়। ফ্যাশন সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। কারণ এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সাহেবী পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাকগুলি দেশী উপাদানে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল জিনিষ সম্বন্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশী যে সকল জিনিষ কেনা আমাদের উচিত নয়। যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে হইতে পারে, তৎসমুদয়, বিলাসদ্রব্য হইলে ত্যাগ করা উচিত; প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইলে যতদিন ভারতবর্ষে না হয়, ততদিন বিদেশী ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে না। তৎসমুদয় বিলাসদ্রব্য হইলে, বর্জ্জনীয়; নতুবা ব্যবহার্য্য। কোন্‌টি বিলাসদ্রব্য এবং কোন্‌টি অবশ্য প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে অবশ্য মতভেদ হইবে।

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত সমুদয় দ্রব্যকেই আমরা স্বদেশী বলিয়া থাকি; কিন্তু তন্মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

প্রথমেই ধরুন, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, কলম, কালী, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি। লিখিবার কাগজ, কলম ও কালী এখন সমস্তই দেশী পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটু প্রকারভেদ আছে। লিখিবার কাগজের মধ্যে হাতের তৈয়ারী যেসকল অমসৃণ বা খস্‌খসে চিঠির কাগজ আদি পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ দেশী। বাঙ্গলা দেশে যে সকল কলের কাগজ লিখিবার জন্য এবং খবরের কাগজ, মাসিক পত্র ও পুস্তক ছাপিবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা ঠিক দেশী নহে। উহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু উহার কল বিলাতী, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতী, প্রধান কারিকরগণ বিলাতী, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী; কেবল ঘাস, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেশী। বাঙ্গলা দেশে দেশীলোকদের কাগজের কল একটিও নাই। অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌয়ে দেশী লোকদের পরিচালিত একটি কাগজের কল আছে। উহারও কলকারখানা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতী। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দেশী ও বিলাতী লোকদের দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, তাহারা দেশের প্রয়োজনানুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ। অবশ্য কাপড় সম্বন্ধেও স্বদেশীয় বিরোধীরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাঁতে যত কাপড় হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। অতএব বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করা যাইতে পারে না। কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেঁড়া পুরাতন কাপড়ও সেলাই করিয়া পরা যায়। কিন্তু ছেঁড়া পুরাতন কাগজে পুনর্ব্বার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া কপড় পরেন, তিনি কষ্ট করিয়া ৩ জোড়াতেও কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার খবরের কাগজের ১০,০০০ বা পুস্তকের ২,০০০ কাট্‌তি, তিনি ৭ হাজার বা দেড়হাজার ছাপিলে চলে না। অপেক্ষা করিবারও যো নাই। সপ্তাহে ১০,০০০ কাটতি হইলে ১০,০০০ই ছাপিতে হইবে। কিন্তু এ প্রভেদ সত্ত্বেও যাঁহাদের হাফটোন ছবি ছাপিতে হয় না, তাঁহারা বাজারে দেশী কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, ব্যবহার করিতে পারেন। সরকারী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ভারত সাম্রাজ্যে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে, কাগজের কল বেশ চলিতে পারে। ইহাতে অনেক মূলধনের দরকার।

কিন্তু এক যোগে কাজ করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও চাই। যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাজ লইয়া টিটাগড় প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তবে ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে তাঁহারা কাজ পাইবেন না; এবং অতিরিক্ত মান অভিমান থাকিলেও চলিবে না।

কাগজ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং অন্যান্য সমুদয় বাঙ্গলা, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী মাসিকপত্রে বা পুস্তকে যেরূপ উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে হাফটোন ছবি ছাপা হয় তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। উহা বিলাতী বা বিদেশী। যাঁহারা বিদেশী কিছুই ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য হাফ্‌টোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাঙ্গলা ইংরাজী দেশী ও বিলাতী মাসিকপত্র এবং পুস্তক বর্জন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় বিলাতের ছাপা বহিও ত্যাগ করা উচিত; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালী, মুদ্রাযন্ত্র, দপ্তরী, সুতা, বাঁধাইয়ের কাপড় সবই বিলাতী। হাফ্‌টোন ছবি বিলাসদ্রব্য কিম্বা উহার কোন উপকারিতা আছে, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। প্রসঙ্গতঃ হাফটোন ছবি সম্বন্ধেও ইহা বক্তব্য যে উহার সমুদয় যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, মালমসলা, বিলাতী বা বিদেশী; প্রস্তুত অবশ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন ভারতবাসী কর্ত্তৃক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইহাও জানা দরকার যে হাফটোন ছবি ছাপিবার কালী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। বিলাতী কিম্বা মার্কিন কালীই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়।

লিখিবার কালী খাঁটি দেশী বেশ পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও অনেকে বাধ্য হইয়া বা অন্য কারণে কোন্‌নগরে ওয়াল্ডি সাহেবের প্রস্তুত কালী ব্যবহার করেন।

তৎপরে মুদ্রাযন্ত্রের কথা। যত ছাপাখানা আছে, সমুদয়েই বিলাতী বা বিদেশী মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপিবার কল ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাসী কাঠের বা লোহার ২/১টি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতী। অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা বুঝিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না। যাঁহারা বিলাতীর কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁহাদিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র এবং পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় আপাততঃ পুস্তকাদি পাঠ ত্যাগ না করিয়া ছাপাখানার এই সব জিনিষ দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমরা যতদূর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিলাতী বা মার্কিন ছাপিবার কালী ব্যবহৃত হয়। দেশী কালী কেহ কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষে ভাল ছাপিবার কালী প্রস্তুত হয় না। যদি কেহ ভাল ছাপা চান, তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী কালীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশানুরাগ পরিতৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বিদেশ গিয়া ভাল কালী প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে কালীর কারখানা খুলা।

তাহার পর যে সকল অক্ষর বা হরফের দ্বারা ছাপা হয়, তাহারও স্বদেশীত্ব বিচার্য্য। ইংরাজী ভাল সুদৃশ্য সাধারণ ও বিচিত্র নানা রকমের হরফ বিলাত ও মার্কিন দেশ হইতে আমদানী হয়। দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বে উহা বিদেশীর সমকক্ষ নহে। বাঙ্গলা হরফ আমাদের দেশেই দেশী লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিন্তু হরফ ঢালাইখানার যন্ত্রাদি বিদেশী। হরফ সাধারণতঃ, সীসা, আন্টিমনি, টিন ও তামা এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া, এই মিশ্র ধাতু হইতে প্রস্তুত হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে এই চারিটি ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভারতবর্ষে খনি হইতে অতি অল্পই উত্তোলিত হয়।

যাহা হউক, ছাপাখানার এইসব ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় না। প্রধানতঃ চারি প্রকার জিনিষের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় হইতেছে; কাপড়, লৌহইস্পাত প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, লবণ এবং চিনি। দেশী কাপড় কলের তাঁতের ও হাতের তাঁতের, এই দুই প্রকার। কলগুলি বিদেশী, কোন কোন হাতের তাঁতও বিদেশী। কিন্তু দেশী খুব ভাল হাতের তাঁতও পাওয়া যায়; তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ের কলও কতক দেশী লোকের, কতক ইংরাজদের। তন্মধ্যে আমাদের দেশীলোকের

কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা ছাড়া কাপড়ের আর এক শ্রেণীবিভাগ আছে। সরু সুতার ও মোটা সুতার। মোটা সুতা ভারতবর্ষজাত কাপাস হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। সরু সুতার জন্য মিসর ও মার্কিন দেশের কাপাস ব্যবহৃত হয়। আজকাল সিন্ধু দেশে সরু সুতার উপযোগী কাপাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দেশী কাপড় পরিতে চান, তাঁহারা বোম্বাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হইতে হাতের তাঁতে বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক হয়। কিন্তু কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং রংও আমরা প্রস্তুত করিতে না পারিলে খাঁটি দেশী কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক কথা। যদিও ভারতবর্ষের মাটির নীচে যথেষ্ট লোহা আছে তথাপি, হাতের তাঁতের মাকু প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য লোহা ইস্পাত প্রভৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আসে। কলের তাঁত ত সমস্তই বিদেশী। ৺জামষেদজী নাসেরবাঞ্জি তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারখানা খুলিবার উদ্যোগ করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কার্য্য কিছুদিন পরে আরম্ভ হইবে, কিন্তু উহার সমুদয় মূলধন ভারতে পাওয়া গেল না। উহার অনেক অংশীদার বিদেশী। এই কারখানা হইতে লোহা উঠিতে আরম্ভ হইলে আমরা দেশী লোহা ইস্পাত যত আবশ্যক পাইব।

তাতা মহাশয়ের নামের উল্লেখে একটা কথা মনে হইল। তিনি মোটর গাড়ী, ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক বিস্তর বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন। আমরা অনেকে তাহা করি না। কিন্তু তিনিই যে সকল কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত হাজার হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশীব্রত পালন সম্ভব হইয়াছে। আবার তাঁহারই চেষ্টার ফলে আমরা দেশী লোহা ইস্পাত এবং তন্নির্ম্মিত দ্রব্যও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতী জিনিস ব্যবহার করেন বলিয়াই তাঁহাকে দেশের শত্রু বা স্বদেশীর বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি "স্বদেশী"র জন্য কি করিতেছেন তাহাও দেখা উচিত। অবশ্য সকলেই যদি বিলাতী বর্জ্জন ও দেশীদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, দুইটাই করেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়।

যাহা হউক, আমরা যদি মোটা কাপড় পরিতে রাজী হই, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি, এবং প্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা হইলে স্বদেশোৎপন্ন কাপড়ে সকলেরই লজ্জা নিবারণ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

কিন্তু সীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা খারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে দেশজাত পশমে হাতের তাঁতে বোনা অল্প পরিমাণ গরম কাপড় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বেশীর ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা দেশী বলিয়া ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়াল, কানপুর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। ইহারা পশম আমদানী করেন প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে। সুতরাং শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই আমাদিগকে পোষাক বিষয়ে খাঁটি স্বদেশী থাকিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে আর এক উপায় হইতে পারে। আমরা অনায়াসে তুলাভরা জামা ও পাজামা পরিতে পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় হয় না, এরূপ সুন্দর তূলাভরা জামা এবং পাজামাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাল্কা ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ আরাম।

আমাদের দেশে এখন সুন্দর সুন্দর ছুরী কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেন্টের ও রেলওয়ে কোম্পানীদের কারখানায় যথাক্রমে কামান বন্দুকাদি অস্ত্রশস্ত্র, এবং রেলগাড়ী চালাইবার এঞ্জিনাদি হইতেছে। কারীকর দেশী, সুতরাং ভারতে এ সবই হইতে পারে। তাতা মহাশয়ের লোহার খনির কাজ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে আমদানী লোহার পরিবর্ত্তে দেশী লোহা ইস্পাতও পাওয়া যাইবে। কিন্তু ছুরি কাঁচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির কলকারখানা আমাদের নিজের কখন হইবে?

বিলাতী লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ লবণ দামেও সস্তা এবং যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বিদেশী চিনি দেশী চিনি অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং দেখিতেও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। এইজন্য অনেকে বিদেশীই ব্যবহার করেন। যাঁহারা বেশী দাম দিয়াও দেশী চিনি খাইতে প্রস্তুত, দোকানদারেরা অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে লাভের আশায় দেশী বলিয়া বিদেশী চিনি দিয়া ঠকায়। কেবল গুড় খাওয়া একটা উপায় বটে; কিন্তু গুড়ও বিদেশ হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত করিয়া দেশী বলিয়া বিক্রী করিলে

লাভ থাকে। যাঁহারা চিনি প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় জানেন তাঁহারা বলেন যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া কারখানা স্থাপন করিলে এবং দেশী লোকদ্বারা চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ তাহারা বেশী বেতন চায়) দামে বিদেশীর সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলে। এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানা আছে, তন্মধ্যে কানপুর ও সাজাহানপুর এবং বেহার প্রদেশের গুলি ইংরাজদের। কোটচাঁদপুরে একটি দেশী কারখানা আছে।

মোটকথা কাপড়, চিনি, কিম্বা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জ্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল সস্তা জিনিষ উৎপাদনও করিতে হইবে। বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনের আমরা পক্ষপাতী; কিন্তু উহাতে আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা উচিত নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক একদিকে বলিতেছে যে বাঙ্গালী কেবল বকিতেছে ও বর্জ্জন করিতেছে কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই বাঙ্গালীর বকা ও বর্জ্জনের ফল ভোগ করিতেছে—দেশী জিনিষ প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া বদনামও হইতেছে, এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের বাক্যের দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা লইয়া ধনবান্ হইতেছে, এ দৃশ্য বোধ হয় আমাদের পক্ষে প্রীতিকর বা গৌরবজনক নহে।

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪)

বঙ্গ-বিভাগ

লর্ড কার্জ্জনের মত খারাপ শাসনকর্ত্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা ঠিক্ তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতালাভ ঘটিয়াছে? আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এ কথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Growth of the English Constitution নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন ঃ—

"Strange it may at first sight seem that the founder of the later liberties of England was not an Englishman. Simon of Montfort, a native of France, did for the land of his adoption what even he might not have been able to do for the land of his birth. And why? The land of his birth was shall I say flourishing or suffering–under the baleful virtues of the most righteous of kings, Saint Lewis reigned in France, Saint Lewis the just and holy, the man who never swerved from the path of right, the man who sware to his neighbour and disappointed him not, though it were to his own hindrance. Under his righteous rule there could be no groung for revolt or disaffection. By surrounding the Crown with the reflected glory of his own virtues, he did more than any other man to strengthen its power. He thus did more than any other man to pave the way for that foul despotism of his successors whose evil deeds would have daily vexed his righteous soul. In England, on the other hand, we had the momentary curse, the lasting, blessing, of a succession of evil kings. We had Kings who had no spark of English feeling in their breasts, but from whose follies and necessities our fathers were able to wring their freedom, all the more lastingly because it was bit by bit that it was wrung. A Latin poet once sang that freedom never flourishes more brightly than it does under a righteous King. And so it does while that righteous King. himself tarries among men. But, to win freedom as an heritage for ever, there are times when we have more need of the vices of Kings than of their virtues. The tyranny of our Angevin masters woke up English freedom from its momentary grave."

(pp. 69-71)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর। কারণ, অপরের, ভাল রাজার, প্রদত্ত অধিকার নিজস্ব জিনিস নয়, তেমন স্থায়ীও নয়; যাহা নিজে যুঝিয়া, জিনিয়া, লওয়া হয়, তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি। তবে এ কথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস চাই, স্বার্থত্যাগ চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে মনুষ্যত্বকে, আত্মমর্য্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে স্বার্থত্যাগ আছে কি? আমরা মনুষ্যত্বকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতে পারিব কি? যদি পারি, তাহা হইলে লর্ড কার্জ্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালীকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতে গিয়া বাঙ্গালীর একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যদি আমরা জাতীয় জীবনের মালমসলা সম্বন্ধে একান্ত নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ

ও ঈর্ষাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয়তার মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে যথার্থই বঙ্গমাতার পূজা করিতে পারিব।

বঙ্গ-বিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল সরকারী কাগজপত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙ্গলা বলে ও একই শাসনকর্ত্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছেন! অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতার (old associations) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিঙ্গকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গালাকে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে গবর্ণমেণ্টের হা'র হইয়াছে; তবু গবর্ণমেণ্ট নিজের গোঁ ছাড়িতেছেন না। এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র। না তা নয়। এরূপ একগুঁয়েমির গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারী কাগজে নাই, হয় ত কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ব বিদ্যালয়-কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা। তজ্জন্যই লর্ড কার্জ্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন, "I have always thought that Dr. Gooroo Das Banerji held a brief for his unworthy client, the Bengali student, whom it is our desire politely to suppress." যাক্ সে কথা। আমরা বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি প্রকৃত কারণ নহে; গূঢ় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকার মত খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি না; কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধর্ম্ম হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। সরকারী কাগজপত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথাই থাকে; অবশ্য তৎসমুদয় হইতে সত্য বাহির করা যায় বটে; কিন্তু রাজপুরুষেরা মিথ্যাবাদী, এইরূপ সন্দেহ করিয়া অগ্রসর হইলে তবে সত্যের দেখা পাওয়া যাইতে পারে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Methods of Historical Study নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ—

"But when we come to manifestos, proclamations, diplomatic documents which have not yet reached the stage of treaties, the case is wholly different. Here we are in the very chosen region of lies; they are lies told by people who know the truth; truth may even, by various processes, he got out of the lies; but it will not be got out of them by the process of believing them. He is of childlike simplicity indeed who believes every royal proclamation or the preamble of every act of Parliament, as telling us, not only what certain august persons did, but the motives which led them to do it ....."

(pp. 258-59)

ফ্রীম্যান প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সরকারী কাগজপত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে তবে তাহা হইতে সত্য কথা বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দার্জিলিঙ্গের পক্ষে ও মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি দুটি খাটিল, পূর্ব্ববঙ্গের বেলা তাহা না খাটিতে দেখিয়াই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীনকালাগত সম্বন্ধে, মায়ামমতায় আবদ্ধ একটি জাতিকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙ্গালীরা (অর্থাৎ কার্য্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদের দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুবাঙ্গালী, মুসলমান-বাঙ্গালী অপেক্ষা

অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহারী প্রভৃতি অপেক্ষা কম। সুতরাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু-বাঙ্গালীর দাবী, দাওয়া, মত, গবর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন। আমাদের উহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু-বাঙ্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক; বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হউক। আমরা, হিন্দু-বাঙ্গালীর ও মুসলমান-বাঙ্গালীর স্বার্থ পৃথক, এ রকম মনে করিয়া এ কথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক; ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল; এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, বেহারী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম; এই জন্য তাহারা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দুবাঙ্গালী নেতারা যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী করেন, তাহা যদি সামান্য হয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমানবাঙ্গালী ও বেহারীরা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা অপর সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে থাকুন; স্বার্থান্বেষী ইংরাজ রাজপুরুষদের দ্বারা তাঁহাদের সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন; ইহাই আমাদের অভিলাষ। সমস্ত বাঙালীর একত্র থাকা হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইবে। এইরূপ কিছু দিন চলিতে থাকিলে যখন বাঙ্গালী-মুসলমানগণ শিক্ষাগুণে হিন্দু-বাঙ্গালীরই মত জাতীয় অধিকার চাহিয়া রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের ভেদনীতি হয় ত ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। তখন আর স্থানবিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর প্রাধান্য অপ্রাধান্যের কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ষা বিদ্বেষ নাই। এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই ভেদনীতি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এই অশুভ নীতি এখানেই থামিবে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেও ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী পূর্ব্ববঙ্গে চাকরী পাইবে না, এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে, এবং তাহা হইলে একই জাতির দুই শাখায় রাজপুরুষদের চিত্ততোষক বেশ ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মিবে।

বহুসংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, সকলের টাকা একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের পথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারে, অল্পসংখ্যক লোকে তাহা পারে না, সুতরাং দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

তাহার পর, আর এক কথা। স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের ঐক্যের প্রভাব, আবশ্যক হয়। বাঙ্গালী জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্ত্তার অধীনে, দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা কৃত বিভিন্ন আইনের অধীনে, বাস করিলে, এই জাতির দুই শাখার অভাব, অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পরিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।

আমরা চাই এক হইতে, গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে বিভিন্ন আইন, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির অধীনে আনিয়া দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন।

সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য যত বেশী লোকে পড়ে, যাহার রস ও বল যত বেশী মানুষের হৃদয় হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্ণমেন্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য্য হইতে বিরত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে পারিবেন। মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ

স্কুলপাঠ্য পুস্তকরচয়িতারা, এবং হয় ত কোন কোন মুসলমান লেখক গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের সহায় হইবেন। বাঙ্গালী সমাজের যদি মাথা থাকে, এবং সেই শীর্ষস্থানীয় লোকদের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে যাহাই হউক, উচ্চ সাহিত্যের বড় বেশী ক্ষতি বোধ হয় হইবে না। কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার শক্তি যে কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য। এগুলি গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল। ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাহকেরা স্বভাবতঃ নিজের প্রদেশের, নিজের জেলার, নিজের সহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা পড়িতে অধিক ভাল বাসেন। আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার একটা হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির যত যায়গা অধিকার করে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা ও অন্যবিধ গুরুতর সমস্যা তাহার সিকি স্থানও পায় না। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতার শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ব্ববঙ্গের কথা তত আলোচনা করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হারাইয়া আয়ের ন্যূনতা বশতঃ তেমন সুপরিচালিত হইবে না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের আবির্ভাব হইতে অনেক বৎসর লাগিবে। এই প্রকারে গবর্ণমেণ্টের পথের এক প্রধান কণ্টক সংবাদপত্র কিছুদিনের জন্য ভোঁতা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করেন? তাই এখন আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয়, আমাদের ঘর ঠিক্ আছে কি না। আমাদের এক হওয়া সোজা নয়। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (cast) উচ্চতা নীচতার একটা ধূয়া তোলায় বুদ্ধিমান্ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আশা করি, এখন সে ঝগড়াটা থামিয়াছে। তাই, এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু মুসলমানকে একই ভগবান্ একই দেশের জলবায়ু ও খাদ্যে পুষ্ট করিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। ইংরাজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেরা মুসলমানদের উপর অনেক অবিচার করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন। হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু মুসলমানের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এখন কোমর বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের যাঁহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানের যে উৎসাহ, বীরত্ব ও একাগ্রতা এক দিন তাঁহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল, তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বাঙ্গালীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হণ্টর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালী এক প্রবল সমুদ্রচর জাতি হইতে পারে। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত করুন, মুসলমান পুরুষ ও নারীদিগের মহৎকার্য্যের বৃত্তান্ত লিখুন। শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক কাগজে লিখিলে হইবে না। দুরূহ ফরাসী আরবী কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বের উপযুক্ত; এই জন্য শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি। তা'ছাড়া, কারণ যাহাই হউক, শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোটলোক আছে, যাহারা পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া হীন মনে করে। ইহাদিগকে মনের ময়লা সাফ করিতে হইবে।

কিন্তু সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীর হিতকর কোন মহৎ কার্য্যে হাত দিতে হইবে; কারণ, কেবল সরকারের বিরোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদের মধ্যে আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ একতাবন্ধন জন্মিতে পারে না। সদনুষ্ঠান একপ্রাণতা হইতে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পারে। শিল্প বিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন,

ইহা উক্ত রূপ একটি কার্য্য। বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ করা আংশিকভাবে আর একটি তদ্রূপ অনুষ্ঠান। আংশিক ভাবে বলিতেছি এই জন্য, যে শুধু এরূপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। বাঙ্গালাদেশে যে সব জিনিস খুব ভাল হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কাজ, প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষাদান, জ্ঞানদান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সফল হইবে না। কারণ, দেশের মঙ্গল বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। একদিনে জাতি তৈয়ার হয় না, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হয় না। আশা, ধৈর্য্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমরা লুপ্তপৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার দলের ইংরাজেরা আমাদিগকে কীটেরও অধম মনে করিয়াছেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন, জড় পদার্থ-নির্ম্মিত অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নহে; মনে রাখিবেন, সব দিন সমান যায় না; মনে রাখিবেন, Vengeance sleeps long but never dies; মনে রাখিবেন, ন্যায়বান্ ভগবান আছেন; মনে রাখিবেন, পূর্ব্বেকার পরপদানত ইংলণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমানকালের পরপদানত ভারতবর্ষ বিধাতার বরে আবার জাগিবে, উঠিবে।

(প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১২)

দেশী জিনিস ব্যবহার

"Those who were responsible for the boycotting resolution have doubtless been fired by the example of the Chinese and they are optimistic enough to assume that a boycott of European goods in Bengal could be made as damaging and as effective as the Chinese boycott of American goods has to all appearances been. The assumption will cause a smile on the European side for more reasons than one."

The Statesman.

...... While in the opposite event (*ie.* in case of failure) it will render the movement and its supporters absurd.– *The Englishman.*

"বিদেশীয় দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না," বাঙ্গালী কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সঙ্কল্প খুব ভাল, কিন্তু সঙ্কল্প রক্ষা করিবার বিধিমত উপায় করিতে হইবে, নচেৎ সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে জগতের সম্মুখে হেয় হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি দ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা ও দেশের ধন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় কার্য্যে পরিণত হইবে না। পদদলিত, পরাধীন বাঙ্গালীর যে কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব আছে তাহা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় যদি আমাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তবে আমরা কখনও মাথা তুলিতে পারিব না। আমরা ধমক দিয়াছি, সে ধমক কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে বলিয়াছি, এখন কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। ভারতের সমগ্র ইংরাজসমাজ কুঞ্চিত অধরে, অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আমাদের পরাজয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত ভারতবাসী আমাদের কার্য্যকলাপের প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, এ সময় ঘরের কোণে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া মুখ লুকাইলে চলিবে না। কিন্তু ইংরাজেরা যেন মনে না করেন যে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে উহা কেবল আমাদেরই কলঙ্কের কারণ হইবে; উহাতে ইংরাজ-শাসনের অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। লোকে দেখিবে, যে দেশ পূর্ব্বে অন্যান্য দেশকে বস্ত্রাদি যোগাইত, ইংরাজশাসনের গুণে এক্ষণে তাহা নিজের লজ্জারক্ষা ও অসমর্থ। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইষ্টসিদ্ধির উপায় স্থির করিতে সকলকেই চেষ্টান্বিত দেখিতে চাই। কোন আমদানীকারক কিম্বা কোন চেম্বার অব্ কমার্সকে বললে চলিবে না, "তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা বিলাতী বস্ত্র আমদানী করিও না, পাছে আমরা সস্তা ও সুবিধার লোভ সামলাইতে না পারিয়া কিনিয়া পরিয়া ফেলি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমরা ম্যাঞ্চেস্টারকে জব্দ কর।" তাহারা আমাদের জন্য কেন ক্ষতি সহিবে? তাহারা দেশীয় দ্রব্যাদিতে টাকা আবদ্ধ করুক, আর আপনারা যদি না কিনিলেন? আপনাদের যদি এই মনের অবস্থা সে পর্য্যন্ত না রহিল? কাহারও নিকট ভিক্ষা করিয়া কি লাভ? যাহার ইচ্ছা যত বিলাতী মাল আমদানী করুক না কেন, আমাদের না কিনিলেই হইল, না পরিলেই হইল। মাল তোমার বস্তাপচা হউক, তোমার সুবিধা, অসুবিধা তুমি তখন বুঝিয়া লইবে। আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিতে হইবে, নিজের উদ্ধারের উপায় নিজে করিয়া লইতে হইবে।

কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলন হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিব। এ বিষয়ে যদি ব্যবসায়ী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসময়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন তাহা হইলে, আমরা শীঘ্রই একটা সুসাধ্য কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিব। গ্রামে গ্রামে লোকেদের স্বদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেই হইবে না, কি প্রকারে প্রত্যেক গ্রামে

দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় প্রথমে করিতে হইবে। লোকের দ্বারে দ্বারে দেশীয় দ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দাও, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও তাহারা উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে না পাইলে কেবল অঙ্গীকার করিয়াই বা কি ফল?

আমরা নয় দশ বৎসর ধরিয়া কেবল মাত্র দেশী জিনিসের (প্রধানতঃ দেশী কাপড়ের) ব্যবসা করিয়া এই কার্য্যের নানা অসুবিধা বুঝিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

১ম। সখের দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি।

২য়। যাহা একান্ত আবশ্যক নহে; যথাঃ—কাচের বাসনকোসন, ল্যাম্প ইত্যাদি।

৩য়। যাহা অতি আবশ্যকীয়, না হইলে চলে না। যথাঃ—বস্ত্রাদি, তৈজসপত্রাদি, চিনি, লবণ ইত্যাদি।

সখের দ্রব্যাদি আমাদিগকে একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি যাহা দেশীয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, ও যাহা না পাওয়া যায় তাহা যতদূর সম্ভব ব্যবহার করিব না। যদি ব্যবহার করিতে হয়, তবে এসিয়ার (যেমন জাপানে) প্রস্তুত, অভাবে ইউরোপের জিনিস ব্যবহার করিব।

তৃতীয় শ্রেণির কোন দ্রব্য বিদেশীয় কোন কারণেই কখনও ব্যবহার করিব না।

অনেকে বলিতেছেন, ম্যান্‌চেষ্টারকে জব্দ করিতে হইবে। তবে কি জার্ম্মেন ও আমেরিকান বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইবে? যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়, তাহা হইলে কি আমরা দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিব না? ম্যাঞ্চেস্টারের অন্ন হয় ত মারিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশের কি উপকার হইল? ইংরাজের গ্রাস জার্ম্মেন কিম্বা আমেরিকানে কাড়িয়া লইল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম। মনে রাখিতে হইবে যে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইবে। ভারতের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ভারতের উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায়। ভারত একটা মহাদেশ, ভারত নিজের সকল প্রধান অভাবই পূরণ করিতে পারে। দেশের অভাব পূরণ করিতে পারিলেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যেরও দরকার হয় না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে ম্যাঞ্চেস্টার বিদেশীয়ের তুল্যার্থক নহে—যাহা স্বদেশীয় নহে তাহাই বিদেশীয়; এদেশের ইংরাজচালিত মিলও স্বদেশীয় মিল। যাহা বিদেশীয় তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে।

অনেকে বলেন, একেবারে সকল বিদেশী জিনিস ত্যাগ করা ত সম্ভব নয়, বোম্বাইয়ের কলের কাপড়ও ত বিলাতী যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত, তবে আর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কি লাভ? আমরা বলি, যত বিদেশী জিনিস ত্যাগ করা যায়, ও দেশী জিনিস ব্যবহার করা যায়, ততই ত মঙ্গল। একেবারে নীরোগ হওয়া যায় না বলিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? সকলেই এম্ এ পাশ করিতে পারে না, বলিয়া কি ক খ গও শিখিতে হইবে না? পাছে কখন্ একটা মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই ভয়ে কি কখন সত্য কথা বলিবার চেষ্টাও করিতে হইবে না?

এখন দেখিতে হইবে দেশীয় কি কি জিনিস পাওয়া যায়। কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

১ম। যদি সৌখীন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেই হয়, তবে আমাদের দেশীয় আতরের মত কি সুগন্ধ দ্রব্য আছে? ইংরাজের অনুকরণ ছাড়ুন, দেশীয় জিনিস ব্যবহারে গৌরব আছে। আমরা তামাক খাওয়ার বিরোধী, কিন্তু যদি খাইবেনই, তাহা হইলে দেশী তামাকই ভাল। দেশীয় তামাক পূর্ব্বেকার বহু উচ্চপদস্থ এদেশবাসী ইংরাজও ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারদের মতে দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত তামাক অন্য সকল প্রকার তামাক অপেক্ষা কম হানিকর। মান্দ্রাজের সিগার ও সিগারেট বিলাতের আদরের সামগ্রী, আর আমরা ইংরাজী ও আমেরিকান সিগারেট বিষে শরীর ও অর্থ দুই নষ্ট করিতেছি। বেঙ্গল ও নর্থওয়েস্ট কোম্পানীর সাবান বিদেশী সাবান অপেক্ষা হীন নহে।

২য়। যাহা একান্ত আবশ্যক নহে। দেশে আপাততঃ ছাতা প্রস্তুত হয় না, "ফিট্" হয়, উহাই ব্যবহার করুন। ভাল ছাতার দরকার হইলে জাপানী ব্যবহার করুন। যদি দেশীয় দেশলাই না পাওয়া যায় জাপানী দেশলাই ব্যবহার করুন। বর্ম্মাতে প্রায় চেষ্টারের মত কোরোসীন তৈল প্রস্তুত হইতেছে। কাটতী হইলে

আরও উৎকৃষ্ট হইবে। জাপানী ল্যাম্প ব্যবহার করুন। উৎসাহ পাইলে আমদের দেশীয় কারিকরেরা সুন্দর টেকসই পিতলের কেরোসীন ল্যাম্প প্রস্তুত করিতে পারে। দেশে সুন্দর ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। কাচের বাসন যতটা সম্ভব না ব্যবহার করিলেই হইল। কেহ মনে না করেন যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির খরস্রোত একবার বঙ্গদেশে সভা-সমিতি করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ রূপে রোধ হইয়া যাইবে। না—ইহা সময়সাপেক্ষ। তবে যদি আমরা উপায় স্থির করিয়া দৃঢ়তার সহিত ধীর ভাবে আমাদের কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হই তবে কালে কৃতকার্য্য হইব।

এখন যে ধনের স্রোত বিদেশের অভিমুখে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, অল্পে অল্পে বহু বৎসর ধরিয়া সেই স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতে পারিলে ভারতের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্র উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে। কেবল হৈ চৈ করিলে চলিবে না।

৩য়। (ক) বস্ত্রাদি ঃ—আমাদের দেশে ধুতি, শাটি, জামা, কোট, চাপকান, জ্যাকেট, সেমীজের কাপড়, বিছানার চাদর, উড়ানী, মোজা, গেঞ্জি, তোয়ালে শীতবস্ত্রাদি সকলই এদেশের কলে প্রস্তুত হইতেছে। তবে এগুলি সকল স্থলে বিদেশীর মত তত সূক্ষ্ম কিংবা বিচিত্র বর্ণের নয়। কিন্তু যাঁহারা একটুও ফ্যাশন বা আরাম ত্যাগ করিতে পারেন না, স্বদেশের কথা তাঁদের মুখে না আনাই ভাল। তাঁদের বাঁচিয়া থাকায় কি ফল?

(খ) জুতা ঃ— বোম্বাই ও কানপুরের কলে, হস্তনির্ম্মিত বিস্তর জুতা পাওয়া যায়। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী এদেশী মুচিদের নির্ম্মিত জুতা ছাড়া অন্য কোন জুতা ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুদের ডসন্ ও নর্ম্যান্ না হইলে পদদ্বয় সুশোভিত হয় না।

(গ) তৈজসপত্রাদি ঃ— এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মত হীন জাতি আর ভারতে নাই। ভারতের কোন প্রদেশে এনামেলের বাসন ব্যবহার হয় না। কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে উহা বিরাজ করিতেছে। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গালীর পিত্তল কাঁসার মত সুন্দর বাসন-কোসন আর ভারতে কুত্রাপি হয় না। এরূপ সুন্দর ও স্থায়ী তৈজসপত্রাদি ছাড়িয়া আমরা বিদেশীয় ঘৃণিত জঞ্জাল ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য এনামেল প্রথমে সস্তা বোধ হয়, কিন্তু একপ্রস্ত পিত্তল-কাঁসার বাসন যতকাল চলিবে সে সময়ের মধ্যে বোধ হয় এনামেলে উহার চতুর্গুণ মূল্যের খরচ হইবে। পিতল-কাঁসার বাসন পুরাতন হইলে অর্দ্ধেক দরে বিক্রয় হয়; এনামেলের সকলই নষ্ট। এনামেল একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। আবার পিত্তল-কাঁসা ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঘ) লবণ ঃ — বঙ্গে দেশীয় লবণ কেন ব্যবহার হয় না? উহা অপেক্ষা কি বিদেশীয় দরে এত সস্তা? তা ছাড়া, হিন্দুস্তানী হিন্দুরা ত বিলাতী লবণ ব্যবহার করেন না, সৈন্ধব বা করকচ ব্যবহার করেন। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীরাও তাহাই করি। বঙ্গের লোকেরা কেন তাহা করিতে পারেন না?

(ঙ) চিনি ঃ— বিলাতী চিনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা অবধি আমাদের দেশীয় চিনির কারবার লোপ পাইয়াছে। কাশীপুর, মজঃফরপুর, বক্সার ইত্যাদির এখনও বিস্তর চিনি পাওয়া যায়। আমরা বিলাতী ছাড়িয়া উহা কেন ব্যবহার করি না? যুক্ত প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বিলাতী চিনি ব্যবহার করেন না, যে সকল ময়রার দোকানে উহা ব্যবসার হয় সেখান হইতে কখনও মিঠাই ক্রয় করেন না। আমরা কি এতটাও পারি না।

(চ) সর্ব্বপ্রধান বিদেশীয় দ্রব্য যাহা আমরা অনায়াসে পরিহার করিতে পারি এবং একবার যাহা বর্জন করিতে পারিলে স্বদেশের প্রভূত উপকার হয়, তাহা পরিধেয় বস্ত্রাদি। কিন্তু দেশের প্রস্তুত বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এক স্থানে, সুবিধামত, দরকারমত, পছন্দমত পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেহ যেন মনে না করেন একবার বিদেশীয় পরিহার করিলেই স্বদেশীয় দ্রব্যাদি নিজেই আমাদের দ্বারে বিলাতীয় মত আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিলাতী প্রচার করিতে ও ভারতের দূরবর্ত্তী নিভৃত কোণ পর্য্যন্ত পঁহুছাইতে ইংরাজকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, রেলের ও পথের জন্য কত কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৮৬০।৭০ সালের মাঝামাঝি আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভারতের ৬ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কেবল সমগ্র দেশের পরিধেয় বস্ত্রাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের চেম্বার অব্ কমার্স গুলার ব্যবহারের জন্য পাঠান। আমাদের স্বদেশী দ্রব্যাদি পাইতে ও সকল স্থানে সরবরাহ করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইবে। অতএব সুবন্দোবস্তের

বিশেষ দরকার। যে পর্য্যন্ত সংগ্রহের না উপায় হইবে, সে পর্য্যন্ত দেশীয় বস্তুর প্রচার উত্তম রূপে হইতে পারিবে না; আমাদের প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন হইবে। কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদি এক কেন্দ্রীয় স্থানে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে যোগান যাইতে পারে তাহাই সর্ব্ব প্রথমে স্থির করিতে হইবে। বর্ত্তমান দেশীয় দোকানের মধ্যে প্রধান ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ খুচরা বিক্রয়ের প্রতি অধিক মনোযোগী, কলিকাতায় এরূপ বিশ ত্রিশখানা দোকানের দরকার। আর যে দুই একখানা ব্যক্তিবিশেষের দোকান আছে, তাহাদের মূলধন অধিক নহে; তাহারা এ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

মাড়বারী কিম্বা অন্য কেহ যাহারা বিলাতী দ্রব্য আমদানী করে, তাহারা একাজে সহজে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। ইহাতে আপাততঃ বিস্তর ঝঞ্ঝাট, অনেক জঙ্গল কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম নহে—তাহারা প্রথমেই এরূপ (risk) ঝুঁকি লইতে সাহসী হইবে না। যৌথ কারবারই ইহার পথপ্রদর্শক হইতে পারে, পরে দেখাদেখি অনেকেই পথানুসরণ করিবে। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের মিলে সকল প্রকার ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে;—বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের দরকার মত দ্রব্য ফরমাইস্ দিয়া প্রস্তুত করাইতে হইবে। ইহাতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন—অতএব সমগ্র বঙ্গদেশে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য কলিকাতায় একট বৃহৎ পাইকারী ভাণ্ডার (Central Stores) খুলিতে হইবে। আমাদের স্টোরস্ কে Limited Liability Co. করিতে হইবে ও উহার মূলধন ১৫।২০ লক্ষ টাকার কম হওয়া উচিত নহে। কারণ উহা বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্ষুদ্র দোকানগুলিকে মাল যোগাইবে। এ সামান্য মূলধন বাঙ্গালীর পক্ষে তোলা কঠিন নহে। ১০৲ টাকা করিয়া শেয়ার করিলে সমগ্র বঙ্গে কি ২ লক্ষ বাঙ্গালী নাই যাহারা দেশের জন্য ১০৲টাকা দিতে পারে? আমি বলিতে চাহি না যে এই একটা দোকান, সামান্য মূলধন লইয়া সমস্ত দেশের স্বদেশী বস্ত্রাদির অভাব পূর্ণ করিবে। একটা পথপ্রদর্শকের অত্যন্ত আবশ্যক। পরে হয় ত এ প্রকার ৫০ খানা দোকান খুলিলেও যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু এরূপ একটা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার না খুলিলে স্বদেশী ব্যাপার বেশী দূর অগ্রসর হইবে না। যাঁহারা আমাদের মত স্বদেশী দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁহারাই জানেন, স্বদেশী বস্ত্রাদি পাওয়া কত দুরূহ ব্যাপার।

আমাদের প্রস্তাবিত স্টোরস্ ফরমাইস দিয়া বোম্বাই , আহম্মদাবাদ, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর, ধারিওয়াল ইত্যাদি মিল হইতে পছন্দসই বাঙ্গালীর দরকারমত বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা ভারতে সহজে সস্তায় প্রাপ্য হইতে পারে, তৈয়ার করাইয়া সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিবে। এরূপ ব্যবসায়ে লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই (কারণ ইহা ঝুঁকিদার ব্যবসা নহে— কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষ এরূপ ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম এত টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে না)। বিশ্বস্ততা ও সামান্য বিষয়বুদ্ধির পরিচালনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গে যেরূপ বস্ত্রাদির বিশেষ কাটতী ও ব্যবহার তাহার একটা নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে ও নমুনা দেখাইয়া মিলের দ্বারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইতে হইবে। মিলের সহিত দর দস্তুর করিয়া সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

বাঙ্গালা দেশে কাটা কাপড় বিস্তর বিক্রয় হয়; পাইকারী কাটা কাপড়ের একটা শাখা খুলিতে হইবে। কারণ কাটা কাপড়ে সহজে বিলাতী দেশী ভেদ করা কঠিন, ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য অনেক দোকানদারেরা খরিদদারকে ঠকাইবে। ষ্টোরসের মাল বস্তাবন্দী করিয়া মফঃস্বলে রওয়ানা করিবার জন্য একটা বিভাগ উত্তমরূপ সজ্জিত (equip) করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ মফঃস্বলের অর্ডার সরবরাহ করাই ইহার প্রধান কার্য্য হইবে। জিনিস অল্প লাভে, এক দরে, নগদ দামে বিক্রয় করিতে হইবে। খরচ যথাসম্ভব কম করিতে হইবে। কারণ এরূপ দোকানের বাহ্য চাকচিক্যের আবশ্যকতা নাই। এক কথায় ইহা কলিকাতায় একটা বড় আমদানীর হৌসের মত হইবে।

এখন দেখা যাক্ মফঃস্বলে প্রচারকার্য্য কিরূপে করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ স্বদেশী দোকান খুলিতে হইবে। প্রত্যেক দোকানের মূলধন ১০।১২ জন শিক্ষিত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন। স্থানবিশেষে আপাততঃ ২০০৲।১০০০৲ হইলে চলিবে। ঢাকা ইত্যাদির মত বড়

স্থানে ১০।১৫ হাজার দরকার হইতে পারে। ক্ষুদ্র দোকানগুলার অংশীদারেরা নিজেই চালাইতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমে চাকর রাখিবার আবশ্যকতা নাই। দোকান কেনা অংশীদারের বহির্ব্বাটীতে স্থাপন করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সময় খুলিলে চলিবে। আমরা প্রথমে এরূপ করিয়াছিলাম, ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দরকার মত মূলধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে নগদ দামে মাল কিনিতে হইবে ও নিজেদের মধ্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করিতে হইবে। ধারে বিক্রয় করিলে কম মূলধনে চালান কষ্টকর হইবে। সকল কার্য্য ব্যবসার নিয়মে করিতে হইবে। লোকসান হওয়া উচিত নয়। শাখা দোকান রেল, ষ্টীমার খরচ বাদে ০ ১০ টাকায় লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারেন। এরূপে কার্য্য আরম্ভ করিলে কখন অকৃতকার্য্য হইতে হইবে না। কোন বিষয়ে পরামর্শ দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার পরামর্শ দিবেন।

অনেকে বলিবেন, স্থানীয় বর্ত্তমান দোকানগুলার দ্বারা কি এই কার্য্য হইতে পারে না? এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য প্রথমত কতকটা স্বদেশী ভাবের (sentiment) আবশ্যক। যে উৎসাহী শিক্ষিত যুবকেরা দোকান খুলিবেন তাঁহারা নিজেরা দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন, ও আর সকলকে লওয়াইবেন। তাহাদের কথায়, ও কার্য্যের দৃষ্টান্তে অত্যধিক ফল হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্য অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে চলিবে না। বিদেশীয় দ্রব্যে অধিক লাভ। যাহারা বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহারা দেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বিস্তার করিতে কখনও উৎসাহী হইবে না। তবে কালে যদি দেশীয় দ্রব্যাদির কাটতি অধিক হয় তখন তাহারা পথানুসরণ করিবে কিন্তু প্রথম পথপ্রদর্শক শিক্ষিত লোককে হইতে হইবে। উপরি উক্ত উপায়ে স্বদেশী ব্যাপার অতি শীঘ্র দেশ মধ্যে ছাইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে (regular organised effort) নিয়মিত, সুব্যবস্থিত, চেষ্টা হওয়া উচিত, (disconnected, spasmodic attempts) পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন, অব্যবস্থিত খামখেয়ালী চেষ্টা হইলে সফলতা লাভ ইহবে না। স্বদেশী বেপারের নেতাদের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁহারা কলিকাতায় একটা সমিতি গঠন করিয়া একটা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার খুলিবার বন্দোবস্ত করুন ও মফঃস্বলে স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের দ্বারা অন্যান্য দোকান স্থাপিত করিবার চেষ্টা করুন।

দোকান খোলা হইলেই হইবে না। আরও কিছু চাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে, যত অসুবিধা ভোগ করিতে হউক না কেন, তবুও এক গিরাও বিদেশীয় বস্ত্র কিম্বা অন্য দ্রব্যাদি, যাহা দেশে প্রস্তুত না হয়, ব্যবহার করিব না—। এজন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা, কিন্তু এ স্বার্থত্যাগ বিশেষ কঠিন কিম্বা কষ্টকর নহে। কেবল একটু দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে। আর সাহেবদের দোকানে জুতা, জামার জন্য দৌড়াইব না, দেশী খসখসে, মোটা বস্ত্র ও দেশীয় চামড়ার কঠিন জুতা পরিধান করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত, সম্মানিত মনে করিব। কারণ উহাই আমাদের দেশের, যে বিলাতী পরিবে সেই হীন, সেই নীচ। দেখিবে দেশেরও কার্য্য হইবে, অনেক টাকাও বাঁচিবে।

আমরা ত মোটা, খসখসে পরিলাম, কিন্তু অনেকে বলিবেন, আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বিস্তর ওজর আপত্তি করিবেন; তাঁহাদের বিলাতী সিল্কের বডিস, ও নয়নসুখের সেমীজ না হইলে প্রলয় উপস্থিত হইবে। কিন্তু যাহারা ব্রত করিয়া কত সুন্দর, সুখাদ্য বস্তু চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা কি একটা সামান্য বিদেশী বস্ত্রের মায়া ছাড়িতে পারিবেন না? ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নরনারীসমূহ একমত হইয়া ইংরাজের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সে সময় আমাদের দেশের মতও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তথায় প্রস্তুত হইত না। অতি মোটা রুক্ষ্ম বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইত না। কিন্তু আমেরিকান মহিলাদের স্বদেশপ্রেম এত দৃঢ় ছিল যে তাঁহারা কম্বলের মত মোটা বস্ত্রাদি কোমল অঙ্গে পরিয়া নিজেকে গৌরবমণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন।

কিছু কাল পূর্ব্বে আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী ও ডচেস অব ডেভনসায়ার প্রমুখ কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলারা দেখিলেন যে ইংলণ্ডে ফ্রান্স ও ইটালী হইতে বহু কোটী টাকার রেশমী বস্ত্র আমদানী হয়। ইংলণ্ডের জলবায়ু রেশমের বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। তথাপি তাঁহারা সমস্ত ইংলণ্ডে সভা

সমিতি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মোটাই হউক, আর চিকণই হউক, ইংলণ্ডে প্রস্তুত রেশম ব্যতীত অন্য রেশম পরিধান করিবেন না। তাহার ফলে এই সময় ইংলণ্ডে ৪ কোটি টাকার অধিক রেশম প্রস্তুত হইতেছে।

এখনই মিল খুলিয়া কাপড় পরিব এ আশা করা বৃথা। একটা মিল প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর লাগিবে। এ সময় ভারতের অন্য সকল প্রদেশের মিলের উপর আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

উপসংহারে এইমাত্র বলিব যে আমাদের এ স্বদেশী প্রচেষ্টা চীনাদের অনুকরণ নহে। দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব এ ইচ্ছা বহু বৎসর হইতে লোকের মনে জাগরিত হইয়াছে; এবং তদনুসারে অনেকে কাজও করিয়া আসিতেছেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া কেবল উহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে। এখন জিনিস যোগাইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কোন জিনিস মাঝে মাঝে না পাওয়া গেলেও আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। যখন পাইব তখনই আবার কেনা চাই। তা ছাড়া প্রস্তুত করিবারও পাইবার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই।

যাহারা অতিবুদ্ধিমান, কাজে কিছু করিতে চান না, তাঁহারা এখন হয় ত এই বলিয়া আপত্তি তুলিবেন, "আরে, তোমার ভারতবর্ষে আর কটা কাপড়ের কল আছে, যে সমুদয় বাঙ্গালীর কাপড় যোগাইতে পারিবে?" তাঁহাদিগকে বলি, সকল বাঙ্গালীই ত একদিনে বিলাতী ছাড়িয়া দেশী কাপড় ধরিতেছে না। চিন্তার প্রয়োজন কি? কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ১৯০২-৩ সালে সমুদয় বৃটিশ -শাসিত ভারতে সর্ব্বপ্রকারের কাপাসের কাপড় ২,১০৯,৮১৫,৮২৯ অর্থাৎ মোটামুটি ২১০ কোটি গজ আসিয়াছিল। বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ২৩১, ৮৯৯,৫০৭ অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ কোটি। সুতরাং জনপ্রতি মোটামুটি ৯ গজ কাপড় আসে। বাঙ্গালীর সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি। সুতরাং বৎসরে বাঙ্গালীর ৩৬ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। ১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষের মিলগুলিতে ১২২,৭৭৪,০০০ অর্থাৎ মোটামুটি ১২ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬৯,৫৪৮,০০০গজ বিদেশে রপ্তানী হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষে পাঁচকোটি গজের কিছু বেশী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা আগে হইতে বরাত দিলে ১২ কোটি গজই রাখিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এখন ভারতে যত মিল আছে, তাহার দ্বারা একতৃতীয়াংশ বাঙ্গালীর কাপড় যোগান যাইতে পারে। সকলের যোগাইতে হইলে যে ২০১ টি মিল আছে, তাহার যায়গায় ৬০০টির দরকার। সমুদয় বৃটিশ-ভারতের জন্য ৩৬০০ মিলের দরকার। দেশী রাজ্যগুলির সহিত ধরিলে সাড়ে ২৯ কোটি লোকের জন্য প্রায় সাড়ে চারি হাজার মিলের দরকার। কিন্তু স্বদেশী-প্রচেষ্টা ত আর একদিনে সমুদয় বাঙ্গালী বা সমুদয় ভারতবাসীর মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। বহু বৎসর সময় লাগিবে। ততদিনে আমরা মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত না হইলে ক্রমশঃ মিল্ বাড়াইয়া লইতে পারিব। তা ছাড়া হাতের তাঁতেও এখনও বিস্তর কাপড় বুনা হয়। তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। ভাল জাপানী তাঁত, আহমেদনগর সর্‌দিনশা মানেকজী পেতিত শিল্প-বিদ্যালয়ের তাঁত বা (হেটোশঁলী প্রভৃতি) বিলাতী তাঁত প্রচলিত করিতে পারিলে হাতে আরও অনেক কাপড় বুনা যাইতে পারে। ভাল হাতের তাঁত দূরস্থানে রপ্তানি করিতে হইলে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, কিন্তু স্থানিক অভাব নিশ্চয়ই কলের সমান দরে মোচন করিতে পারে। প্রত্যেক বড় গ্রামে ও সহরে শিক্ষিত লোকেরা সামান্য ২।৪ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া ভাল তাঁত আনাইয়া ও সূতা কিনিয়া দিয়া তাঁতিদের অন্নসংস্থান, দেশের উন্নতি ও নিজেদের সুবিধা করিতে পারেন। দেশী সূতার অভাব নাই। ১৯০২।৩ সালে ভারতবর্ষীয় কলগুলিতে ৫৭৬, ২৩৫,০০০ পৌণ্ড (২ পৌণ্ড ১ সের) কাপাসের সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল; ইহাতে মোটা ও মিহি উভয় প্রকার সূতাই ছিল; তবে মোটাই অধিক; কিন্তু ১২০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা এক্ষণে ভারতবর্ষে হইতেছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছিল ৩৩,৬৮১,৩০০ পৌণ্ড।

উত্তরোত্তর বেশী পরিমাণে দেশী কাপড় পাইবার জন্য আমাদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ঃ—(১) কেন্দ্রীয় সরবরাহ ভাণ্ডার স্থাপন; ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। (২) তৎসঙ্গে প্রতি গ্রামে ও সহরে দোকান স্থাপন। (৩) তাঁতিদিগকে ভাল তাঁত ও দেশী সূতা যোগান। (৪) মিল স্থাপন। (৫) কলে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিবার জন্য প্রয়োজনমত বোম্বাইয়ে ও

বিদেশে ছাত্র প্রেরণ; কারণ মিল চালাইবার জন্য বিদেশীর আশ্রয় লইলে চলিবে না। (৬) উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মাইবার চেষ্টা। কারণ খুব ভাল তুলা এখন ভারতবর্ষে হয় না।

সূতা কিনিবার সময় যথাসাধ্য বিদেশী সূতা বাদ দিতে হইবে। নতুবা বিলাতী কাপড়ের বদলে বিলাতী সূতার আমদানী বাড়িবে। তাহাতে আমাদের লাভ নাই। ভাল তুলার চাষ না হইলেও আমাদের ক্ষতি। কারণ সরু সূতার জন্য এখন আমেরিকা ও মিসর দেশের তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশে "ভদ্র" ও "সাধারণ" লোকদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা তাহাদের উপকারের জন্য কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে তাহা তাহারা জানিতে, বুঝিতে পারে না। অথচ সমস্ত জাতিটা একক না হইলে উন্নতির আশা নাই; রক্ষা নাই। আমরা যদি এখন তাঁতি, ও কামার প্রভৃতির উন্নতিতে মন দি, তাহা হইলে নিজেদের প্রতিজ্ঞারক্ষা, সুবিধা, দেশের ধন দেশে রক্ষা, গরিবের অন্নসংস্থান, এ সব ত হয়ই, অধিকন্তু সব শ্রেণীর লোকের মনে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

(প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১২)

স্বদেশী প্রচেষ্টা

১৯০২-০৩ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান জিনিসগুলি আসিয়াছিল ঃ—

পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি, বহি, ইমারৎ ও এঞ্জিনিয়ারিঙ্গের জিনিসপত্র, নানাবিধ গাড়ী, রাসায়নিক বিবিধ দ্রব্য, বড় ঘড়ি ও জেব ঘড়ি, তুলা, কাপাসের সুতা, কার্পাসবস্ত্র, ভৈষজ্যদ্রব্য ও ঔষধ, রং করিবার ও চামড়ার কষ করিবার মালমসলা, শণের জিনিস, ফল ও শাক, কাচ ও কাচের জিনিস, শস্য (grain) ও দাল, আঠা বা গাছের নির্য্যাস ও রজনাদি, ধাতুর বাসনাদি ছুরী কাঁচী ও হাতীয়ার, কাঁচা ও তৈয়ারি চামড়া, ঘোড়া, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, গজদন্ত এবং গজদন্তনির্মিত দ্রব্যাদি, অলঙ্কার ও রত্ন, কষকরা চামড়া ও তাহার জিনিস, নানাবিধ মদ, কলকারখানা, দিয়াশলাই, লোহা, ইস্পাত, পিতল, তামা, দস্তা, টিন, সীসা, পারা, জার্ম্মেন "রৌপ্য", অন্যান্য ধাতু, খনিজ প্রাণিজ উদ্ভিজ্জ এবং essential তৈল, নানাবিধ রং, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড, চীনের বাসন ও মাটীর বাসন, খাদ্য দ্রব্য, রেলের গাড়ী ইত্যাদি, লবণ, রেসম ও রেসমের কাপড়, সাবান, গরম মসলা, মণিহারি জিনিস, চিনি, চা, চায়ের বাক্স, তামাক, খেলনা এবং খেলিবার উপকরণ, ছাতা, কাঠ ও কাঠের জিনিস, উল বা পশম ও পশমের জিনিস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন সোণা রূপার আমদানীও ছিল।

আমাদের স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বা বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না এই প্রতিজ্ঞাও করা হইতেছে। সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে এরূপ প্রতিজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয় নয়, করা যাইতে পারে না, এবং কেহ এরূপ সর্ব্বব্যাপী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। স্বদেশী-প্রচেষ্টার (Swadeshi Movement) ক্ষেত্র এরূপ সর্ব্বব্যাপী নহে।

অপেক্ষাকৃত অসভ্য অবস্থায় মানুষ যেরূপ পর্ণকুটীরে বাস করিয়া মোটা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে সন্তুষ্ট থাকিত, সেইরূপ অসভ্য থাকিয়া তদ্রূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে সকল দেশের লোকই অন্য দেশজাত দ্রব্য ব্যতিরেকেও জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু সভ্য মানুষের, উন্নত আদর্শ জীবনপ্রার্থী মানুষের এরূপ জীবনযাপন করিলে চলে না। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে কোন দেশেই সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। ইহা ভালই। কারণ সমুদয় দেশ যত পরস্পারের উপর নির্ভর করিবে, যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদ্বেষ ততই কমিয়া যাইবে, এবং সকল মানুষের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের এই ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। বিলাসদ্রব্য সমস্তই ছাড়িয়া দিলাম। সভ্য উন্নত জীবনের জন্য যে সকল জিনিস দরকার তাহা সমস্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, এবং কখনও পাওয়া যাইবে না। সুসভ্য শিল্পবিজ্ঞানে উন্নত জাতিরাও এ বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভর করে। আমরা ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ও ইউরোপে মুদ্রিত পুস্তক ভিন্ন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সুতরাং বিদেশী পুস্তক কিনিব না বলা চলে না। অনেক রাসায়নিক দ্রব্য স্বভাবতই এদেশে জন্মে না অথচ তৎসমুদয় অনেক শিল্পে এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। এ গুলিও বাদ দেওয়া চলে না। খুব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এ দেশে হয় না। সেগুলি আপাততঃ বিদেশ হইতে আনিতেই হইবে। যে কলকারখানার সাহায্যে আমরা দেশেই কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য তৈয়ার করিয়া বিদেশী সামগ্রীকে বাজার হইতে দূর করিতেছে, সেই সকল কারখানা বহুবৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ধাতু দ্রব্যের কথা ধরুন। যে সকল ধাতুর অধিক পরিমাণে ব্যবহার নাই, তৎসমুদয় ছাড়িয়া দিয়া প্রধান প্রধান ধাতুর বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তামার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের নানা স্থানে তামা উৎপন্ন হইত। কিন্তু এখন বিদেশী তামারই বাজারে সম্পূর্ণ প্রাধান্য হইয়াছে। বর্ত্তমান

বৎসরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হল্যাণ্ড সাহেবের লেখা "Review of the Mineral Production of India during the years 1898 to 1903" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে,

"Copper was formerly smelted in considerable quantities in South India, in Rajputana, and at various parts of the outer Himalayas where a Killas-like rock persists along the whole range, and is known to be copper-bearing in Kulu, Garhwal, Nepal, Sikkim and Bhutan. Native-made copper has however completely given way to the imported material, and all attempts by European companies to open up the deposits have proved to be unsuccessful so far. Mining leases are still held, and prospecting licenses frequently granted for copper ores, The Indian purchase of copper and brass form a sensible item in the imports of metals. During the six years under review the average annual value of copper imported was £ 813, 701, whilst during the last three years the copper imported was valued at over a million sterling per annum".

পিতল কাঁসা তামার বাসনের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর; কিন্তু দেশজাত তামায় আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। হয় ত ভবিষ্যতে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারও বিদেশী যন্ত্রাদির সাহায্যে, এবং সম্ভবতঃ বিদেশী লোকদের চেষ্টায়।

বিদেশীয় কোন ধার ধারিব না, এ প্রতিজ্ঞা এক দিনও টিকিতে পারে না, সুতরাং ইহা করা উচিত নয়। তদ্ভিন্ন বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া কোন জিনিস সম্বন্ধেই "স্বদেশী প্রতিজ্ঞা" করা উচিত নয়। আমরা যে সকল জিনিস ভারতবর্ষে পাইতে পারি, এবং করিতে পারি, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার করিব, ইহাই আমাদের প্রতিজ্ঞা। তাহাতে যদি বিদেশী লোকদের অনিষ্ট হয়, তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

তবে একটি অনিষ্ট রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে অভিপ্রেত কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে বটে। ইংলণ্ড ইছাপূর্ব্বক আমাদের দেশের কাপড়ের ব্যবসায় মাটি করিয়াছেন; তাহার পর দেশ কুশাসিত হইলে তাহার খবর পর্য্যন্ত রাখেন না। সুতরাং তাঁহার বস্ত্রব্যবসায়ের ক্ষতি না করিলে তাঁহার চেতনা হইবে না, আমাদের বিলুপ্ত প্রাচীন ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার হইবে না। এ স্থলেও কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের অভিপ্রেত প্রতিযোগিতাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোন দেশই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বন করিতে পারে না। ইহা কিন্তু সত্য যে ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তেমন আর কোন দেশ পারে কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড এবিষয়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক পরাধীন। আমরা বিদেশীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেও অনাহারে মরিব না। কিন্তু ইংলণ্ডে বিদেশী শস্যের আমদানী বন্ধ হইলে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিবে। বাস্তবিক, প্রধানতঃ কৃষিসম্বল সভ্যতা বাণিজ্যসম্বল বা শিল্পসম্বল সভ্যতা অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। কৃষিসম্বল জাতি জীবনের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে না। শিল্পবাণিজ্যসম্বল জাতি সম্পূর্ণ পরাধীন। আবার শিল্পবাণিজ্য সামুদ্রিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যে দিনে সামুদ্রিক জাতির নৌকা লোপ পায়, সেই দিনেই তাহার শিল্পবাণিজ্যের সহিত তাহার ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়। প্রাচীন কার্থেজ এবং মধ্যযুগের ভীনিস, এবং স্পেন বহুপরিমাণে আমাদের কথার দৃষ্টান্তস্থল। আজকাল পাশ্চাত্যজগতে নৌকা বাড়ান লইয়া খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। তাহার কারণ, ইউরোপের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্য প্রধানত শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর করে।

কৃষিসম্বল ও শিল্পবাণিজ্যসম্বল জাতির মধ্যে আর একটি প্রভেদ লক্ষণীয়। শিল্পবাণিজ্যোদ্ভব সভ্যতার ধর্ম্মের প্রভাব কম, স্বার্থপরতার প্রভাবই বেশী। শিল্পবাণিজ্যসম্বল জাতিদিগকে সর্ব্বদা এই কামনা করিতে হয় যে, অপর জাতিরা অসভ্য থাকুক, নিজ নিজ দেশের স্বভাবজাত দ্রব্য সকলের সাহায্যে শিল্প সামগ্রী উৎপাদনে অসমর্থ থাকুক; আমরা আমাদের শিল্পোৎপন্ন জিনিস তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া তাহাদের দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য লুটিয়া খাই। এই সকল সভ্যজাতি অপরের উন্নতিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে বাধ্য

হয়, শিল্প বাণিজ্যে নিজের নিজের প্রাধান্য রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে সাতিশয় অন্যায় ও নৃশংস আচরণ করে। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার খৃষ্টান জাতিদের নৃশংস ব্যবহার আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

অপর দিকে কৃষিসম্বল জাতিকে অপরের অমঙ্গল, অপরের অনুন্নত অসভ্য অবস্থায় চিরস্থিতি ইচ্ছা করিতে হয় না। কৃষিসম্বল সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্য কম, ইহাতে প্রভূত ধনসঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহা জাতিবিশেষের ধর্ম্মপথে থাকিবার অন্তরায় নহে, বরং সহায়তা করে। সুতরাং আমাদের বস্ত্র বয়নাদি প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও, কৃষির প্রতিই আমাদের প্রধানভাবে মন দেওয়া উচিত। বাস্তবিক, কাপড় যে আমাদের দেশে বিদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকার আসে, তাহা কৃষিতে মন না দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারি না। কাপড়, লোহা ইস্পাতের জিনিস এবং চিনি, এই তিনটি জিনিসই বিদেশ হইতে বেশী টাকার আসে। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি কৃষিজাত। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এবং এরূপ সুবিস্তৃত যে শিল্প-দ্রব্যের কাট্‌তির জন্য বিদেশে যাইবারও প্রয়োজন নাই।

ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য ভোগ। স্বদেশের এ বিষয়ে উন্নতি প্রার্থনীয়। কিন্তু ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সার বস্তু। যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নয়, তাহা আমরা চাই না। স্বদেশী-প্রচেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গত না হইলে, তাহা হাজার লোভের কারণ হইলেও, আমরা তাহার সমর্থন করিতাম না। সুখের বিষয় ধর্ম্ম ও স্বদেশী-প্রচেষ্টায় কোন বিরোধ নাই। সুতরাং ইহাতে কায়মনোবাক্যে যোগ দিতে পারি।

(প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১২)

বন্দে মাতরম্*

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা বাঙালী, মাতাকে বন্দনা করিব, ইহা আর বড় কথা কী! চিরকাল ত এই শিখিয়া আসিতেছি যে মাতাকে বন্দনা করিতে হয়, ভাল বাসিতে হয়, ভক্তি করিতে হয়। জননী জন্মভূমি যে বন্দনীয়া, স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, এ কথাও ত লোকের মুখে লাগিয়া আছে। তবে যে আজ এই বঙ্গদেশ—যেখানে বাঙালী সেখানেই বঙ্গদেশ—ব্যাপিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনির তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহার বিশেষত্ব কি?

ভাবিয়া দেখিবার বড় অবসর হয় না। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল এই গীতটি রচিত হয়। যিনি রচনা করেন তিনি এই গান স্বদেশভক্তির মন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি সন্ন্যাসীর মুখে দিয়া যান। যে পুস্তকে গানটি অছে তাহা একখানি উপন্যাস। আমরা যেমন অপর দশখানা উপন্যাস পাঠ করি আনন্দমঠও সেইরূপ পাঠ করিতাম। অন্য উপন্যাসে যেমন গান পড়ি সেই রকম এ গানটিও পড়িতাম। এই গীতে ও অপর গীতে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিত না। আজ কেন এই গান বন্যার মত আসিয়া দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে? কেন আজ সপ্ত কোটি বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছে, বন্দে মাতরম্? যে দিন বাঙালী বাঙালীর হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়াছিল সে দিন কি মনে হয় নাই যে হৃদয়ের সহিত হৃদয় বাঁধিবার মন্ত্র বন্দে মাতরম্?

মহা সাধনা যেখানে, সেখানেই মহামন্ত্রের প্রয়োজন। সকল ব্রতের মন্ত্র আছে; সকল কার্য্যের আহ্বানধ্বনি আছে। আজ যেন মনে হইতেছে আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাজের চেষ্টায় ফিরিতেছিলাম, আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাই নাই! ব্রতের সকল আয়োজন করিয়াছিলাম, মন্ত্রের অভাবে উদ্যাপন করিতে পারি নাই!

এই যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ, ইহাই যে আমাদের মাতৃস্বরূপ এ কথা আমরা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না। স্বদেশ মাতৃতুল্য এ কথা জানি, বুঝি, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে যাহা পারে চেষ্টাও করে, কিন্তু অনুভব আর এক সামগ্রী, অনুভব করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। দেশহিতৈষিতা ত আমাদের দেশে অনেক দিন আসিয়াছে, অনেকে ত দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশ যে সাক্ষাৎ মাতৃস্বরূপ তাহা কি আমরা অনুভব করিতে পারিতাম? উপন্যাসের গান, উপন্যাসের কথা উপন্যাসেই ছিল, কাল্পনিক কথা আমরা অলস কল্পনার চক্ষেই দেখিতাম। জননী জন্মভূমির অঙ্গ খণ্ড করিবার ব্যবস্থা হইল। কত সভা, কত বক্তৃতা হইল, কত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর হইল। কিছুতে কিছু হইল না। তখন কে আমাদের কাণে মন্ত্র দিল, কহিল, "বল, বন্দে মাতরম্!"

যেমনি এই মন্ত্র উচ্চারিত হইল অমনি দেশে এক নূতন প্রবাহ আসিল, লোকের মনে অভিনব আশার সঞ্চার হইল, দুর্ব্বলতা, হীনতা, কাতরতা দূর হইয়া গেল, বাঙালীর মনে আত্মনির্ভর প্রবল হইল। যদি এই গান রচিত না হইত, তাহা হইলে আজ আমরা সমবেত হইয়া কাহাকে বন্দনা করিতাম, কোন্ মন্ত্রে বাঙালীর হৃদয়ে বল হইত? আর কোন কথায়, কাহারও বক্তৃতায় ত দেশ এমন জাগিয়া উঠে নাই!

যখন কোন ঘোরতর বিপদে আমরা পতিত হই তখন বক্তৃতা করিয়া যে বিপদ বুঝান যায় না, বক্তৃতা তখন আসেই না। বড় যাতনার সময় আমরা মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করিয়া, যন্ত্রণার সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়া চিৎকার করি না। যে বিপদ দেশের উপর আসিয়াছে সেরূপ বিপদ ইতিপূর্ব্বে কখন আমাদের ঘটে নাই। সুতরাং অনেক কথায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন দেখিলাম জন্মভূমির অঙ্গ ছিন্ন হইতেছে তখন বুঝিতে পারিলাম এই দেশ যথার্থই আমাদের জননী, আগে যাহা শুধু কথায় জানিতাম এখন তাহার অনুভূতি হইল। কে এই জননীর দেহ ত্রিশূলাগ্রবিদ্ধ সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিবে?

---

* প্রয়াগ বাঙ্গালী সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

আমাদের মাতা, কে তাঁহাকে দ্বিধাবিভক্ত করে? এস ভাই বাঙালি, হাতে হাত ধর, মণিবন্ধে রাখী বাঁধ, অখণ্ড মণ্ডলে অখণ্ড জননীকে ঘিরিয়া দাঁড়াও, বল, বন্দে মাতরম্।

যখন একটা কাজ অনেক লোক মিলিয়া করে,একটা ভারি বোঝা অনেক লোক মিলিয়া টানে সে সময় একজন সুর করিয়া একটা কথা বলে, অপর সকলে সেই ধূয়া ধরিয়া বল প্রয়োগ করে। এইরকম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়। যে কর্ম্মে আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি তাহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য নাই, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত নাই। এই কাজের ধূয়া, এই ব্রতের মন্ত্র, বন্দে মাতরম্। ব্রত যেমন মহৎ মন্ত্র তেমনি মহান্, কার্য্য যেমন গুরু ধূয়াও সেইরূপ বলপ্রদায়িনী।

এই গীত, এই মন্ত্রের তত্ত্ব কি? তত্ত্ব শব্দটী বাংলা ভাষায় সম্প্রতি কিছু ভীতিজনক হইয়া উঠিয়াছে। এমন সামগ্রী নাই, এমন প্রথা নাই যাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। গান কবির কীর্ত্তি, তাঁহার কল্পনায় আসিল তিনি রচনা করিলেন। তাহার আবার তত্ত্ব কি? কিন্তু অকারণে কিছু হয় না, উদ্দেশ্যহীন জগতে কিছুই নাই। প্রথমেই এই গীত সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কথা উল্লেখ করিবার আছে। যখন আনন্দমঠ প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় সেই সময় বঙ্গের কোন প্রথিতনামা কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রসঙ্গ ক্রমে এই গীতের উল্লেখ হয়। কবি বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এই গীত সংস্কৃত ও বাংলা মিশাইয়া রচনা করিলেন কেন? হয় কেবল সংস্কৃতে কিম্বা শুদ্ধ বাংলায় রচান করিলেই ত ভাল হইত। একটি গীতে দুইটি ভাষা সন্নিবেশ করিবার কারণ কি?" বঙ্কিমচন্দ্র নীরব রহিলেন। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করাতে তিনি হাসিয়া, সংক্ষেপে কহিলেন, " আমার খুসী!'" এ কথায় উপর আর প্রশ্ন কিম্বা তর্ক চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মরচিত গীতের ব্যাখ্যা করিতে অথবা তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

সে সময় মিশ্র ভাষা অনেকের চক্ষে বিরূপ বোধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আজ পঁচিশ বৎসর পরে এই দ্বিভাষাগ্রথিত বিচিত্র সঙ্গীতের সার্থকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। যে দেশকে আজ আমরা মাতা বলিয়া বন্দনা করিতেছি অতি প্রাচীন কালে সেই দেশকে আর্য্য ঋষি মাতা বলিয়া বন্দনা করিতেন। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী সংস্কৃত কথা, বাংলা নয়, এবং জন্মভূমির প্রতি ভক্তিও সেই প্রাচীনদিগের শিক্ষা, বাঙালীর নবাবিষ্কার নয়। এই দেশ যেমন আমাদের জননী সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাও বাংলা ভাষার জননী। অতএব স্বদেশানুরাগ প্রচারের সময় এই উভয়বিধ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রচীন আর্য্যদিগের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষারও সেই সম্বন্ধ। তাহার পর, কিরূপ সংস্কৃত ভাষায় গান রচনা করা উচিত? যদি ভট্টির অথবা ভারবির ভাষা বাঙালীর মস্তকে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে অনেক বাঙালীর মাথা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, মাথার মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু বাঙালী জয়দেব আর এক রকম সংস্কৃত ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যে ভাষার তরল, তরঙ্গায়িত, মাধুর্য্যময়, ললিত ছন্দে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভাষা বুঝিবার জন্য ন্যায় ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন হয় না। সেই ভাষাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তদপেক্ষাও সহজ সরল ভাষায় কবি লিখিলেন,

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং, মাতরম্!

এই সংস্কৃত কোন্ বাঙালী, সংস্কৃত কলেজের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও, বুঝিতে না পারে? যেমন সংস্কৃত তেমনি বাংলা,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ইহার অপেক্ষা সরল বাংলা আর কি হইতে পারে?

একদিকে এই স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ছন্দোময়ী, অমৃতময়ী, জাহ্নবীযমুনার সঙ্গমতুল্য দ্বিবেণী ভাষা; অপরদিকে ভাবের প্রগাঢ়তা, গভীরতা ও প্রসার! জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনার গীত অনেক ভাষায়, অনেক দেশে আছে, কিন্তু এইরূপ যে আর একটি গীত আর কোথাও আছে তাহা ত স্মরণ হয় না! কোন সঙ্গীতে দর্পের প্রবলতা, কোন সঙ্গীতে শত্রুকে সমরাঙ্গনে আহ্বান ঘোষণা! কোন সঙ্গীতে অপর জাতির প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষপাত, কোন সঙ্গীতে উৎপীড়নের প্রতি ধিক্কার ! নির্ভীকতা, স্বাধীনচিত্ততা সকল সঙ্গীতেই আছে, কিন্তু স্বদেশানুরাগের এরূপ ব্যাপকতা অন্য গীতে নাই।

ইহার কারণ এই যে অপর সকল দেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রায় কোন-না-কোন রূপ উত্তেজনায় রচিত। হয় দেশে শত্রুভয় হইয়াছে, সেই অবস্থায় কোন কবি দেশের লোককে উত্তেজিত করিবার মানসে জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথবা কোন জয়শীল জাতির উৎসাহ বাড়াইবার জন্য কোন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, কিম্বা অত্যাচার প্রপীড়িত কোন জাতিকে সাহস দিবার জন্য কোন জাতীয় সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গীত রচিত হইবার কালে এই সকল কারণের কোনটি বর্ত্তমান ছিল না। যদি বলা যায় দেশ পরাধীন সে অবস্থাও প্রাচীন, তাহাতে নবীন উদ্বেগ বা উত্তেজনার কোন কারণ ছিল না। তখন দেশে সর্ব্বত্র শান্তি, রাজনৈতিক অথবা অপর কোনরূপ আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব ছিল না। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় দেশ স্থির ছিল, বাহ্য কোন ঘটনায় কবির চিত্ত বিচলিত অথবা উত্তেজিত হয় নাই।

এই দেশে প্রচলিত অপর জাতীয় গীতসমূহের সহিত তুলনা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গীতের একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। প্রায় অপর সকল গীতেই ভারতের পূর্ব্বগৌরবের এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কিছু-না কিছু উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতে দুইটির একটিও নাই। অতীত গৌরবের স্মৃতিরও উল্লেখ নাই, বর্ত্তমান দুর্দ্দশারও উল্লেখ নাই। অতীতের দোহাই দিয়া অথবা গৌরব করিয়া কি ফল? লাভের মধ্যে অতীতের গৌরব কল্পনায় আমরা ভবিষ্যতের উন্নতিকল্পে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়ি, স্বাভাবিক আলস্য আরও বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমানের অনুতাপেই বা কি ফল? পুরুষকার অনুতাপকে মনে স্থান দেয় না। যাহা আছে তাহাকেই উন্নত করিব, পুরুষের ইহাই উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা। যে দেশকে মাতা বলিয়া বন্দনা করি সে দেশের নিন্দা করিলে মাতৃনিন্দা করা হয়। মাতৃভক্ত কবির সে প্রবৃত্তি হয় নাই।

এই গীতের ব্যাপকতাই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। প্রথমে দৃষ্টি বহির্ম্মুখী। জননী সুজল সুফল দিয়া সন্তানের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেছেন, অঞ্চলে ময়লবায়ু সঞ্চালন করিয়া শ্রান্তিহরণ করিতেছেন, শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্নের সংস্থান করিতেছেন। তৎপরে জননীর রূপ বর্ণনা ঃ—

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্!

তখনও দৃষ্টি বহির্ম্মুখী। নয়নানন্দময়ী, শ্রবণাভিরামা জননী! শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল নয়নের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, সুন্দর শুচি হাস্য, সুমধুর ভাষা শ্রবণকে তৃপ্তিদান করিতেছে। দান করিয়াই তিনি সুখী—

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

এই যে ধনধান্যবহুসৌষ্ঠবশালিনী, সুখদায়িণী, বরপ্রদায়িনী জননী, সপ্তকোটি যাঁহার সন্তান, কে তাঁহাকে অবলা বলে?

নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং,

তাঁহাকে নমস্কার করি।

ক্রমে দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হইল। সুখদাং বরদাং বলিলে ত সব বলা হয় না! তিনি দান করেন, আমরা গ্রহণ করি, এ জননীর সহিত ত কেবল সে সম্বন্ধ নয়। মথিত উচ্ছ্বসিত মর্ম্মস্থল হইতে তখন আবেগপূর্ণ ধ্বনি উঠিল ঃ—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

সব তোমার। তুমিই সব। তোমার বিদ্যা আমাদিগকে দিয়াছ, তোমার ধর্ম্ম আমাদিগকে দিয়াছ, তোমার হৃদয়, তোমার মর্ম্ম আমাদিগকে দিয়াছ। তুমিই এই দেশস্থ পঞ্চ প্রাণবায়ু! অন্তরে বাহিরে তুমি আমাদিগকে আবরণ করিয়া রহিয়াছ, অন্তরে বাহিরে তোমারই বিকাশ! তোমা হইতেই সাকার দেবদেবীর কল্পনা!

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

তোমার জলে ফলে অন্নে পুষ্ট এই দেহ, এই বাহুতে শক্তি তোমার নয় ত কাহার? তুমি যেমন হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক কর এমন আর কে করিতে পারে? তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই ত মন্দিরে প্রতিমা গঠিত হইয়াছে।

এই ভাব, এই কল্পনা একেবারে নূতন। আর কোন কবি দুর্গা, কমলা ও বাণীর মূর্ত্তিতে স্বদেশের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। এই কবি নিঃসন্দেহে বলিলেন,

ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণধারিণী!

দশপ্রহরণধারিণী, আবার দশদিক্পালিনী, দশ বাহু বিস্তার করিয়া দশ দিক হইতে সন্তানকে ডাকিতেছেন, অসুরকে দলন করিয়া সন্তানকে অভয় দান করিতেছেন!

এই ব্যাপকতার তুলনা নাই। বহির্ম্মুখী, অন্তর্ম্মুখী, সর্ব্বতোমুখী ভক্তি, উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় হৃদয়ের বেলাতট মগ্ন করিয়াছে। এই ভাষা, এই ভাব শুধু কবির নয়, প্রকৃত ভক্তের। হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থান হইতে সোপানাবলী নামিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, ভক্তির জোয়ারে সেই সোপানশ্রেণী আবার একে একে ডুবিয়া গিয়াছে। পরিশেষে আনন্দ পরিপ্লুত চিত্তে ভক্তিনম্রহৃদয়ে বহুগুণশালিনী বহুঋদ্ধিশালিনী জননীর বন্দনা ঃ—

নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্।
বন্দে মাতরম্!
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

বলিয়াছি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর প্রতিমায় স্বদেশের কল্পনা নূতন,

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্!

কিন্তু যিনি এই কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে নূতন নহে। এই গীত বিরচিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী অলৌকিক অহিফেনের প্রসাদাৎ দিব্য চক্ষে শারদীয়া প্রতিমার সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সপ্তমী পূজার দিন প্রতিমা দেখিতে গিয়া কমলাকান্ত যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজের লোকমনোমোহিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই আবেগময়ী উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"দেখিলাম—আকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলার চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে

উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি।! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল---স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল---সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিতা তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কালস্রোতে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"

কমলাকান্তের এই পূর্ব্বদৃষ্ট প্রতিমা আবার এই গীতে দেখা দিয়াছেন। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি শারদীয়া প্রতিমায় এখন সেই মূর্ত্তি সকল প্রতিমায়। যাহা আংশিক ছিল তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, যাহা একমুখী ছিল তাহা বহুমুখী হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় মূর্ত্তিময়ী বঙ্গপ্রতিমার দর্শন, তৎপরে অনুধ্যান। এই ধ্যানের ফল সেই দেবীমূর্ত্তির সর্ব্বত্র ব্যাপকতা। ক্রমে ধ্যানের তন্ময়তায় অন্তরে বাহিরে সেই একই মূর্ত্তি মূর্ত্ত অমূর্ত্তের ভেদ রহিল না, জননী কখন সাকারা, কখন নিরাকারা, যখন স্বর্ণগঠিতা দশভুজা মূর্ত্তি, কখন সন্তানের হৃৎপদ্মবিহারিণী।

ভাই বাঙালী, মুখে যখন বল, বন্দে মাতরম্, মনে তখন কি সঙ্কল্প হয়, হৃদয়ে তখন কি ভাব উদয় হয়? পঁচিশ বৎসরের এই গান, এতকাল ত বাঙালীর মুখে পথে ঘাটে শুনিতে পাওয়া যায় নাই? সম্পদের সময় মাকে মনে পড়ে নাই, আজ মাতার ঘোর বিপদের দিনে, সন্তানের ঘোর বিপদের দিনে মাতাকে মনে পড়িয়াছে। মনে যখন পড়িয়াছে তখন বুকে বল বাঁধ, দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কমলাকান্তের কথায় বল ঃ—

"এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিণি!—এসো মা গৃহে এস—সপ্তকোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, চতুর্দ্দশকোটি করযোগ করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। সপ্তকোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, চতুর্দ্দশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। সপ্তকোটি মুখে ডাকিব মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে। শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে। ডাকিব—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! **উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।"

সর্ব্বকালদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা কর, এই ব্রত গ্রহণ কর, ইহার সাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হও।

যে মহাপ্রভাবশালী মহাপুরুষ এই গীতমন্ত্র দেবভাষায় ও বঙ্গভাষায় মন্দারমল্লিকামাল্যবৎ গ্রথিত করেন, যিনি আমাদের মন্ত্রগুরু, তিনি একাদশ বৎসর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই গীত ক্ষণিক কল্পনার রচনা নয়, লিখিতে যে টুকু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহাই ইহার রচনার কালের পরিমাণ নয়। কবির নিজের রচনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই গীতের অন্তর্নিহিত ভাবলহরী তাঁহার মনে উপচিত হইতেছিল। সমগ্র জাতির বেদনা, জননী জন্মভূমির মর্ম্মপীড়া তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, সেই বেদনা সেই পীড়া নিবারণের মন্ত্রস্বরূপ এই সঙ্গীত ধীরে ধীরে তাঁহার কল্পনায় শতদল পদ্মের ন্যায়

উন্মেষিত হইয়াছিল। তিনি কি মনে করিয়াছিলেন যে এই মহান্ সঙ্গীত একখণ্ড উপন্যায় গ্রন্থে চিরকাল নিহিত থাকিবে? তিনি প্রাচীন ঋষির ন্যায় ত্রিকালদর্শী ছিলেন না, তথাপি এ কথা বিশ্বাস হয় না যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনাস্রোত কল্পনার অথবা প্রতিভার চক্ষে কিছুমাত্র দেখিতে পান নাই। এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, গাম্ভীর্য্যে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই গীত রচিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আরও অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কবি পূর্ব্ব পথ অনুসরণ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সঙ্গীতে অতীতের স্মৃতি ও বর্ত্তমানের বিলাপ নাই। এই স্মৃতিবিলাপমিশ্রিত সুর আমরা অনেক দিন সাধিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একা বুঝিয়াছিলেন যে এ সুর পরিবর্ত্তন করিবার দিন আসিবে। নূতন উৎসাহে, নূতন বলে, অনুতাপ পরিতাপ ত্যাগ করিয়া বাঙালীকে আর এক গান করিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দিব্য কর্ণে তিনি শুনিয়াছিলেন, সপ্তকোটি বাঙালী এককালে বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! পঁচিশ বৎসর পরে আজ আমরা সহজ শ্রবণে শুনিতেছি, সপ্তকোটি বাঙালী বলিতেছে, বন্দে মাতরম্!*

আনন্দমঠ গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে কবি স্বর্গগত কোন প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।" স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আজ আমরাও অনুভব করিতেছি। স্বর্গস্থিত কবির বাণী আজ আমাদের মানসশ্রবণে কুহরিত হইতেছে। আজ যে মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, সমুদ্রকল্লোলের ন্যায়, বিশ্বম্ভরের রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনির ন্যায়, বাঙালীর কোটি কণ্ঠ হইতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠিতেছে, এই শব্দ কি স্বর্গে কবির কর্ণে অমৃতের ন্যায় স্পর্শ করিতেছে না? ক্ষুব্ধ, মথিত সমুদ্রবৎ বাঙালীর হৃদয় তরঙ্গে তরঙ্গে ডাকিতেছে, বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! প্রবল ঝঞ্ঝাতাড়িত বাঙালির হৃদয়ে বায়ু গর্জ্জিয়া বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আবার আশা বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলিতেছে, বন্দে মাতরম্! নদীর কলকণ্ঠে, দক্ষিণ বাতাসের মর্ম্মরে কহিতেছে, বন্দে মাতরম্! মাতা সর্ব্বত্র, সর্ব্বত্র তাঁহার বন্দনা! কবির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বাঙালী তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইল।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে!

ভাই, মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ, এখন সাধন কর। সাধন কর,

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

সাধন কর,

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

সাধন কর, "আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই—স্ত্রী নাই, পুত্ত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সুজলা, সুফলা, / মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা," সুখদা বরদা জননী জন্মভূমি।

মুখে বল, বন্দে মাতরম্!
কণ্ঠে গান কর,

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!

---

*শুধু বাঙালী কেন, বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ভারতবাসী বন্দে মাতরম্ বলিতেছে। সমস্ত ভারতের মুখে যে এই ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন সংশয় নাই।

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাম্!
নমামি কমলাম
অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরং বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।

(প্রবাসী, পৌষ ১৩১২)

স্ব ও দেশ

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে কোন কোন কাগজে একটা প্রস্তাবের কথা পড়িয়াছিলাম যে, যাহারা মদ খায় তাহারা যেন বিলাতী মদ ছাড়িয়া দেয়। অর্থাৎ খারাপ কাজটা না করিয়া উপায় নাই; সুতরাং দেশী রকমে কর! ইহা অতি চমৎকার "স্বদেশীত্ব"! সে দিন একটা গল্প শুনিতেছিলাম যে, কলিকাতায় একজন পাহারাওয়ালা, একটা লোককে পথে মাত্‌লামি করার জন্য ধরিবার চেষ্টা করায় মাতাল বলিল, "থাম, মন্তরটা মনে ক'রে নি"। এই বলিয়া সে "বন্দে মাতরম্" চীৎকার করিয়া উঠিল, ও অমনি কতকগুলি যুবক, কেহ বিপদে পড়িয়াছে ভাবিয়া, সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পাহারাওয়ালা বলিল, "বাবুরা, ও যে মাতাল।" মাতাল তখন বলিল, "কেন বাবা, আমি ত দেশী মদ খেয়েছি?" সংবাদপত্রে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে এই মাতালটির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

স্বদেশী আন্দোলন প্রারম্ভেই শুনিলাম, রাশি রাশি বিদেশী সিগারেট পুড়াইয়া ফেলা হইতেছে। ভাবিলাম, আপদ্ গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই খবরের কাগজওয়ালারা উল্লাসের সহিত জানাইলেন যে, সিগারেট্‌সেবীদের মুখে বিদেশী সিগারেটের পরিবর্ত্তে স্বদেশী বিড়ি শোভা পাইতেছে এবং স্বদেশী সিগারেটও প্রস্তুত হইতেছে! তখন আমাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম, সিগারেটসেবীরা স্বদেশভক্তির প্রভাবেও স্বভাব বদ্‌লান, কু-অভ্যাসত্যাগ, সুসাধ্য মনে করিতে পারিলেন না।

দেশে যে স্বদেশভক্তির হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এমন কেন হয়?

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই প্রথমে মনে হয় "স্বদেশ" কথাটি দুটি শব্দের সংযোগে গঠিত হইয়াছে, —"স্ব" এবং "দেশ"। যাঁহারা "স্ব" এর উন্নতি করিতে পারেন না, তাঁহারা দেশের উন্নতি কেমন করিয়া কবিবেন? ইহা ভুলিয়া যাওয়াইতে এরূপ হয়। "ইন্দ্রিয়ের দাস, যে বা বার মাস," স্বদেশ উদ্ধার তাহার কার্য্য নয়, ইহা খুব পাকা কথা, খুব বড় কথা। এখানে একথা তুলিলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, মশা মারিবার জন্য কামান পাতা হইতেছে। সুতরাং অত বড় কথা না বলিয়া, ইহা বলিলেই হইবে যে, স্বদেশভক্তকে, পাপাচর ত দূরের কথা, বিলাসিতা ও সৌখিনতাও ত্যাগ করিতে হইবে। "স্ব" এর উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। এই জন্য অনাবশ্যক ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিয়া, এখন যে দেশী জিনিষের প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তজ্জন্য কিভাবে "স্ব" এর উন্নতি আবশ্যক, তাহার কথাই ধরা যাক্। সকলেই জানেন যে, সাধারণতঃ মানুষ নিজের ক্ষতি করিতে চায় না। কিন্তু যখন প্রকৃত স্বদেশভক্তি জন্মে, তখন ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া মনে হয় না। আমরা কিন্তু বণিক্ ও কারিকরদিগকে স্বদেশভক্তির প্রভাবে স্বার্থত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ কিসে সিদ্ধ হয়, তাহাই বুঝিয়া সিদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছি। মানুষে এবং ইতর প্রাণীতে একটা প্রভেদ এই যে, মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া কাজ করে, ইতর প্রাণীরা তাহা করে না। আমরা বণিক্ ও কারিকরদিগকে তাঁহাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গলের জন্য দেশী দ্রব্যের প্রতি মন দিতে বলিতেছি। তাঁহারা অনেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতেছেন, কিন্তু অনেকে বুঝিতেছেনও না। অনেকে দেশী জিনিষের কাট্‌তি দেখিয়া উহার দাম খুব বাড়াইয়া দিতেছেন; বুঝিতেছেন না যে তাহাতে লোকে আবার সস্তা বিলাতী জিনিষ কিনিতে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং এস্থলে কারিকর ও বণিক্‌দের "স্বদেশে"র উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই তাঁহাদের "স্ব"এর উন্নতির অগ্রে প্রয়োজন মন হইতেছে। এই উন্নতি তাঁহাদের শিক্ষার, জ্ঞানের, বুদ্ধির, নীতির উন্নতি।

তারপর আর একদিক্ দেখুন। আমরা চাই, দেশী চিনি; কিন্তু ব্যবসাদারেরা বিদেশী চিনিকেই মাড়িয়া নানা উপায়ে তাহার রং দেশীর মত করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া আমাদিগকে ঠকাইতেছেন। কারণ বিদেশী চিনিতে লাভ বেশী। আমরা চাই দেশী কাপড়। ব্যবসাদারেরা সুযোগ পাইয়া দেশী কাপড়ের খুব দাম চড়াইয়া লাভ করিতেছেন। ইহাতে তবু প্রতারণা নাই; কিন্তু কোন কোন ব্যবসাদার বিলাতী কাপড়ে দেশী ছাপ মারিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইতেছেন। এইরূপ লোকদের "স্ব" নৈতিক হিসাবে উন্নত না হইলে, তাহাদের স্বদেশের মঙ্গল কেমন করিয়া হইবে?

ইংরাজ কারিকর ও দোকানদার দেশী কারিকর ও দোকানদারগণ অপেক্ষা সাধু কি না, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা সকলেই জানেন, যে অনেকে বেশী দাম দিয়াও ইংরাজের নিকট হইতে জিনিষ লয়, এই ধারণায়, যে তাহা হইলে ঠকিতে হয় না, দরদস্তুর করিতে হয় না। এই ধারণা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ইহা ত ঠিক্ যে আমাদের দেশী কারিকর ও ব্যবসাদারদের সম্বন্ধেও এইরূপ ধারণা জন্মিলে তাঁহাদের ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে। আমাদের দেশের বড় ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকদের মধ্যে সৎলোক অনেক আছেন, কিন্তু অধিকাংশ কারিকর ও ব্যবসাদারকে বিশ্বাস করা যায় না, এইরূপ ধারণা কেন জন্মিল? তাহাতে কি তাঁহাদের কোন দোষ নাই? আমরা স্বীকার করি, ক্রেতাদেরও দোষ আছে, তাঁহারা "একদর" বলিলেও অনেকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দোষ একপক্ষের বা উভয় পক্ষেরই হউক, এখানেও দেশের উন্নতির আগে, "স্ব" এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

ছুতার, মুচি, দর্জ্জি, সেক্‌রা প্রভৃতি কারিকরেরা কথা রাখে না, যে দিন ফরমাইসি জিনিষ দিবে বলে, সে দিন দেয় না, দরদস্তুরও অনেক করে। ইংরাজেরা যদি এই সকল কাজে হাত দেয়, তাহা হইলে এই সকল কারিকরদের অন্নমারা যাইবে। বাস্তবিকও দেখিতেছি যে আমরা অনেকে স্বদেশী বলিয়া যে সকল জুতা পরিতেছি, তাহা ভারতবর্ষে ইংরাজ পরিচালিত কারখানায় নির্ম্মিত। কারিকর দেশী, কিন্তু বেশীর ভাগ লাভ বিদেশী লোক পাইতেছে। দেশী কারিকর নিজে কারবার চালাইতে পারিলে এমন হইত না। তাহার মূলধন নাই বটে; কিন্তু তাহার "স্ব"এরও উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

আমাদের দেশে মজুরী বিলাত অপেক্ষা অনেক সস্তা। তবুও আমাদের শ্রমজীবী ও কারিকরদের সাহায্যে উৎপন্ন জিনিষ বিদেশী জিনিষের সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে না কেন? এরূপ যে কেবল তাহাদের দুর্ব্বলতা বা নৈপুণ্যের অভাব প্রযুক্ত হয়, তাহা নয়। তাহাদিগকে না খাটাইলে তাহারা খাটিবে না, ফাঁকি দিবে; বিদেশী শ্রমজীবী ও কারিকর অপেক্ষা দেশী লোকদিগের নিকট কাজ লইতে হইলে তাহাদের উপর বেশী চোখ রাখা (Supervision) দরকার হয়। ইহারও ত খরচ আছে। সুতরাং এখানেও দেখিতেছি, দেশের আগে "স্ব"এর উন্নতি আসিয়া পড়িতেছে।

দেশী অনেক জিনিষ এখন হইতেছে, আগেও হইত। অনেক জিনিষ, দেশী বলিলেই, বাহিরে দেখিতে বেশ হইলেও অনেকেরই মনে যেন একটা সন্দেহ হয় যে উহার ভিতর কোথায় কি একটা ফাঁকি আছে। সকল কারিকরই কি প্রতারক? তা নয়। কিন্তু অনেকের দোষে এই সন্দেহ জন্মিয়াছে। কাজেকাজেই এখন প্রত্যেকের "স্ব" উন্নত না হইলে দেশীর উপর বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিবে ও বদ্ধমূল হইবে?

বিদেশী শিল্প ও কলার উন্নতি একটা কারণ যৌথ কারবার। আমাদের দেশে যৌথ কারবারের সংখ্যা কম। তাহার একটা কারণ এই যে আমাদের পরস্পরের প্রতি, কার্য্যদক্ষতা ও সাধুতা হিসাবে, বিশ্বাস নেই। যৌথ কারবারের কথা উঠিলেই, কত লোক আছেন, যাঁহারা লোপপ্রাপ্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব এইরূপ কারবারগুলির ফর্দ্দ আওড়াইয়া দেন। তাঁহারা যে মিথ্যা কথা বলেন, তা ত নয়। অথচ যৌথ কারবার না চালাইলেও উপায় নাই। সুতরাং আমাদিগকে কার্য্যক্ষমতা ও সাধুতা হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ সেই পুরাতন কথা, "স্ব" এর উন্নতি আবার আসিল।

আমাদের দেশের লোকের অদৃষ্টের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকায় উদ্যোগিতা দেখা যায় না। অথচ এই দেশেই প্রাচীন কাল হইতে বলা হইতেছে, "উদ্‌যোগিনম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী"। অদৃষ্টবাদ না ঘুচিলে দেশের উন্নতি কোথা হইতে হইবে? সুতরাং এখানেও "স্ব" এর উন্নতির প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

যখন স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হয়, তখন অনেকেই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিবে? আমরা কি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিব? এখনও অনেকে সেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা না রাখিতে পারিবার কারণ নানা প্রকার হইতে পারে। দেশী জিনিষ ব্যবহারে যথেষ্ট জিনিষ না পাওয়া প্রভৃতি অসুবিধা আছে, কষ্ট আছে, কোন কোন বিষয়ে ফ্যাশন ও বাহারের কিছু কম্‌তি হয়; খরচ বেশী হয়, এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, গবর্ণমেন্টের ভয়, রাজপুরুষদের উৎপীড়ন আছে। তাহা হইলে কথাটা এই দাঁড়াইতেছে, যে, আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য অসুবিধা ও কষ্ট সহিতে পারিব কি না, আর্থিক ক্ষতি সহিতে পারিব কি না, কিছু কম বাহার দেওয়া ও বাবুয়ানি করা আমাদের পোষাইবে কি না, এবং রাজপুরুষদের ধমক, গুর্খার ও পুলিসের লাঠি এবং সম্ভবতঃ জেলে যাওয়া আমরা আগ্রহ্য করিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এই সন্দেহ যাইবে কেমন করিয়া? পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করিলে যাইবে না। ভগবানের দিকে তাকাইলে যাইবে। প্রকৃত স্বদেশভক্তি ও ভগবদ্‌ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। ভগবান্ চান যে আমরা মানুষ হই, আমাদের জাতিটা মানুষ হউক, দেশের মঙ্গল হউক। যাঁহারা তাঁহার এই ইচ্ছার সহিত নিজ নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের ভয় নাই। তাঁহারা সব কষ্ট ও অসুবিধা সহিতে পারেন, অর্থনাশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, নিজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য জবড়জঙ্গ সাজিতে পারেন, ধমক লাঠি গলাধাক্কা সহিতে পারেন, জেলে যাইতে পারেন, এবং দরকার হইলে প্রাণটা দিতে পারেন। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাসবান্ হই; তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞার অটল থাকিতে পারিব কি না, এ সন্দেহ আমাদের চিত্তের ত্রিসীমায় আসিতে পারিবে না। আমাদের দেশে এরূপ বিশ্বাসবান্ স্বদেশভক্তের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, সুখের বিষয় এরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। আমাদের স্বভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ লোকের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই দেশের উদ্ধার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে।

সকলেই জানেন, দেশের মঙ্গলের জন্য একদল সাহসী উদ্যমশীল লোকের দরকার। তাঁহারা চাকরীর জন্য লালায়িত হইবেন না, নানা কাজ শিখিবেন, নানা কাজে হাত দিবেন;— কখন বা কৃতকার্য্য হইবেন, কখন বা বিফলকাম হইবেন; দশবার পড়িবেন, দশবার উঠিবেন। এরূপ লোক বিবাহিত ও পরিবারগ্রস্ত হইলে চলিবে না। একটা পেট চালানো খুব সোজা; তাহাতে খুব সাহস এবং উদ্যমও থাকে। এইরূপ সাহসী উদ্যমশীল লোক বাল্যবিবাহিত সমাজে মিলে না। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য একটি সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমের এবং শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ কাজের গৌরব লোকে বুঝে না। এইজন্য শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া পাশকরা ভদ্রসন্তান ১০।১৫ টাকার চাকরী করা, ছুতার কামারের কাজ করা অপেক্ষা ভাল মনে করেন। ৩০৲ টাকা দিয়া একজন ভাল ছুতার পাওয়া যায় না, কিন্তু বি, এ, পাশ করা লোক পাওয়া যায়। এই অবস্থায় দুটি কুফল জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ যথেষ্ট চাকরী না থাকায়, লেখা পড়া জানা লোকেরা দারিদ্র্যে কাল কাটাইতেছে, এবং স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতা হারাইতেছে;—কারণ উমেদারী বা চাকরী, উভয় অবস্থাই স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতার শত্রু। দ্বিতীয়তঃ, কারিকরের কাজ অশিক্ষিত একটি একটি শ্রেণীর লোকের হাতে থাকায়, ঐ কাজে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকের মাথা খেলিতেছে না; ধনশীলী লোকদের মূলধন শিল্পকলায় খাটিতেছে না। তাঁহাদের বুদ্ধি ও উদ্যম এইরূপ কাজে লাগিলে কেবল যে কাজের উন্নতি হইত তা নয়, দেশের সম্পদ্ বাড়িত;—শুধু আর্থিক সম্পদ নয়, মানসিক সম্পদও বাড়িত, লোকে অধিকতর আত্মনির্ভরপ্রিয় স্বাধীনচিত্ত ও তেজস্বী হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শারীরিক শ্রম ও শিল্পকলাসম্বন্ধে দেশের লোকদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার। সুখের বিষয় এরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিদেশে ও স্বদেশে কারিকর শ্রেণীবহির্ভূত অনেক যুবক নানা কলা ও শিল্প শিখিতেছেন। এমন কি কলিকাতায় ভদ্রসন্তানেরা মাথায় কাপড়ের মোট লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। এই সকল যুবকেরা ধন্য। ইঁহারা এখন, বামুনের ছেলে বা কায়স্থের ছেলে, এ অভিমান ভুলিয়া গিয়া দেশের ছেলে হইয়াছেন। ইঁহাদের "স্ব" বদ্‌লাইয়া গিয়াছে বলিয়া ইঁহারা দেশের প্রকৃত সেবক হইতে পারিয়াছেন।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার দরকার নাই। আমরা বুঝিতে পরিতেছি যে দেশের মঙ্গল করিতে হইলে "স্ব" এর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নিজে ভাল না হইলে অন্যের বা স্বজাতির ভাল কেমন করিয়া করিব? কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা যতদিন সর্ব্ববিধদোষশূন্য না হইব, ততদিন দেশের কাজে হাত দিব না? তা নয়। ভাল না হইলে যেমন দেশের কাজ করা যায় না, তেমনি আবার দেশের কাজ প্রাণের সহিত করিতে গিয়াও মানুষ ভাল হইয়া যায়, মানুষের "স্ব" বদ্‌লাইয়া যায়। কাপড়ের মোট বাহক ভদ্র যুবকদিগকে আগে জাত্যভিমান, বংশের অহঙ্কার ছাড়িতে বলিলে তাঁহারা হয় ত তাহা ছাড়িতেন না; কেন তাঁহাদিগকে আগে ছাড়িতে উপদেশও দেয় নাই। এখন কিন্তু তাঁহারা দেশের কাজে লাগিয়া দেখিলেন, যে ইহাতে কিয়দ্দূর গিয়া থামিলে বা পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না, মোট বহা দরকার হইলে মোটই বহিতে হইবে। তেমনই আমরা দেশের কাজে প্রাণপণ করিয়া লাগিব। যখনই আমাদের কোন প্রিয় পাপ, কোন ব্যসন, কোন বিলাসিতা, কোন সৌখীনতা, কোনও প্রকার ভয়, মান, অভিমান, আলস্য বা দুর্ব্বলতা জন্মভূমির সেবার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইবে, তখনই তাহাকে নির্ম্মমভাবে দূর করিয়া বীরের মত, কিন্তু বিনীত ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইব। আমরা উৎপীড়িত হইলেও উৎপীড়ন করিব না; গবর্ণমেণ্টের অনেক লোক বে-আইনী অন্যায় কাজ করিতেছে, আমরা কোন বে-আইনী অন্যায় কাজ করিব না। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাও ভুলিব না, বা ছাড়িব না। সকলে মনে রাখিবেন, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কাজ—স্বদেশী প্রতিজ্ঞা রক্ষা। ইহা রাখিবার জন্য আমাদের চরিত্রের, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা অবিলম্বে করিতে হইবে। ইতি। ১লা পৌষ, ১৩১২।

(প্রবাসী, পৌষ ১৩১২)

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত]

উৎসর্গ

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীদিগের করকমলে অর্পণ করিলাম।

— লেখক

ভূমিকা

গত পৌষের বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুনর্মুদ্রিত হইল।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্দ্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্ত্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়। বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলাম।

সম্প্রতি এডুকেশন গেজেট বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার সংস্কৃত অনুবাদ বাহির হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
চৈত্র ১৩১২

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের
মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন।
প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই
শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী
বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস
খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে
বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কালির উদয় হ'ল। লোকে ধম্মকম্ম ছাড়্‌তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হল।
সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী
ভাবলেন—হায় আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন,
তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে, আমি বাঙলা
ছেড়ে চল্‌লেম। রাজা কেঁদে বললেন—না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে
আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক
পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনলেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়েত এলেন।

রাজা তাদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগ্‌ল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনেধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা ; তিনি আবার চঞ্চল হলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতিধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে, মোছলমান মস্‌জিদ্ তুলতে লাগ্‌লেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হল। হিঁদু- মোছলমান এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী ভাব্‌লেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠানবাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেমনি, হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগল, আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না, আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌ব; তাদের ভাই-ভাই, একঠাঁই করব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব। দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌বেন, তখন হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হবে; ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী কর্‌লেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগীর। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাঙলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগিরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্‌ল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোরডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগ্‌ল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌ল।। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ামানুষে শিশু সাজ্‌ল; ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন,; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বললেন—আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা । চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন

একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ত। আলমগির বাদশার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বল্‌লে এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ কর্‌ছে; থাক্, এদের দু-দল ক'রে দিচ্ছি; একদিকে যাক মোছলমান, একদিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত কর্‌ছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙ্গে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দু-দল ক'রে দিলেন—এক দিকে গেল হিঁদু এক দিকে গেল মোছলমান। পূর্ব-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলার থাকা চল্‌ল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না, তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই কর্‌তে চাইলেন; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুঁতুল খেলা কর্‌ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিন্‌ব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা-কালিতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্-বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেব না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাঙলায় লক্ষ্মী বাঙলার থাক্‌বেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিটা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙালীর লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙালার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাঙলার মেয়ে ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বল্‌ল না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐ দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বলবে না। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌বে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলার থাকবেন। সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই॥
ভেদ নাই ভেদ নাই॥ ভাই ভাই, একঠাঁই।
ভাই ভাই একঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই॥

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পর্‌বো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন্ কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন।

বাঙলার মাটি	বাঙলার জল	বাঙালীর পণ,	বাঙালীর আশা,
বাঙলার বায়ু	বাঙলার ফল	বাঙালীর কাজ,	বাঙালীর ভাষা,
পুণ্য হউক,	পুণ্য হউক,	সত্য হউক,	সত্য হউক,
পুণ্য হউক,	হে ভগবান্।	সত্য হউক,	হে ভগবান্।
বাঙলার ঘর,	বাঙলার মাঠ,	বাঙালীর প্রাণ,	বাঙালীর মন,
বাঙলার বন,	বাঙলার হাট,	বাঙালীর ঘরে	যত ভাইবোন,
পূর্ণ হউক,	পূর্ণ হউক,	এক হউক,	এক হউক,
পূর্ণ হউক,	হে ভগবান্।	এক হউক,	হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম্

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি, অথবা পূর্ব্বদিনেরর রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পরে ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।

দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি কারো ভয় রেখেছি?

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি—তিনি কি আমাদিগকে মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াছি—তিনি কি আমাদিগের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন? আজ বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে—তিনি তাই তাঁহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ভাল ধরিতেছি সেই ভালই তিনি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ করিতেছেন যে পর প্রত্যাশাদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। "অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" বাঙ্গালী তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূরের কথা—সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্য্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবণ মূর্ত্তিমান্ সাম্যমৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন। ইহাতে যে আমরা কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? তবে কি বানরিপাড়ার* পিটুনী পুলিসের অত্যাচারে তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই? তবে কি বরিশালে গুর্খার গুঁতায় আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব।

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া ত আমাদের আর আনন্দ ধরিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা ত তোমাকে আরও বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরীপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর আজ কলিকাতার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে সেই বানরীপাড়ার কথা। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে ঐ বানরীপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের অশ্বিনীকে, মাদারীপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশী বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আদ্যনাথকে, ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙ্গা বাংলা আর কেমন করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না, তাহাদিগকে আমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ জানাইতেছি—যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত। ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিণ্টো মর্লী যতই পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন—ততই ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্য্যাতন হইবে—ততই ভাঙ্গাবাংলা জোড়া লাগিবে।

---

* বানরিপাড়া বরিশাল শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরের একটি গ্রাম, ১৯০৫ সনে নভেম্বরের মাঝামাঝি গুর্খা পুলিস দ্বারা গ্রামবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার সাধিত হয়।

মৃত্যুতে জীবন! আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা জীবনলাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি, আমাদিগের কাজ কর্ম্ম সব বহির্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,—

আপনাতে আপনি থাকো
যেও না মন কোনখানে
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মুখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে আসক্তির—সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারী এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি জয়কালীর বাড়ী একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি—আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী- প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলণ্ডের কুয়াশাবৃত-অম্বরে ভারতবাসীর আশাসূর্য্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলণ্ডের মহাসভার উদারনীতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন—তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি, তাই বলি দে জয়-কালীর বাড়ী একশ পাঁঠা।

(২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬)

অমৃতং মতি ভাসিতম্

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

প্রিয় "অমৃত" বলিতেছেন, এত দেশ থাকিতে বরিশালে কন্‌ফারেন্স করিবার কারণ কি?

বাস্তবিক, কারণ কি? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কারণ কী?

আমরা বলিতেছি, এবারকার কন্‌ফারেন্স কামস্কট্‌কায় করিলে হানি কি? কামস্কট্‌কা কিঞ্চিৎ কটমট বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে এযাত্রা সিংহলে সমবেত হইলে ক্ষতি কি? বিজয়বাহুর পর আর কোন প্রবল প্রতাপশালী বাঙ্গালী সিংহলে জয়পতাকা প্রোথিত করেন নাই। এবার সিংহল বিজয় করিলে হয় না? রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

"প্রতাপোইগ্রে ততঃ শব্দঃ"

বাঙ্গালীর প্রতাপ "বন্দে মাতরম্" কন্যাকুমারীর পথে লঙ্কায় উপনীত হইয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। এইবার সেখানে কণ্ঠযন্ত্র সহযোগে "শব্দ" করিলেই ত দিগ্বিজয়ের অর্দ্ধেক ফতে হইয়া যায়? আর সিংহল যদি মনঃপূত না হয়, হিন্দুর প্রাচীন উপনিবেশের ফর্দ্দেও দেশের অভাব নাই। যবদ্বীপ অর্থাৎ যাভা, বলিদ্বীপ অর্থাৎ বালি প্রভৃতি সমুদ্রোর্ম্মিচুম্বিত দেশে কনফারেন্স হইল না কেন? হনোলুলু ও চন্দ্রকোণা, ফিলিপাইন ও তারকেশ্বর, উত্তর মেরু ও ফরেসডাঙ্গা—সব পড়িয়া রহিল, আর বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদে লাট ফুলারের দুটি চক্ষুর বিষ, গুর্খা-বুটমর্দ্দিত বরিশালেই কন্‌ফারেন্স?

এ নির্ব্বাচন কে করিল?

"অমৃত" বলিতেছেন, দুর্দ্দান্ত বরিশালী পুলিস রাঘব বোয়ালের মত বদন ব্যাদান করিয়া আছে। এই যমের মুখে বাঙ্গলার বাছা বাছা নায়কদের নিক্ষেপ করিবার দুষ্ট কল্পনা কাহার? বাহিরের লোকে, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বরিশালের নেতোদের পুলিসের গ্রাসে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধিতে এই টোপ্ ফেলে নাই ত? বরিশালের অধিবাসীরা বিভীষিকায় ভয় করে না, ফুলারের মনে এই কাল্পনিক সংস্কার বদ্ধমূল করিবার বৃথা চেষ্টায়, বরিশালে কন্‌ফারেন্স চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন হয় নাই ত? "অমৃত" শেষে প্রায় মুক্তকচ্ছ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলি, বরিশালে এবার কন্‌ফারেন্স হইবে ত? যদি বা হয়, সেখানে নামজাদার বদলে বেকার নামহীন নগণ্য প্রতিনিধিদের ভিড় হইবে না ত?

বলা বাহুল্য , এ সব "অমৃতের" প্রশ্ন—অমৃতায়মান অচল অটল সিদ্ধান্ত নয়। কেন না, তাহার পরই অমৃতবাজার বলিতেছেন, এসো, আমরা এক লহমার জন্যেও ধরিয়া লই যে, বরিশালবাসীর হৃদয়ে বল দিবার জন্য, প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্যই কন্‌ফারেন্স হইতেছে। বরিশাল অনেক সহিয়াছে, এখনও তাহার ক্ষতমুখে রুধির ঝরিতেছে অতএব, বরিশালই কনফারেন্সের একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র। আমরা বলি সাধু!

অমৃতে আমাদের কোনও কালে অরুচি নাই। বিশেষতঃ সংপ্রতি অত্র দেশে মতান্তর ঘটিলেই মনান্তর, এবং মনান্তর ঘটিলেই একতা নষ্ট হইতেছে। এক্ষেত্রে যত দিন এই একতার জোড়-কলম বেশ জুড়িয়া না যায়, ততদিন আর মতান্তরের ঝঞ্ঝা তুলিয়া কাজ নাই। অগত্যা আমরা প্রসন্নচিত্তে কামস্কটকা, হনোলুলু যবদ্বীপ প্রভৃতির কন্‌ফারেন্স বক্ষে ধরিবার দাবী তুলিয়া লইতেছি। বরিশালেই কন্‌ফারেন্স বসুক।

এখন দেখা যাক, ভাবী প্রতিনিধিদের অবস্থা। "অমৃতে"র ভাণ্ড হইতেই আমরা কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এত তথ্য, প্রশ্ন, সম্ভাবনা বিভীষিকা সংগ্রহ করিতেছি। আমর এক পশলা অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে, বোধ করি, কাহারও আপত্তি নাই। আর, যখন এহাটে কোনও আপত্তিই তুলিবার রীতি নাই, তখন আর ভয় কি? "অমৃত" সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকীর ন্যায় "আকাশে" জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ধর্মক্ষেত্রে বরীশালে

সমবেতা যুযুৎসবঃ", সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ও মতিদাদার ন্যায় নায়কদের ধরিয়া বরিশালের জেল-নামক জঘন্য খাঁচায় পুরিবে না ত? বরিশালের কন্‌ফারেন্সের পাণ্ডা ও নেতাদের আবার অনাহারী কন্‌ষ্টেবল করিবে না ত?

আমরা বলি, একটু ইংরেজী করিয়াই বলি, সে সব এখন ভবিষ্যৎ গর্ভিনীর গর্ভে। যখন দৈবজ্ঞ ঠাকুর এত খড়ি পাতিয়াও ফিরিঙ্গীর অভিসন্ধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের বিশ্বাস, উত্তরের আশা নাই।

এবার ত বরিশালে দুর্ভিক্ষ। শুনিয়াই একটু দমিয়া গিয়াছি। "অমৃত" ভুলিয়া যান, কিন্তু আমাদের মনে আছে,—রবিশালে কন্‌ফারেন্সের কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। তখন স্বদেশীও ছিল না, সুতরাং মালক্ষ্মীর অন্নক্ষেত্র বরিশাল হইতে পেলার হিসাবে মনে করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ বালাম সংগ্রহ করিয়া আনিব। দুর্ভিক্ষ বরিশালে মানুষ খাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশারও মাথা খাইয়াছে। পেলা চুলায় যাক, খোরাকীর ভাবনায় ঘুম হইতেছে না। অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত কিরূপ? রসদের উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। রসদের পরিপাটী ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তাই অমৃতের কেবল নেতাদের চিন্তা, আর আমরা প্রতিনিধিদের ভাবনায় অস্থির।

যদি পোলাও কাবাব না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বরিশালই কারাগার। গজৎ একেই জীর্ণারণ্য, তার উপর কন্‌ফারেন্সে যদি আলুভাতে ভাতই সম্বল হয়, তাহা ইলে জেলে যাইতেই বা হানি কি? বরিশালের জেলে দাদখানি চাউলের অন্ন, একটু ঝোল ও কিঞ্চিৎ বল্‌কা দুধ পাইব ত? হরিনামের ঝুলিটি হাতে রাখতে দিবে ত?

এবারে "অমৃতে"র হ্যামলেট-ভাবের অনুধ্যান করুন। To be or not to be, that is the question। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ বোধ করি কোনও মহিলাকবি এইরূপ করিয়াছেন, "হয় কি না হয় প্রশ্ন ইহাই এখন।" প্রশ্ন গুরুতর। যাই কি না যাই একদিকে চক্ষুলজ্জা, লোকের উপহাস, ফিঙ্গের উপদ্রব। ওদিকে গুর্খার গুঁতার আশঙ্কা, নিদারুণ জেলের ভয়, ফিরিঙ্গির প্রেম-সাধে বাদ, তার উপর দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রসাভাব। কি করি। যাই কি না যাই! "অমৃত" বলিতেছেন, এবার সকলেই চল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ চৌহদ্দী করিয়াভাঙ্গা ও অভাঙ্গা, সমগ্র বাঙ্গালার নায়ক বা নেতা মনুষ্যদের একটা ফর্দ্দ কর। তাঁহাদের শপথ করাইয়া লও যে, এবার বরিশালের কন্‌ফারেন্সে নিশ্চিত হাজিরা দিব। অবশ্য যাঁহারা 'ইন্‌ভ্যালিড্' অর্থাৎ শয্যাগত তাঁহাদের ছুটি। আমরা আবার বলি সাধু!

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু একটু ত্রুটির উল্লেখ না করিলে নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, এই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঘিরিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া যে জাল ফেলিলেন, ইহাতে এত বড় একটা ছিদ্র রাখিয়া দিলেন কেন? ঐ যে শয্যাগত—মহারন্ধ্র, ঐ পথে ত বাঙ্গালার যত রুই কাতলা, মৃগেল বাহির হইয়া যাইতে পারে! তখন কি পঙ্কচারী রোগা কই সিঙ্গি, চ্যাং ছাঁকিয়া তুলিয়া বরিশালের রাজনীতি দীর্ঘিকায় ছাড়িয়া দিবেন? অমৃত দাদা আপনি যে বলিতেছেন—স্বয়ং যাইবেন, তাহাই কি এই "ইন্‌ভ্যালিড" ছিদ্র থাকিতে ঘটিয়া উঠিবে? কন্‌ফারেন্সের প্রসঙ্গে আপনার বাজারে যেরূপ "হা হতোস্মিন" রব উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আপনার স্নায়ুর অবস্থাও শঙ্কাজনক। আপনি যদি ইন্‌ভ্যালিডের খাতে পড়িয়া যান, তাহা হইলেই ত সব মাটি! নভেলের ভাষায় বলিতে গেলে, বাগবাজারের গগনমণ্ডলের এক কোণে একটু ভয়ের একটু সন্দেহের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে,

"পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন ডাক দিয়া বলে,
লক্ষ্য বিঁধিবারে যত ক্ষত্রিয় সকলে।"

ইহার অর্থ যে নিশ্চেষ্ট দেখিলেই ডাক দিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে বলিতে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নও ডাক দিয়াছিলেন, "অমৃত" ও দিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আওয়াজ ভরাট, অমৃতের গলা একটু কাঁপিতেছে। কালের প্রভাব।

আমাদের পরামর্শ, শুধু ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কর্ম্ম নয়। যদি কন্‌ফারেন্সে সফল করিতে চান, তাহা হইলে যেমন রোগ সেই ঔষধের ব্যবস্থা করুন। প্রথমতঃ ফুলার-ভয় নিবারণের প্রার্থনা করিয়া মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত ও মরলীর নিকট 'তার' করুন। এই দরখাস্ত দুইখানির ও মহারাণীর সেই মামুলি ঘোষণাপত্রের লিখো প্রতিলিপি করিয়া বড় বড় তাম্রময় কবচে রক্ষা করুন। সেই কবচ একটু স্থূল রজ্জুসহযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া বরিশালে গমন করুন, আর ফুলার-ভয় থাকিবে না। অবশ্য নেতাদের জন্য একটু বিশেষ রামকবচ আবশ্যক। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন নেতাদের পক্ষ হইতে প্রজাদের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কবচে তাহাও থাকিবে। গলায় দিবার দড়ি যেমন একটু মোটা ও মজবুৎ হয়, নতুবা ছিঁড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না।

—২৯ মার্চ, ১৯০৬

স্বদেশী প্রসঙ্গ

গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বৎসরেক হইতে বঙ্গে এক অভিনব কর্ম্মস্রোতঃ বহিতেছে। কেবল বঙ্গ নহে, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এই অপূর্ব্বশক্তি সঞ্চরণ করিতেছে; যাহা সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহা ব্যাপ্ত হইয়াছে; যাহা মনের নিভৃতাংশে আবদ্ধ ছিল, তাহা কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা দুই এক দিবসে হয় নাই, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদে হয় নাই বা ইংরাজের তথাকথিত অত্যাচারে হয় নাই! বর্ত্তমান প্রচেষ্টা জগতের সমক্ষে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস! রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা ইংরাজকৃত অত্যাচার ইহার জন্মদান করে নাই।

সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইংরাজ প্রকৃতরূপে অত্যাচারী নহে। সেদিন বরিশালে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম, তাহা কয়জন ইংরাজকৃত? ইংরাজ হুকুম দিয়াছিল বটে, কিন্তু রেগুলেশন-লাঠি ধরিয়াছিল আমাদেরই স্বদেশবাসী;—তাহারা কি বুঝে নাই যে, এই কার্য্য স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসহন্তার উপযুক্ত! কয়জন ইংরাজ, দারোগা সাজিয়া গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের ত্রাস উৎপাদন করিয়া থাকে? দারোগা আর কেহ নহে, আমাদেরই জ্ঞাতিবর্গ! ইংরাজের বৃত্তিভোগী দাস হইলেও পুলিস স্বদেশবাসী; তাহার নিকট আমরা সহানুভূতির দাবী রাখি। পুলিস-শাসন গৌণভাবে স্বায়ত্তশাসনের অন্যমূর্ত্তি! কত দেশীয় হাকিমের অত্যাচার শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতেছি। এ সকল নিন্দা আমাদিগের গায়ে বাজিবে, কেননা—ইহা আত্মনিন্দা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আত্মনিন্দা আত্মহত্যার তুল্য। কিন্তু কি করিব, হৃদয় ভেদ করিয়াও অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল! প্রাচীন অনুশাসন মানিতে পারিলাম না! স্বার্থের বশে—তাহা প্রকৃত স্বার্থ নহে, বিকৃতিমাত্র—আমাদের সর্ব্বনাশ আমরা আপনিই করিতেছি। বহুবিধ অত্যাচার হইতে আমরা আমাদিগকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি, যদি স্বদেশপ্রীতির ছায়ামাত্রও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে! আমাদের উপর অত্যচারের সুবিধা যদি ইংরাজের নেত্রগোচর না করি, তবে ইংরাজ কি করিতে পারে? হয়! ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াই আমরা এমতপ্রকারে অবমানিত হইতেছি। ইংরাজের কি দোষ দিব? আমাদের যদি শক্তি থাকিত, যদি পুরুষত্ব থাকিত, তবে কি বিদেশী এমন করিয়া হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতে পারিত! আমাদের বুঝা উচিত, ইংরাজ এদেশে পরার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া করুণাবর্ষণ করিতে আসে নাই। ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় ইংরাজ দেশবিদেশে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বগৃহে যাহার আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য সে বাহিরে যাইবেই যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাদিগকে অন্যের উপার্জ্জিত ধনের অংশভাগী হইতে হয়, প্রকৃতি তাহাদিগকে নানাপ্রকারে বলীয়ান করেন। অপর জীবের প্রাণহিংসার করিয়া জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া দন্তনখরাদিদ্বারা সিংহব্যাঘ্রাদি ভূষিত হইয়াছে। সাধ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ইতর প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কি প্রকার কৌশল এবং অধ্যবসায়সহকারে পিপীলিকা মিষ্টান্নভাণ্ড আক্রমণ করে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যদি ইতর প্রাণী এতাদৃশ নীতির পরিচয় দিতে পারে; এবং তাহার সমর্থন সঙ্গত বিবেচনা হয়, তবে উচ্চতমবুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সুসভ্য ইংরাজরাজের নীতি সমর্থন করিবে না কেন? পরদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া প্রকৃতি, বৃটেনবাসীকে বিশেষ উপাদানে গঠন করিয়াছেন।

এইজন্য বিদেশী হইয়াও এতদূরে আসিয়া তাহারা আমাদের দুর্ব্বলাংশ সহজেই চিনিয়া লইয়াছিল। তাই, আমাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে আমাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভেদনীতি ইংরাজের হস্তে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া করিতেছে! আমরা যদি হীনাবস্থ না হইব, আমাদের নৈতিক শিক্ষা যদি অধঃগামী না হইবে, আমাদের ধর্ম্মবন্ধন যদি শিথিল না হইবে, তবে আমরা আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত হইব কেন? কুলবধূ যখন অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করেন, লক্ষ্মী তখনই চঞ্চলা হয়েন। লাক্ষাকীট আমরা হৃদয়ে আপনি বসাইয়াছি,

তাহার দংশন-যাতনা আমাদিগকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। যাক্, কি বলিতে কোথায় আসিলাম! আমরা বুঝিতে চাহিতেছি বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তি কোথায়! যতদূর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ইহাকে নেশার উত্তেজনা বলিতে পারি না। এই অভিনব শক্তি রাজার অত্যাচারে, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদমূলক রাজনৈতিক -অনুশাসন-ফলে উদ্ভূত হয় নাই।

আমাদের নেতৃগণ কিন্তু বলিতেছেন যে, বঙ্গবিভাগই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত কারণ। যতদিন বিযুক্তবঙ্গ যুক্ত না হইবে, ততদিন এই আন্দোলন চলিবে। যদিও এখন ফুলার নাই, তথাপি যতদিন ফুলারী হিংসা বিযুক্তবঙ্গের নূতনাংশে ধূমাইতে থাকিবে ততদিন ইহার নিবৃত্তি নাই। এই কথা শুনিয়া, আমরা এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না, নেতৃগণের এতদুক্তির মর্ম্ম কি? আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, বিযুক্ত-বঙ্গ যুক্ত হইলেই এই স্বদেশী প্রচেষ্টার অবসান হইবে? নেতৃগণ কাটা-বাংলা সেলাই করিয়া জুড়িবার জন্য বিলাতি খলিফার শরণাপন্ন হইতেছেন। শ্রীযুক্ত গোখেল বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়া ফিরিয়াছেন, রমেশচন্দ্র করিতেছেন। কটন, ওডোনেল্-প্রভৃতি পার্লামেন্ট-মহাসভায় বকাবকির ত্রুটি করিতেছেন না। বিলাতি কর্ত্তা দার্শনিক পণ্ডিত মরলিও আশ্বাসবাণী-বর্ষণে ক্ষান্ত নহেন! তিনি সার্কুলারও জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু ফুলারী গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহার সার্কুলার মান্য করেন নাই। এখন হেয়ারী গবর্ণমেন্টও তাহা সর্ব্বথা মান্য করিতেছেন না। এ রহস্য বুঝা দায়। মরলি ফুলারের যে সার্কুলার প্রত্যাহার করাইলেন, কার্য্যে সেই সার্কুলারের মর্ম্ম প্রচলিত থাকিতেছে! বস্তুতঃ, মরলিমহোদয়ের আশ্বাসবাণীতে ভরসা বাঁধিতে সাহস পাইতেছি না। ভারত-ভাগ্যে উদারনৈতিক, রক্ষণশীল সবই সমান! রক্ষণশীলদলের "India must be bled" কথাটা যত পরিষ্কার, উদারনৈতিকদলের "Wider element of sympathy is the key note of Indian administration," কথাটা তেমনি তমসাচ্ছন্ন। ইহার মর্ম্মানুধাবন বড়ই দুষ্কর! তবে আমরা কোন আশায় বুক-বাঁধিয়া ইংরাজের পাষাণ-দুয়ারে রাজনৈতিক ব্যাভিচারের প্রতিকারাশায় মাথা-কুটিয়া মরি! গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে সভা ডাকিয়া Resolution করিয়া ইংরাজের নিন্দাবাদে আকাশ-ফাটাইয়া কি ফল পাইতেছি?. উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরের ন্যায় লগুড়াঘাত প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ে দুঃখস্রোতঃ, নয়নে অশ্রু বহাইয়া জগতের নিকট আকৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি। যদি অন্তরের বন্ধন অটুট হয়, তবে বঙ্গ বিভাগ হইলেই কি তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে? যাঁহাদের সুখদুঃখে আবাল্য গালাগালি করিয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, উদ্ধত প্রকৃতির শাসনকর্ত্তার লেখনী কি তাঁহাদিগকে ছিনিয়া লইবে?

আজ যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, ইহার প্রতিকার বিলাতের জনসাধারণ কি করিবে! মানিলাম, বিলাতের আন্দোলনের ফলে কাটা-বাংলা জোড়া লাগিল! কিন্তু সেদিন যেসব সোনার চাঁদের রুধির-ধারায় বরিশাল সিক্ত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যথার স্মৃতি লুপ্ত হইবে? দেহের আঘাত মিলাইবে? প্রাণের ব্যথা কি অন্তর করিবে? যদি হৃদয়শল্য উৎপাটিত না হইল, তবে কোন্ আশায় এমন করিয়া বুকের রক্তপাত করিয়া জন্মভূমির অঙ্গ রাঙাইয়া ফেলিলাম! সেকি রাজনৈতিক অধিকারজন্য? ইংরাজানুশাসনে ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ত সম্যক প্রকারে সম্ভবে না। শ্বেত-কৃষ্ণে প্রভেদ থাকিবে; —তুমি যে বিজিত, তাহারা যে বিজেতা! এ কথা তুমি ভুলিও না! ইংরাজ কদাপি ভুলিবে না! ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ ৭।৮ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যায়। এজন্য এ দেশের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বেতোমুখ প্রভুত্ব আবশ্যক। ইহা রাজনীতির মূলমন্ত্র। সাতসমুদ্র-তেরোনদী পারে আসিয়া খাদ্যের জন্য ইংরাজ কখনও তোমার কৃপার ভিখারী হইবে না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, ভারতবাসীর স্বাধীন ইচ্ছার বশে সে তাহার কর্ম্মসাধন করিতে পারিবে না; এ কথা তাহার বুদ্ধির অগোচর নাই। তোমার কটন, হিউম্, ওয়েডারবরণ কখনও ইংরাজকে এমত পরামর্শ দিবে না, যাহাতে এদেশে ইংরাজাধিপত্যের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা হয়। তোমরা হিন্দু-মুসলমান, তাহারা খ্রীষ্টান, এমত অবস্থাতে তোমাদিগকে তাহাদের অক্ষুণ্ণ-প্রতিষ্ঠার অংশ প্রদান করিবে না। ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবিকার অনুরোধে স্বার্থের অনুরোধে, বলে, ছলে বা কৌশলে, ইংরাজ ভারত করতলস্থ রাখিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইবে, আর তোমরা মাত্র উৎপাদন করিবে, ইহা স্থিরসংকল্প করিয়া সে এদেশে আসিয়াছে। তাহাদের কর্ম্মসাধনোদ্দেশে—ইচ্ছা হয়, সমস্ত বঙ্গ এক করিবে, অসুবিধা হয়, খণ্ড খণ্ড করিবে। তোমার সুবিধার দিকে তাকাইবে না; তোমার বাধা গ্রাহ্য করিবে না। আমরা যতই কেন আন্দোলন করি না, হিউম্-কটন্ যতই কেন আশ্বাস প্রদান করুন না, ইংরাজ কখনো স্বায়ত্তশাসন সম্যকপ্রকারে আমাদের হস্তে প্রদান করিবে না। পৃথিবী চিরদিন বীরভোগ্যা! চিরকাল বীর-হস্ত, ভারত-শাসন করিয়া আসিতেছে। এজন্য ইংরাজকে দোষী করিতে পারা যায় না। দিগ্বিজয় বীর-ধর্ম্ম, ইংরাজ সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশে আসিয়াছে; সে তাহার ইচ্ছামত শাসন করিবে, তোমার কথা শুনিবে কেন? যতদিন আমাদের দুষ্কৃতি থাকিবে, ততদিন আমরা ভোগ করিব। বৃথা ইংরাজকে গালি দিলে, আমাদের হৃদয়-জ্বালা দূর হইবে না। আমাদের নেতৃগণ এ কথা যে বুঝেন না, তাহা বলতে পারি না। তবে কেন তাঁহারা বিলাতে রাজনৈতিক-অধিকার-লাভ-আশায় আন্দোলন করেন, এবং শাসন-ব্যবস্থার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন আশা করেন, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রকীটের জ্ঞানগোচর নহে।

নেতৃগণ যাহাই মনে করুন, আমরা স্পষ্টভাষায় বলিব যে, এই স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গাঙ্গচ্ছেদমূলক নহে; বা ইহা ইংরাজের অত্যাচারে জন্মে নাই। যে অভিনব কর্ম্ম-চেষ্টা আজ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কখনো অত্যাচারপ্রসূত নহে। অত্যাচার যে শক্তি প্রসব করে, তাহা কখনও মহত্তর ব্রতসাধনের উপযোগী নহে। রাজনৈতিক ব্যাভিচার হইতে যদি এই শক্তি উদ্ভূত হইত, তবে এত শীঘ্র তাহা সর্ব্বহৃদয়সঞ্চারিণী হইত না। কত সভা দেখিলাম, কত জনতা দেখিলাম, কই, এমন উন্মাদিনী উত্তেজনা ত দেখি নাই! কংগ্রেসমঞ্চে রাজনৈতিক আলোচনা যাহা পরে নাই, স্বদেশী আন্দোলন বৎসরমধ্যে তাহা সমাধান করিল! রাজনৈতিক আলোচনার মতদ্বৈধ দেখিয়াছি, আত্মবিচ্ছেদ দেখিয়াছি, আর আজ দেখিতেছি, অপূর্ব্ব গঙ্গাসাগরসঙ্গম! যে মুহূর্ত্তে জনসাধারণের প্রাণের তারে ঝঙ্কার পড়িয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে এমনি সুমধুর ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে! নেতৃবর্গ স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া যখন বঙ্গের জনসাধারণকে আহ্বান করিলেন, অমনি অনন্যচিত্ত হইয়া জনসাধারণ তাঁহাদের আদেশপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না যে, স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যভিচারমূলক। এক মহাশুভক্ষণে নেতৃগণ জনসাধারণের মর্ম্মকথা বুঝিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মহামন্ত্রে বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর প্রাণে স্বদেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। স্বদেশসেবার আস্বাদ পাইয়া বাঙালীজাতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছে! যে মহত কর্ম্মচেষ্টা, আজ ভারতবাসী, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা মানবকাননের কুসুমকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া এই মুক্ত বিশ্বে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। শীতাহত পত্রপল্লবশূন্য বিটপিরাজি নববসন্তাগমে যেমন শ্যামনবীনপত্রবল্লরীযুক্ত হইয়া যৌবনতেজসম্পন্ন হয়, ভারতের মৃতপ্রায় জাতীয়-জীবন আজি তেমন প্রাণসম্পন্ন দেখিতেছি।

তাই আশা হয় যে, ঘনান্ধকারময়ী নিশার অবসানে নবারুণ কিরীটিনী উষার রক্তিম রেখাপাত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান আপনার অতীত মহত্ত্বগৌরব ভুলিতে বসিয়াছিল। পাশ্চাত্যজাতির সংশ্রবে আসিয়া আজ তাহাদের গৌরবাধিষ্ঠিত যুগের কথা মনে পড়িয়াছে। অতীতের সেই স্বপ্নযুগের দেবত্ব আজ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহারা আবার বিশ্ববাসীর সমক্ষে সগৌরবে দাঁড়াইতে বাসনা করিয়াছে! ইহা তাহাদের ন্যায্য দাবী। এই দাবী, এই উদ্যোগপ্রচেষ্টার ফলই স্বদেশী আন্দোলন! বঙ্গবিভাগমূলক রাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা শাসনব্যভিচার ইহার গৌণকারণমাত্র। আমরা যদি আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার-প্রয়াসী হই, আমরা যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম করি, তবে আমাদের কার্য্যে কোনও জাতির বাধা দিবার বিন্দুমাত্রও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না। তবে আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সহিত যাহাদের স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাহাদের সহিত ঘাত প্রতিঘাতজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্বদেশব্রত-সাধনের পথ কুসুমাবৃত নহে। বাধা-বিঘ্ন স্কন্ধে লইয়াই আমাদিগকে গন্তব্যমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয়স্বার্থের দ্বারে বলি দিতে হইবে! অন্তঃসারশূন্য প্রলোভন দেখিয়া ভুলিলে মাতৃসেবার ত্রুটি হইবে। ইংরাজানুশাসনে,

তোমরা যাহা পাইবে তাহার মূল্য নাই—তাহা ছায়াবাজী! আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হও, তবে ত প্রতিষ্ঠা মিলিবে! আত্মবলিদান দেও, তবে ত মহাশক্তি উদ্বোধিত হইবেন!

সাধক যখন শবসাধন করেন, তখন শব দন্ত কড়মড় করিয়া মুখব্যাদান করিয়া থাকে। সাধক স্বীয় কার্য্যনাশ-আশঙ্কায় সংগৃহীত মাংসখণ্ড শবের ব্যাক্কিতমুখে প্রদান করিলে, সে তাহা চর্ব্বণ করিতে থাকে; এবং সেই অবকাশে সাধক স্বীয় কার্য্য সমাধান করেন! হে ভারতবাসী! তোমরা শব, ইংরাজ সাধক! ইংরাজশাসনে তোমার সময়ে সময়ে লাভ, মাংসখণ্ডমাত্র! এতদিন এমনি ইন্দ্রজালে ভুলিয়াছি! কিন্তু সাধকের মাংসখণ্ডে ভুলিলে আমাদের জাতীয়-জীবন-স্থাপনের আশা কোথায়! তুমি ত মরীচিকায় সন্তুষ্ট হইবে না, তোমার চাহি অক্ষুণ্ণপ্রতিষ্ঠা! "কায়েন মনসা বাচা" মাতৃসেবায় রত হইলে মায়ের শক্তি আমাদের কায়মনঃসঞ্চারিণী হইবে! তখন কেহই সে শক্তির গতিরোধ করিতে পারিবে না। তোমারই হৃদয় দিয়া এই বিশ্বে মায়ের শক্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। আজিও আমরা বিদেশী বস্তু একেবারে বর্জ্জন করিতে পারিব না—সে সাধ্য আমাদের নাই। গাভী দোহন করিতে না পারিলে দুগ্ধ মিলিবে কি প্রকারে? সুবর্ণপ্রসবিনী ভারতজননী আমাদিগকে সকলি প্রদান করিতে পারেন। মাকে মা না বলিলে, মা অভিমান করিবেন না কেন? আজকাল স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু এদেশের শিল্পোন্নতি বিদেশীয় শিক্ষাসাপেক্ষ। সুতরাং বিদেশীকে চটাইয়া লাভ নাই। বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া কর্কশবাক্যে বিদেশী রাজা এবং বণিকদিগকে বিদ্ধ করিলে মনে একপ্রকার আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে। এমন আত্মপ্রসাদে মনে ভক্তি-সান্ত্বনা আনয়ন করে, বস্তুতঃ আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না।

যদি প্রতীচ্যের শিক্ষা আনিয়া, প্রাচ্যের সহিত সংমিলন করিয়া ভারতীয় সনাতনশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিতে হইবে, অপমানের তীব্রজ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। বিলাতে আন্দোলন করিয়া ইংরাজানুশাসনে রাজনৈতিক অধিকার-আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া, যে শক্তিবলে ইংরাজ, দেশবিদেশে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সেই মহাশক্তি আহরণ করিয়া যাহাতে ভারতীয় জাতীয়-জীবনে সঞ্চার করিতে পারি, আমাদিগকে সেই শ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। যখন এদেশে কংগ্রেস স্থাপিত হয়, ইহা দুই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রথম, জাতীয়-জীবন-গঠন; দ্বিতীয়ত, বৃটিশ্ অধীনে রাজনৈতিক-প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়টির মূল শিথিল, তাই তাহা আমরা পাইতেছি না; প্রথমটি স্বভাবানুগত, ন্যায় এবং ধর্ম্মানুগত উদ্দেশ্য; তাই তাহা আমাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছে। মহাশক্তি কমলকরে দূর্ব্বাক্ষত লইয়া আমাদিগকে মহাব্রতে ব্রতী করিতে আহ্বান করিতেছেন! আইস, মায়ের চরণে প্রণত হইয়া মহাযাত্রার আয়োজন করি! বল "বন্দে মাতরম্।"

(ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৩)

"বন্দে মাতরম্"

শ্রীশচন্দ্র ধর

নদী সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে কোন এক অজানিত পর্ব্বত-গহ্বরে চারিদিক হইতে বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত হইতে থাকে। বহুকাল জলসঞ্চয়ের পর যখন সেই গহ্বরটী পরিপূর্ণ হইয়া যায়,তখন সেই জল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া, কখন এদিক, কখন ওদিক, নানা ছুতা ধরিয়া নির্গত হইতে চেষ্টা করে। তারপর যখন সেই ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণে অলক্ষিতে আরও জল সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার নির্গমন-শক্তিও বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে আর ভিতরে লুক্কায়িত থাকিতে না পারিয়া সেই কঠিন প্রস্তরস্তর ভেদ করিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীরূপে নির্গত হয়, এবং কত দেশ জনপদ অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। সামান্য জনকণা হইতে এরূপ মহানদীর সৃষ্টি হইয়া কত অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া দেশকে "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" করে। প্রায় বিশবৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু "আনন্দমঠে" প্রথম "বন্দে মাতরম্" -মন্ত্র প্রকাশ করেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবিস্থিত ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণের ন্যায় ইহাও এতদিন দেশের লোকের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। শেষে আর লোক-হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া, জাতীয়মহামন্ত্রস্বরূপ সমগ্র ভারত-ময় ব্যাপ্ত হইয়া ভারতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন ও জাতীয়-জীবন গঠন করিয়া ভারত ও সিমাত্রকেই অন্তিম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতেছে। গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালীর "রাখি-বন্ধন ও অরন্ধনের" দিন আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত বাঙ্গালী, বোম্বে, মাদ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের যে কোন প্রদেশেই থাকুক না কেন, স্নানান্তে পুতহৃদয়ে "বন্দে-মাতরম্" মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরের হাতে রাখি বন্ধন করিয়াছে। সেদিন তাহারা বলিয়াছে, "ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" সেদিন তাহারা ব্যক্তিগত, জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া দেশের মঙ্গলার্থে পরস্পরের সখ্য স্থাপন করিয়াছে। ঈশ্বরকে এবং জননীস্বরূপা জন্মভূমিকে সাক্ষী করিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দেশকে দুভাগ করিলেও এক মায়ের সন্তান তাহারা কখনও পৃথক হইবে না। তারপর গত বরিশাল-প্রাদেশিক-সমিতিতে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতজন পুলিশের হস্তে নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন এক মত্তহস্তী গঙ্গার গতিরোধ করিতে যাইয়া যেরূপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেরূপ এই মহা মন্ত্র রোধ করিতে যাইয়া বঙ্গের দ্বিতীয় সায়েস্তা খানও বিতাড়িত হইয়াছেন। সম্বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধনের এই পবিত্র মহামন্ত্র এতদূর সফলকাম হইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতবাসী এখন ইহাকে মূলমন্ত্ররূপে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। যাহা কিছু ভাল এবং আদরের জিনিস্ তাহারই নাম "বন্দে মাতরম্" রাখা হইতেছে। যেমন "বন্দে মাতর্ম গানের বহি, ইহা শতাধিক জাতীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ; "বন্দে মাতরম্ সাবান," "বন্দে মাতরম্ হল"। মোট কথা "বন্দে মাতরম্ বলিতেই আমাদের মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে এবং আমরা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠি। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা হইতে—"Babu Bipin Chandra Pal–Editor in chief" নাম দিয়া "বন্দে মাতরম্" নামে একটী ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইয়া এই পবিত্র নামকে কলুষিত করিয়াছে। ঐক্যবন্ধনের মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" বিরোধের মহামন্ত্র হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ যে কুফল ফলাইতে পারে নাই, ইহা তাহাই প্রসব করিতেছে। "ওল্ড পার্টি" এবং "নিউ পার্টি" দুই বিরোধী দল সৃষ্টি করিয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে দলাদলি উপস্থিত করিয়াছে। স্বীকার করি, ইংলণ্ডেও পরস্পর-মত-বিরোধী উদারনৈতিক ও রক্ষণীল—দুই দল আছে। তাহারা একদল অন্যদলের কার্য্যকলাপের দোষগুণ বিচার করে। কিন্তু যখনই সমগ্র ইংরেজসমাজের স্বার্থসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তখন তাহারা

সকলেই একমত। যখন পকেটে হাত পড়ে, তখন উদারনৈতিকে ও রক্ষণশীলে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। ইংলন্ডের ভারতসচিব ও কোম্পানী আমলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উভয়ের মধ্যে একবার এরূপ আলাপ চলিয়াছিল—"এ কথা মনে রাখিও, উদারনৈতিক মত রপ্তানী জিনিস্ নহে, উহা শুধু ঘরের ব্যবহারের জন্য ("home consumption")।"

এখানে আমরা বিপিনবাবুকে কিছু বলিতে চাহি না। তাঁহাকে আমরা ভাল লোক বলিয়াই জানি। বৃক্ষ যেমন প্রথম প্রথম ভূমি হইতে রস, সূর্য ইতে আলো এবং বায়ু হইতে carbon dioxide ইত্যাদি সব সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং শেষে পরিপুষ্ট হইয়া ফল, ফুল, সুগন্ধ, ছায়া এবং শোভা বিতরণ করিয়া লোককে আনন্দিত করে, সেরূপ বিপিনবাবুও প্রথমতঃ ইঁহার নিকট হইতে একটু, উঁহার নিকট হইতে একটু, এরূপে যাঁহার যাহা কিছু শিক্ষণীয় গুণ দেখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া দেশের অন্যতম নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ এবং পলিসি অতি উচ্চ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও মহৎ। তাঁহার সম্পাদিত "নিউ ইণ্ডিয়া"ই তাহার পরিচায়ক। ভারতবর্ষে তাঁহার মতাবলম্বী লোকের সংখ্যাও কম নহে। এই লেখকও সেই দলেরই একজন। কিন্তু বিপিনবাবু প্রায়ই মফস্বলে থাকেন। অনেক সময় এরূপ হয়, কর্ত্তার অনুপস্থিতিতে তাঁহার নামের দোহাই দিয়া কর্ম্মচারীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। এখানেও তাহাই হইতেছে। বিপিনবাবুর নাম দিয়া হয়ত কোন অপরিণামদর্শী লোক এরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন। একদেশদর্শী লোকের ন্যায় দোষগুণ বিচার না করিয়া এবং পরিণামে কি হইবে না ভাবিয়াই যাকে তাকে আক্রমণ করিতেছে। এ কথা ঠিক যে, তোষামোদকারী বন্ধু এবং অন্ধ ভক্ত অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী শত্রু ভাল। ইহাতে এই লাভ হয় যে, যাঁর যেখানে ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতা আছে, সেটা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তিনি সেটুকু সংশোধন করিবার অবসর পান। কিন্তু দোষগুণ বিচার করিবারও একটা নিয়ম আছে। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ইহাতে বিপিনবাবুর বড় দুর্নাম হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তের দলের ভক্তি কিছু কমিয়া যাইবে। সকলে ত আর ভিতরের খবর রাখে না। বিপিনবাবুর নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ, তিনি কি ইহার কিছু প্রতিকার করিবেন না?

এইত সুরেন্দ্রবাবুর "শান্তি-সেচন" লইয়াই কতদুর বাড়াবাড়ি চলিতেছে। স্থানীয় কাগজ উৎসবের সব সঠিক সংবাদ জানা সত্ত্বেও ভাই হইয়া ভাইয়ের বিরুদ্ধে লেখালেখি? ইহাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছাড়া আর কি বলিব? "বন্দে মাতরম্" নামের কি এই সার্থকতা? কয়েকজন পণ্ডিত মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর স্বদেশ সেবার দরুণ তাঁহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া এবং তাঁহার কল্যাণার্থে হোম করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও ত আমাদের আর কয়েকজন দেশবন্ধুকে "রাজা," "মহারাজা" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। সে বিষয়ে ত কেহ কোন করে নাই। তবে কি সুরেন্দ্রবাবু দেশের সেবায় এতই পশ্চাৎপদ যে, তাঁহার বেলায় এরূপ সোরগোল.? এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্র সুবিজ্ঞ ষ্টেট্স্ম্যান সব বুঝিতে পারিয়া কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। আর ভিন্ন প্রদেশের কাগজেরাও—বম্বের "মারহাট্টা" এবং পঞ্জাবের "ট্রিবিউন," "নাইট" প্রভৃতি—বেঙ্গলির রিপোর্টারের কাঁচা লেখার দোষ বলিয়া সরিয়া নিলেন। কিন্তু আমাদের সার্থক-নামা "বন্দে মাতরম্" ইংলিসম্যানের সুরে সুর মিলাইয়া "সুরেন্দ্রবাবু রাজা হইয়াছেন" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের চীৎকার রয়টারের সঙ্গে সঙ্গে সাতসমুদ্র-তেরনদী পার হইয়া বিলাতে পৌঁছিল। একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ। বিলাতের লোকে বুঝিল ভারতসাম্রাজ্য বুঝি তাহাদের লাভ হইতে যায় যায়। সেখানকার সংবাদপত্র সকল দ্বিতীয় সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া "সাজ সাজ" রব উঠাইলেন। Pall Mall Gazette লিখিলেন—" * * * They know that the Sahibs hold India upon precisely the same tenure as they themselves have held their respective possessions in the past–by the sword. If, then, they hear sedition openly preached and permitted, if they see British goods boycotted and British men and women insulted, if above all they see an absurd Babu not only strong enough to obtain the dismissal of a great British official, but offering, with impunity, a grotesque insult to the sovereignty of the Emperor of India

and his representative the Viceroy, what will they think of all this? Surely they will conclude that the Sahibs cannot or will not, depend their orn dominion. When we hear the absurd Banerjee reviving the old Hindu and Moslem prejudices with regard to the use of animal matter in the preparation of British goods, we cannot forget the alleged bonedust in the flour, and the greased cartridge, which played so sinister a part in the production of the Indian Mutiny. The time, then has come for Lord Minto and Mr. Morley to stiffen their backs to pay no attention to the Cottons,. the Wedderburns, the Keir Hardies and the Byleses, and all the mischievous brood which flourishes under the projection of the present Government, and to let it be known and felt in India that the law must be kept, that sedition will be punished, and that the mighty hand of the British Raj is not withered nor the stretched out arm withdrawn. In short, there must be no more temporising with Babu disloyalty, let a worse thing come unto India and ourselves. India may be ruled by King Edward or King Banerjee; but it connot be ruled by both."

The Daily Telegraph লিখিলেন — "It will be exceedingly interesting to see what course of action is adopted by the Indian Government and by Mr. Morley, as the Secretary for India, in the matter of the Bengali agitator, Surendra Nath Banerjee. He has just surpassed himself by being crowned and anointed king_whether of India or of Bengal only is not stated–and this mock Coronation ceremony is understoold to have taken place in Calcutta. In the old days the shrift of such an imposter would have been short. The Government would either have clapped him under restraint as a dangerous lunatic or ended his days in summary fashion. But now, in the British Empire at any rate, treason is apt ot be regarded as a curious eccentricity than as a crime and Banerjee's neck is, no doubt, quite safe. * * *". " The Daily Mail," "The Evening Standard," 'The Saturday Review" প্রভৃতি সকলেই এরূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সার হেনরী কটন, রয়টারের তারের সংবাদ যে মিথ্যা এবং এই "শান্তিসেচন"-উৎসব যে একটা সাধারণ ঘটনা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে "বন্দে মাতরম্" লিখিয়াছেন — " * * * But the halting and disingenuous defence that Babu Surendra Nath's *foolish friends* have been publishing, has, it seems to us, clearly but a serious if not, sinister aspect to the whole thing which did not originally belong to it. * * *. কিন্তু ইহার মূলে কে, কে তিলকে তাল করিয়াছে, "Bande Mataram" নন কি? এরূপে কি ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরী বসায়।

তার পর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের বিষয় ধরুন। সুরেন্দ্রবাবুর দল যাহাতে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয় তাহার জন্য আবার ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে চান। তাই তাহাদের পলিসিকে ঠাট্টা করিয়া "বন্দে মাতরম্" এক স্থলে লিখিয়াছেন — "Regeneration by agitation is a delightfully novel idea and the *Indian Mirror* deserves well of the country for having discovered it. 'Shake the patient well twice a day and await results; if no result, shake again' repeat the process until something happens. These we believe are the directions. The treatment should be varied by occasional applications of petition plaster' moderation pills should be administered once a day to quiet the system; and the patient should be advised to sit on his hind legs in a respectful attitude. This posture is believed to be very salutary and effective." পরিহাসই সব স্থলে তর্কের জবাব নহে। বঙ্গবিভাগ বঙ্গের পক্ষে অনিষ্টকর এ কথা যখন আমরা মানিয়া লইয়াছি এবং তাহারই জন্য যখন এত বড় ব্যাপার, তখন এবার দরখাস্ত

করিলেই যদি বঙ্গবিভাগ রহিত হয়, তবে দরখাস্ত করিতে আপত্তি কি? আমাদের যে অবস্থা তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমাদের ন্যায্য দাবীগুলি দরখাস্ত দ্বারাই আদায় করিতে হইবে। গায়ের জোরে আদার করিবার ত আর ক্ষমতা নাই। তবে যেগুলি আমরা নিজে করিতে পারি তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্যক নাই। নব্যদল এই দরখাস্তের বিরোধী এবং তাঁহারা মহামতি তিলককে সভাপতি করিতে চান। সেজন্য বিপিনবাবু মফঃস্বলে নানা স্থানে ঘুরিয়া সভাসমিতি আহ্বান করিয়া তিলককে সভাপতি করার চেষ্টা করেন। ওদিকে সুরেন্দ্রবাবু নাকি অভ্যর্থনা-কমিটির মতামত না লইয়াই নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন যে, এবার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ দাদাভাই নৌরজীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকার করি সুরেন্দ্রবাবুরও দোষ থাকিতে পারে। চন্দ্রেরও ত কলঙ্ক আছে। তাই বলিয়া কি লোকে তাহাকে অনাদর করে? একা সুরেন্দ্রবাবুর কিম্বা বিপিনবাবুর কাহারও সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা নাই। অভ্যর্থনা-কমিটি নৌরজী কিম্বা তিলক যাহাকেই নির্ব্বাচিত করেন তিনিই হইবেন। এই বিষয় লইয়াই বিবাদ বিসম্বাদে কাজ কি? ঘরোয়া বিবাদই ভারতের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। তাহা জানিয়াও কি আমাদের নেতারা এরূপ ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিবেন, না, সকলে একমত হইয়া আপোসে দেশের যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করিবেন? যিনিই সভাপতি হউন না কেন, বিপিনবাবুর দল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যাঁহারা কংগ্রেসে কন্‌ষ্টিটিউশন চান, তাঁহাদের দাবীটা এবার কংগ্রেসে যাহাতে যথারীতি আলোচিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। আমাদের অন্তিম লক্ষ্য আমরা হিমালয়ে চড়িব। কয়েক জনের কাছে কোন্ পথে যাইব জিজ্ঞাসা করাতে কেহ বলিলেন, "দার্জ্জিলিং দিয়া যাও," কেহ বলিলেন "সিমলা হয়ে যাও" অন্য একজন বলিলেন "নাইনিতাল হয়ে যাও" অপর কেহ বা বলিলেন "ওসব পথ ভাল নয়, আমার কথা শুন, ডেলহৌসি হয়ে যাও," ইত্যাদি। এখন আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব, তাহা ঠিক না করিয়া কি লাঠি নিয়া ঝগড়া করিতে যাইব যে, কোন্ পথ দিয়া যাওয়া উচিত? অন্তিম লক্ষ্য যখন হিমালয়ে পৌঁছান, তখন যে দিক্ দিয়াই যাই না কেন, সেখানে পৌঁছিতে পারিব। তবে যে পথটা সোজা এবং যাহাতে বাধাবিঘ্ন কম, সে পথে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

গত ৪ঠা আগস্ট শ্রীযুক্ত গোখলে "লণ্ডন ডেলিনিউসের" প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "গত কয়মাসে পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, ভারতে বৃটিশ রাজত্বকালে এরূপ আর দেখা যায় না।" ইহা নিয়া আমাদের সুযোগ্য "বন্দে মাতরম্" তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া লিখিয়াছেন—"It is a matter of painful surprise to us that one who was for some years Professor of History in an Indian College should have the audacity to declare in England that outrages similar to those committed in Eastern Bengal under Sir Bamfylde Fuller have been happily unknown in the annals of British rule in India." তারপর Clive এবং Warren Hastings-এর সময়ের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আবার লিখিয়াছেন— "These instances of Britis" oppression in India to quote only a few, will convince all fair minded people that Mr. Gokhale's statement is utterly untrue." শেষকালে বিপিনবাবু "নিউইণ্ডিয়া"তে একবার যে বিষয়টার সামান্য একটু উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন– "But this must not be raked up. Such things are better to be forgotten." সেইটাই আবার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছেন। ইহা হইতেই কি বুঝা যায় না যে, বিপিনবাবুর নাম অন্য কোন লোকে কাজ করিতেছে? আরও লিখিয়াছেন — "Mr. Gokhale's statement to the representative of the "Daily News" afford one more illustration of the relation between mendacity and fear and of the truth of the remark made by Livingstone who while speaking of the falsehood of the East Africans says : "One can scarcely induce a slave to translate anything truly; he is so intent on thinking of what will please." To turn ot the pages and prophets of the East we wish Mr. Gokhale would be guided in his political utterances by the teachings of Manu and Mohammed with reference to truth. While the Indian

lawgiver lays down that "one should not speak agreeable falsehood." The prophet enjoins :"Say what is true, although it may be bitter and displeasing to people." আচ্ছা, স্বীকার করিলাম শ্রীযুক্ত গোখলে নয় একটা কথা ভুলই বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা লইয়া এত সোরগোল বাধাইবার কি দরকার? আর কেহ ত এরূপ ইতিহাসের বিদ্যা জাহির করিতে আসেন নাই। হইতে পারে "বন্দে মাতরম্" এর উদ্দেশ্য খুব মহৎ। তাঁহারা হয়ত দেখাইতে চান্ যে, বিজাতীয় বৃটিশ-শাসন আগাগোড়া সবই অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দেখাইবারও ত অনেক রকম রীতি আছে। পদে পদে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করা কি ভদ্রোচিত? এখনও দেখিতেছি, প্রতিদিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গোখলের নামে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। তাঁর নামে অমূলক-সমূলক-নির্ব্বিচারে দোষারোপ হইতেছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এত জাতক্রোধ কেন? ইহাই কি নব্যদলের দেশহিতৈষণার লক্ষণ? আমরা বিপিন বাবুকে আবার অনুরোধ করি, হয় তিনি কাগজ হইতে তাঁহার নাম উঠাইয়া লউন, নয় ত ভবিষ্যতে যাহাতে ভালমতে চলিয়া "বন্দে মাতরম্" নাম সার্থক করিতে পারে তার উপায় করুন।

আর এক কথা, আমরা সুযোগ্য সম্পাদকমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, পবিত্র "বন্দে মাতরম্" কি হেলাফেলায় ব্যবহার করার জিনিস্? কোন এংগ্লোইণ্ডিয়ান একজন দেশীয়কে তাচ্ছিল্য করিয়া Mr. Bande Matarm বলিতে পারে। তাই বলিয়া কি আমরা বাঙ্গালীরা কোন সম্পাদকে Mr. Bande Matarm বলিয়া সম্বোধন করিব? যে শব্দ গায়ত্রীমন্ত্রের ন্যায় শুদ্ধ ও পূত, তাহার এরূপ ম্লেচ্ছজনোচিত ব্যবহার করিব? "Bande Mataram" পত্রিকার পরিচালকগণের আচারব্যবহারে ইঁহাদের মধ্যে বিলাতফেরতের ট্যাঁস গন্ধ পাইতেছি। তোমরা নিজেরা নয় লোক-দেখাবার জন্য বিলাতী খোলোসটা ছাড়িয়া দিয়াছ, সৌখীন ধুতি-চাদর পরিয়াছ ও পবিত্র "বন্দে মাতরম্"এর টীকা মাথায় ধারণ করিয়াছ—কিন্তু পদে পদে তার অপমান করিতেছ এবং তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিলাতী অনাচারের দুর্গন্ধ নিঃসরণ হইতেছে। তোমাদের মুখে আবার ভূপেন্ বোসের সোশ্যাল রিফরমের এত ঠাট্টা কেন?

শ্রী শ্রীশচন্দ্র ধর।
ময়মনসিংহ সুহৃদ্-সমিতির জনৈক সভ্য।
(ভারতী, কার্তিক ১৩১৩)

সোনার বাঙ্গালা জাগিবে কি?

নিখিলনাথ রায়

চিতাভস্মপরিপূর্ণ শ্মশানতুল্য হইয়া সোনার বাঙ্গলা এক্ষণে বিরাজ করিতেছে। ইহার চারিদিকে ভস্ম—চারিদিকে দগ্ধ অঙ্গার—ইহাকে ভস্ম করিবার জন্য যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, আজিও তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইংরেজ বণিকের সেই বিশ্বগ্রাসিনী লালসার অগ্নি আজিও ইহার পরতে পরতে জ্বলিতেছে। যতদিন সোনার বাঙ্গলার অস্তিত্ব থাকিবে, বোধ হয়, রাবণের চিতার ন্যায় সে অগ্নি চিরদিনই জ্বলিবে। ইংরেজবণিক আগুন জ্বালাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে আগুন জ্বালিতে দিল কাহারা? আমরা কি সে আগুন জ্বালিতে দেই নাই? আমরাই ত সে আগুন জ্বালাইবার সহায়তা করিয়াছি, তাই নিজেরাই এক্ষণে বেড়া আগুন পুড়িয়া মরিতেছি। ইংরেজবণিককে বাঙ্গলায় আনিল কে? আমরা কি আনি নাই? তাহাদের অনুচর হইয়া শিল্পিগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল কাহারা? আমরা কি করি নাই? আবার ইংরেজবণিকের কুহকে পড়িয়া পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছে কাহারা? আমরা কি নই? তাই বলিতেছি, ইংরেজবণিক সোনার বাঙ্গলায় আগুন জ্বালাইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরাই তাহার সহায়তা করিয়াছি। আমরা তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, আমরা সেই আগুনকে রক্ষা করিয়াছি এবং এখনও তাহাকে বাতাস দিয়া ধীরে ধীরে জ্বলিতে দিতেছি। সুতরাং সোনার বাঙ্গলা যে আমাদের পাপে দগ্ধ হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এই পাপের জন্য—মহাপাপের জন্য আজ আমাদের এত দুর্দ্দশা! আজ তাই সোনার বাঙ্গলা শ্মশানভূমি! তাহার চারিদিকে অন্নবস্ত্রের হাহাকার, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, মহামারীর প্রবল হুঙ্কার! আজ তাই সোনার বাঙ্গলার ক্রোড় হইতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণি লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে! শিল্পিকুল নির্বংশ হইতেছে! সুতরাং বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? বাঙ্গলার পল্লীগ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল। জলাশয় সমস্ত শুষ্ক ও পঙ্কিল। ভগ্নগৃহ ও পতিত ভিটায় শৃগাল পেচক ক্রীড়া করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় স্ফীতোদর দুই চারি জন লোক বাঙ্গালী জাতির শেষ অস্তিত্বটুকু মাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। প্রতিগৃহে বিধবা রমণীর সংখ্যা বাড়িতেছে। সোনার বাঙ্গলা শ্রীহীন, শক্তিহীন, স্বাস্থ্যহীন। যেন ভগবানের কি এক প্রবল অভিশাপ ইহার মস্তকে পতিত হইয়াছে। মা আমাদের অন্নপূর্ণা, তিনি স্বর্ণপ্রসবিনী, তবে তাঁহার প্রতি এ অভিশাপ কেন? এ অভিশাপের কারণ যে আমরা, তাহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে। আমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নষ্ট করিয়াছি, আমরাই ইংরেজ বণিকের কুহকে পড়িয়া, বিলাসিতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমাদের এ দুর্দ্দশা হইবে না কেন? আমাদের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল! তাই চারিদিকে বেড়া আগুন জ্বলিতেছে।

এক্ষণে উপায় কি? সত্য সত্যই কি আমরা বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিব? ইহার কি কোনই উপায় হইবে না? সত্য সত্যই কি সোনার বাঙ্গলা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে? সত্য সত্যই কি বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে? হইবে বৈ কি? যে ধ্বংস-স্রোত সোনার বাঙ্গলায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতিকে টানিয়া লইয়া বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে ডুবাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। ভগবানের অভিশাপ যাহাদের মস্তকে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করা এমন সাধ্য করে? মহাপাপে যাহারা জন্মভূমি—মাতৃভূমিকে ডুবাইয়াছে তাহাদের রক্ষা করিবে কে? এখনও পর্য্যন্ত যাহাদের চৈতন্যের উদয় হয় নাই,—এখনও পর্য্যন্ত যাহারা আলস্যের

স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া সময় কাটাইতেছে,—এখনও যাহাদের সরলতা, দৃঢ়তা ও কার্য্যকরী শক্তির উন্মেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না, তাহাদের অস্তিত্ব কতদিন এই বসুন্ধরার পৃষ্ঠে থাকিতে পারে?

বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস যে অনিবার্য্য, সে বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কারণ, এরূপ অকর্ম্মণ্য জাতি এই জীবন-সংগ্রাম কালে কদাচ আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমে যে বাঙ্গালী আপনার অস্তিত্ব হারাইবে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই বলা যাইতে পারে। তথাপি আশার মোহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না, আশাই আমাদিগকে উত্থানার্থ বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। আশা আমাদের মনোমন্দিরে ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে উদিত হইয়া সোনার বাঙ্গলার সোনার চিত্র আজিও দেখাইতে বিরত হইতেছে না। এই যে চারিদিক হইতে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি উঠিয়া কোটি কণ্ঠে সোনার বাঙ্গলাকে বন্দনা করিতেছে, আশা আমাদিগকে সেই দিকে কর্ণপাত করিবার জন্য বারংবার উত্তেজিত করিতেছে; যদিও আমরা জানি যে তাহাতে এই শ্মশান-বাঙ্গলার ধূমাচ্ছন্ন বায়ুস্তরে সামান্য কম্পন মাত্রও হইবে না, তথাপি আশার কুহকে আমরা একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক এই ভারতব্যাপী বিরাট্ স্বদেশী আন্দোলন আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে, তাই আমরা সুপ্তোত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি?"

সত্য সত্যই আশার আলোকে উৎফুল্ল হইয়া আমরা সোনার বাঙ্গলার উজ্জ্বল চিত্রই দেখিতে পাইতেছি। তাহার শ্মশানচিত্র অপসারিত হইয়া জীবন্ত চিত্রই আমাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। আমরা তাহার সেই "সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা" মূর্ত্তিই দেখিতে পাইতেছি। আমাদের মনে সেই সোনার বাঙ্গলারই চিত্র উদিত হইতেছে,—

"যেখানে রাখাল ছেলে, সহোদর মোর,
দিনান্তে শ্রমের শেষে লভে মাতৃ-ক্রোড়,
সুমধুর স্নেহ স্বর্গে সেই ধূলাঢাকা
ছায়ামাখা একপদী পূর্ণিমার রাকা
কৌমুদী বিলায় যেথা কুটীরের চালে,
কলকণ্ঠ মধুধারা শাখার আড়ালে,
মন কেড়ে লয় দিক্-বধূর গুণ্ঠন—
মুকুলে আকুলি' ওঠে রসাল কানন—
মেলে যেথা ছেলে মেয়ে পল্লীর খেলায়
বকুলবিছান পথে গোধুলি বেলায়।
যেখানে সুখের পৌষে ভরিয়া উঠান
দশ দিক আলো করে সোনা-ঢালা ধান
সোনালি ধানের শিষ বাঁধিয়া মুঠায়
ভাই বোন মিলে যথা ছুটিয়া বেড়ায়।"

ভগবান করুন, সোনার বাঙ্গলার এই চিত্র যেন চিরস্থায়ী হয়।

আশায় উৎফুল্ল হইতেছি সত্য, সোনার বাঙ্গলার সোনার চিত্র মানসচক্ষে দেখিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাকে পুনর্ব্বার জীবন্ত করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আবার যে আমরা আমাদের স্বভাববশে ঘুমাইয়া পড়িতেছি! এই যে আমাদের দেশের যুবকগণ—ছাত্রগণ প্রহরীর ন্যায় সর্ব্বদাই "বন্দে মাতরং" ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে সজাগ করিয়া দিতেছে, কিন্তু আমরা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি? মাতৃপূজা—মাতৃসেবা দূরে থাকুক, আজিও ত আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। আমরা এই একবার জাগিতেছি আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছি। যত দিন যাইতেছে, ঘুম ততই পাকিয়া আসিতেছে। কাজেই আমাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, —

'সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি?' এখনও পর্য্যন্ত জাগরণের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যাহা হইয়াছে তাহাকে সামান্যরূপ চক্ষুরুন্মীলন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। প্রকৃত জাগরণ এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশী আন্দোলনের এই মহাসুযোগ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর কোন কালে আমাদের এ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। এই নিদ্রাই শেষে আমাদের মহানিদ্রায় পরিণত হইবে। অভিশাপগ্রস্ত আমাদিগের নিকট এই স্বদেশী আন্দোলন বরস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" কিন্তু বাস্তবিকই তোমরা উঠিতে পারিবে কি?বাস্তবিকই তোমরা জাগিতে পারিবে কি? সত্য সত্যই সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি?

আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। এই বরলাভ করিয়া আমাদিগকে উঠিতে ও জাগিতে হইবেই। তাই সকলকে অনুরোধ করিতেছি, একবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াও দেখি, একবার সকলে জাগ দেখি, দেখি মা আমাদের জাগেন কি না! মা আমাদের গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন সত্য, এ সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে কিনা জানি না, না ভাঙ্গিলেও তাঁহার অকাল বোধন করিতে হইবে। রাক্ষসের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই মাকে না জাগাইলে—তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ না করিলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আশা নাই। আমাকে জাগাইবার জন্য যোড়শোপচারের আয়োজন করিতে হইবে, নতুবা তিনি জাগিবেন না। গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, নৈবেদ্য সমস্তেরই আয়োজন করিতে হইবে, নতুবা মা জাগিবেন কেন? এ সমস্ত উপচার, ভাই, কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? রাক্ষসের নিকট হইতে কি আনিতে হইবে? তাহা হইলে ত রাক্ষসেরই জয় হইবে! মা জাগিয়া রাক্ষসকেই ত বর দিবেন এবং রাক্ষস ত তাঁহার সমস্ত আশীর্ব্বাদ লুটিয়া লইবে। সুতরাং আমাদিগকেই এই সমস্ত উপচার প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা প্রকৃত আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিব এবং তখন মায়ের পূজার প্রকৃত অধিকারী হইব। যাহা দিয়া মায়ের পূজা করিব, তাহা রাক্ষসের নিকট হইতে লইলে চলিবে না। শুনিয়াছি, মা চিনির নৈবেদ্যে বড়ই তুষ্ট হন; যদি তুমি তাঁহার ভক্ত হও, তাহা হইলে নিজে সেই নৈবেদ্য প্রস্তুত কর; কদাচ রাক্ষসের নিকট হাত পাতিও না। মা সাড়ীতে বড় প্রীতিলাভ করেন, সে সাড়ী তুমি নিজে কি করিতে পার না? এক দিন তুমি মাতা বসুন্ধরার সাড়ী যোগাইয়াছিলে; আজ আপনার মাকে দুই একখানি সাড়ী দিতে পারিবে না? যদিও জানি রাক্ষসের নিকট হইতে সাড়ী না আনিলে তোমরা মাকে দিতে পার না—কিন্তু যখন তোমরা মাকে জাগাইতে চাহিতেছ, তখন আপনাদের প্রস্তুত সাড়ী না দিলে, মা রাক্ষসকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন। তাই বলিতেছি, মায়ের অকাল-বোধনের জন্য যোড়শোপচারের আয়োজন কর এবং নিজেরাই সেই নৈবেদ্য ও বস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। যাহার নির্ম্মিত দ্রব্য দিবে, মা তাহাকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন। সেই জন্য কদাচ রাক্ষসের নিকট হাত পাতিও না। আজ তোমরা রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কি বলিয়া আবার তাহার নিকট হাত পাতিবে। যদি একবার স্বদেশী আন্দোলনরূপ বর পাইয়াছ, তবে একবার নিজেরা জাগিয়া মায়ের অকালবোধনের চেষ্টা কর।

বাস্তবিকই আমরা রাক্ষসের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এ রাক্ষস কে? ইংরেজবণিক! ইংরেজবণিকের রাক্ষসী মূর্ত্তির কথা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেমন করিয়া সেই রাক্ষস আমাদের সহিত জীবনসংগ্রাম বাধাইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজ সেই রাক্ষসমূর্ত্তিধারী ইংরেজবণিকের সহিত জীবন-সংগ্রামে—শিল্প-যুদ্ধে আমরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও অপহৃত, কেমন করিয়া আমরা জয়লাভ করিব? জয়লাভ করিতে পারিবই কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে যদি মায়ের অকালবোধন করিতে পারি তাহা হইলে কিছু আশা করা যাইতে পারে। যদি আবার আমরা স্বদেশী উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে জাগাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে। এত দিন আমরা রাক্ষসের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিলাম। কে যেন আমাদের কাণে "বন্দে মাতরং" মন্ত্র দিল, তাই আমরা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া নাগপাশটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে জাগিতে হইবে ও মাকে কি

জাগাইতে হইবে! মা জাগিলে তাঁহার স্নেহস্পর্শে আমাদের ক্ষত চিহ্ন সমস্ত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা সত্য সত্যই কি জাগিতে পারিব ও মাকেও কি জাগাইতে পারিব? বাস্তবিকই সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি?

এ ঘোরতর জীবনসংগ্রামের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে কি? চক্ষের সকলেই ত সমক্ষে অহরহ সেই সংগ্রাম দেখিতেছি; কেবল দেখিতেছি কেন নিজেরাও যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত বিক্ষত হইতেছি। কে না এই সংগ্রামের আঘাত সহ্য করিয়াছে? তবে আর কাহার নিকট ইহার পরিচয় দিব? তথাপি একবার তাহার চিত্র দেখা কি ভাল নয়? কারণ, সেই বিরাট সংগ্রাম সকলে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছে না, অনেকেই তাহা আংশিকরূপে দেখিতে পায়। কাজেই তাহার একটা চিত্র দেখান মন্দ কি? যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা সকল দিকের সংবাদ রাখে না, কিন্তু দূতমুখে সমস্তই জানিতে পারে। সেইরূপ এই সংগ্রামের একটা চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করায় হানি কি? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় গৃহে বসিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্র দেখাইয়াছিলেন। আমরা সকলেই অন্ধ, আবার আমরা সকলেই রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, কিন্তু আমাদের সঞ্জয় কোথায়? সঞ্জয় থাকুক বা নাই থাকুক, ঐ শুন, বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গেল, ইংরেজের ক্ষমতা সোনার বাঙ্গলায় বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন-সংগ্রামেরও আয়োজন হইতে লাগিল। সে কালের চিত্র পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে একবার এ কালের চিত্র দেখান যাউক। মুসলমান নবাব বাদসাহের আমলে উচ্চ রাজপদে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে লোক নিযুক্ত হইত এবং তাহাদের প্রায় সকলেই এদেশবাসী ছিল। রাজকর্ম্মচারী-রূপে রাজকার্য্য করিয়া এ দেশের লোকেরা প্রতিপালিত হইত। রাজস্ব কর্মচারী বল, দেওয়ান বল, মুন্সী বল, এমন কি সেনাপতি পর্য্যন্ত বল, এদেশের লোকেরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরাই নিযুক্ত হইত; নিম্নপদের লোকও এদেশ হইতে নিযুক্ত হইত। আরব, পারস্য বা তাতার হইতে লোক আসিত না। আর এক্ষণে উচ্চপদে সমস্তই ত শ্বেতাঙ্গ। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাহাদের এ দেশে আগমন, ভারত ভাণ্ডারের অর্থগ্রহণ, তাহার পর সেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া আবার তাহাদের স্বদেশে প্রতিগমন। নিম্নপদও ক্রমে তাহারা ও ফিরিঙ্গিরা অধিকার করিতেছে। রাজকার্য্যে শ্বেতাঙ্গদের সহিত জীবন সংগ্রামে দেশীয়েরা পরাজিত ও আহত, প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত।

মুসলমানী আমলে দেশের উৎপন্ন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য দেশের সংকুলান না করিয়া বিদেশে যাইতে পারিত না। আর এক্ষণে? এক্ষণে দলে দলে নানাজাতি শ্বেতকায় বাঙ্গলায় আসিয়া আমাদের পেটের ভাত হইতে অনেক দ্রব্য জাহাজে পুরিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই সমস্ত চাউল গমে কি হয়? না মদ্য প্রস্তুত হয়। সরকারী কাগজে কলমে বেশ পরিষ্কার লেখা থাকে যে, এত টাকার জিনিস রপ্তানী হইয়া এদেশের টাকা হইল। কিন্তু তাহাতে হইল কি? আমাদের পেটের ভাত জুটিল না। অর্থনীতিবিদগণ হয়ত হাস্য করিয়া বলিলেন যে, ওরে মূর্খ! তোমাদের দেশের টাকা হইতেছে, আর তোমরা খাইতে পাইতেছ না বলিয়া চীৎকার করিতেছ! তোমরা অর্থনীতির কিছুই বুঝ না! সে কথা সত্য, আমরা বাস্তবিকই অর্থনীতির কিছুই বুঝি না। কারণ টাকা খাইয়া যে জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা ত জানি না। যদি দেশে জিনিসই নাই থাকিল, তবে টাকা লইয়া করিব কি? এখানেও জীবনসংগ্রামে আমাদের জীবন সংশয়।

তারপর নীলকর, চা-কর ও পাট ব্যবসায়ীদের কথা। নীলকরের অত্যাচার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কৃষকদিগের অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া ছিল। চা-করদিগের সহিত জীবনসংগ্রামে কুলীদের পেটের ভাত জুটিতেছে না। তাহার পর পাট ব্যবসায়ীদের ব্যাপার। এই জীবনসংগ্রামটি বড়ই বিচিত্র! বাহিরে দেখিতে বোধ হয়, এই জীবনসংগ্রামে আমরাই জয়লাভ করিতেছি, আমাদের কৃষকেরা জয়যুক্ত হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কি হইতেছে? ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ এত বাড়িয়াছে যে সাধারণ লোকে প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ অনুভব করিতেছে; আর যাহারা জয়যুক্ত হইতেছে, সেই কৃষকেরাও পরক্ষণেই আবার রসদের জন্য ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতেছে। বাস্তবিক কৃষকগণের সাময়িক কিছু অর্থ লাভ হইতেছে সত্য, কিন্তু ধান্যের চাষের অভাবে সাধারণ লোক এবং কৃষকদেরও অনেকে খাইতে না পাইয়া যে মরিয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর গ্রামের জলাশয়সমূহে

এই সমস্ত পাট পচাইয়া পল্লীর স্বাস্থ্য নষ্ট করা হইতেছে এবং যে কৃষকেরা অর্থলাভ করিতেছে, চিকিৎসার জন্য কুইনাইন প্রভৃতি বিলাতী ঔষধ কিনিতে তাহারা তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেছে। আবার ঐ সমস্ত পাট গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি হইয়া যেমন আসিতেছে, অমনি তাহা কৃষকগণেরই অঙ্গে শোভা পাইতেছে। বল দেখি, এই বিচিত্র সংগ্রামে পরিণামে জয়যুক্ত হইল কাহারা? এই জীবনসংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করি সত্য, কারণ এ অস্ত্র সোনার বাঙ্গলা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু পরিণামে আপনাদিগকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সকলে সামঞ্জস্য ভাবে যদি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তবেই বলিতে পারি সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছি, নতুবা আপাতজয়লাভের কোনই মূল্য নাই।

এতদ্ব্যতীত আর একটি সংগ্রামও আছে। সেটি শ্বেতাঙ্গ জমীদারদিগের সহিত দেশীয় জমীদারদিগের জীবনসংগ্রাম। অনেক কুঠীয়াল সাহেব এক্ষণে জমীদার হইয়া বসিয়াছেন। দেশীয় জমীদারগণের জমীদারী নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাঁহারা ভূস্বামী হইয়াছেন। তাঁহাদের লাঠি ষড়কির নিকট অন্যান্য জমীদারেরা পলাইয়া যান, নিরীহ প্রজাগণের ত কথাই নাই। এখানেও প্রকৃত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন -সংগ্রাম।

তাহার পর শিল্প বাণিজ্যের জীবনসংগ্রাম। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে আমরাই এককালে জগতের অন্নবস্ত্রের সংকুলান করিতাম। এক্ষণে পৃথিবীর চারিদিক্ বিশেষতঃ বিলাত হইতে আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া আসিতেছে। কি প্রকারে আমাদের দেশের শিল্পকুলের ধ্বংস সাধন হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে যাহাও আছে, তাহাদের সহিত কিরূপ প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাই একবার দেখাইতেছি। পূর্ব্বে বাঙ্গলার লবণ, চিনি, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি পৃথিবীর অনেকস্থানে নীত হইত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই বাঙ্গলায় ঐ সমস্ত পদার্থ কি পরিমাণে আসে, তাহাই দেখান যাইতেছে। বাঙ্গলাতে বৎসরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার লবণের আমদানী হইয়া থাকে। ৫০ লক্ষ টাকার কার্পাস সূত্রের আমদানী হয়। ১৫ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র ও ৬৭ লক্ষ টাকার কার্পাস শিল্পের অন্যান্য দ্রব্য আইসে। তদ্ভিন্ন চিনিও বহুল পরিমাণে আমদানী হয়। সুতরাং যে সোনার বাঙ্গলা এককালে জগতের অন্নবস্ত্র যোগাইয়াছিল, আজ তাহাকে স্বদেশীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে। আজ তাহার শিল্পিগণ বৈদেশিকগণের সহিত ঘোরতর জীবনসংগ্রামে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের ধ্বংস সংঘটিত হইবে! যে বাঙ্গলায় কোটি কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে দেশের অধিবাসী জীবনসংগ্রামে কতদিন বাঁচিতে পারে? কাজেই তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজের আগমন হইতে এই জীবনসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে ইংরেজবণিক এই সংগ্রামে জয়লাভের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে সম্যকরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন যে সমস্ত অল্পসংখ্যক শিল্পী আজিও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের অধ্যবসায়কে ধন্য বলিতে হয়। কিন্তু তাহারা আর কতদিন যুদ্ধ করিতে পারিবে? ক্রমেই তাহাদের শক্তির হ্রাস হইতেছে, ওদিকে ইংরেজ বণিক আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে একেবারে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই জীবনসংগ্রামই ভয়াবহ!

সুতরাং যেদিকে দেখ সেই দিকে বৈদেশিক বিশেষতঃ ইংরেজবণিক ও ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। আমাদের রাজা ইংরেজ, তাঁহার সচিবগণও ইংরেজ, প্রতিনিধি রাজপুরুষও ইংরেজ। অবশ্য আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ন্যায় বিচারের আশা করিয়া থাকি এবং তাঁহারা তাহা দান করিতে যে পরাঙ্মুখ, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইংরেজবণিকের এমন কুহক যে, তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। আমাদের রাজরাজেশ্বর নিরপেক্ষ হইলে কি হইবে? তাঁহার প্রতিনিধি কর্ম্মচারিবর্গ যে ইংরেজবণিকের কুহকজাল ভেদ করিতে পারেন না; বরং তাহাতেই অনেকে আপনা হইতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিয়া বণিকসম্প্রদায় ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন আমাদের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতেছে। এই সংগ্রামে কি আমরা জয়াশা করিতে পারি? কিন্তু না করিলেও ত আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

তাই বলিতেছি, আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। যদি এই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা ত বলিতেছি, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। তোমাদের এই অবস্থা দেখিয়াই তাহা বলিতে হইতেছে। যদি তোমরা এই ধ্বংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা কর, যদি বাস্তবিক এই ভয়াবহ রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রাম জয়লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করিও না। আর আলস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। আর বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিও না। প্রকৃত বীরের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াও। যদিও জানি, রাক্ষসে তোমাদের রক্ত শোষণ করিয়াছে, তোমাদের দেহে রক্তবিন্দুর বড়ই অভাব, তথাপি যেটুকু আছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তোমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বীরবেশে রণসাজে এই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ দেখ, ভগবানের বররূপ স্বদেশী আন্দোলন তোমাদিগকে জাগাইতেছে। ঐ শুন, বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই আবার বলিতেছি, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

জীবনসংগ্রামের যে চিত্র দেখাইলাম, তাহাতে যে তোমাদের ধ্বংস ঘনাইয়া আসিতেছে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? দেখ, চারিদিকে তোমাদের সহিত জীবনসংগ্রাম হইতেছে; তোমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণ, বামে সর্ব্বত্রই রাক্ষসের আক্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগণ তোমাদের দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাক্ষসের সোনার পুরী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল জানি, কিন্তু এক্ষণে রাক্ষসেই আমাদের সোনার বাঙ্গলা দগ্ধ করিতেছে। তাই বলিতেছি, আমাদের আর নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। যদি আমরা সুযোগ পাইয়াছি, তবে ছাড়িব কেন? এই মহাসুযোগ যদি আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, আমাদের অস্তিত্ব এ বসুন্ধরা-পৃষ্ঠে আর অধিকদিন থাকিবে না, বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। ইহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, —পিপাসায় ক্ষামকণ্ঠ হইয়া—রক্তমোক্ষণে কঙ্কালসার হইয়া—শ্মশানের চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া—যদি আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের এ ঘুম আর কোন কালেই 'ভাঙ্গিবে না।' তাই বলিতেছি যে, একবার বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াও।

ঐ দেখ, রাজপুরুষেরা না জানি কি উদ্দেশ্যে সোনার বাঙ্গলাকে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। কোটিকণ্ঠের আর্ত্তনাদে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না। সে আর্ত্তনাদে সিমলা শৈলের প্রস্তর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। শ্বেতদ্বীপচুম্বিত মহাসাগরে একটিও তরঙ্গ উঠিল না! কিন্তু যেই তোমরা জীবনসংগ্রামের—শিল্পযুদ্ধের একটু ভয় দেখাইয়াছ, অমনই ভাল ভাবেই হউক, আর মন্দ ভাবেই হউক, সকলেই "তিষ্ঠ তিষ্ঠ' করিয়া উঠিয়াছেন। যাহারা, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে সোনার বাঙ্গালা কম্পিত করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকলকে জাগাইতেছিল, দেশের আশাস্থল সেই যুবকগণের—সেই ছাত্রবৃন্দের নির্য্যাতনের ব্যবস্থা প্রথমে সূচিত হইল। কারলাইল ও লায়নের সারকুলার জারি হইয়া ছাত্রগণের পীড়নের ব্যবস্থা হইল। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গের নূতন সায়েস্তা খাঁ দেশের নেতৃবর্গকে ডাকাইয়া ধমক দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা নানারূপ অভিনয় আরম্ভ করিল। রঙ্গপুরের স্পেশাল কনেষ্টবলীর—বরিশালের গুর্খা অভিযানের ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গেও দুই একটি ক্ষুদ্র অভিনয় আরম্ভ হইল। এসব অভিনয়ের কারণ বুঝিতে পারিয়াছ কি? ঐ জীবনসংগ্রামের— ঐ বিলাতী জিনিস—বিদেশী জিনিস 'বয়কটের' ভয়! যদিও রাজপুরুষগণ দেশে শান্তিরক্ষার প্রয়োজন বলিয়া এই সব অভিনয়ের কারণ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা কিন্তু বুঝি, কেবল এই জীবনসংগ্রামের ভয়ে তাঁহাদিগকে বিচলিত হইতে হইয়াছে। যদি বাস্তবিক বাঙ্গালী ও তাহাদের অনুসরণে সমস্ত ভারতবাসী আজ বিদেশ জাত দ্রব্য ত্যাগ ও স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যদি কেহ বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, ভাব দেখি সেই "ইউনাইটেড কিংডমের" কি অবস্থা হয়? তাহার কোটি কোটি টাকার দ্রব্য ভারতে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, এই স্রোত যদি বাস্তবিকই রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তথায় যে শ্রমজীবিগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইবে, সে কথা কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? তাহা হইলে এই জীবনসংগ্রামে

বঙ্গবাসী—ভারতবাসী যে জয়লাভ করিবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তাই যাহারা এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া পথ পরিষ্কার করিতেছিল, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করার চেষ্টা করা হইল। ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ রাজপুরুষ জানেন যে, বাঙ্গালীর এই আন্দোলন অভিনয় মাত্র, ইহার স্থায়িত্ব জলবুদ্বুদের ন্যায়! তথাপি প্রথম হইতেই বুদ্বুদ নষ্ট করাই ভাল। কারণ কি জানি যদি কোন বাতাসে তাহা দুই একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গে পরিণত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ দুই এক খানা বোঝাই জাহাজও ডুবিয়া যাইতে পারে। তাই সেই অভিনয়ের—সেই ছায়াবাজীর পট তুলিতেই ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন হইয়াছিল। এজন্য নব সায়েস্তা খাঁ যে অভিনয় করিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না।

তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্যস্থানে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি পর্য্যন্ত উচ্চারিত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই নববর্ষের শুভ প্রথম দিনে বরিশালে তাঁহার একটি অনুচর সমগ্র বঙ্গের প্রতিনিধিগণের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানে ইংরেজশাসনের দুর্ব্বলতার ও অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে দিন স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ যুবকবৃন্দ পুলিশের লাঠির আঘাতে যেরূপ রক্তাক্তকলেবর হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও উপস্থিত হয়; কারণ তাহারা "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনে মেরুদণ্ডস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বে-আইনি বিচারে জরিমানা দিলেন, শুনিয়া যেমন দারুণ মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়, আবার সেই পুলিশ সাহেবকে প্রাদেশিক সমিতির মণ্ডপে সকলে "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করাইয়াছেন শুনিয়া হর্ষেরও সঞ্চার হয়। সে দিন যে সকল যুবক মাতৃভূমির জন্য আপনাদের রক্তদান করিয়াছিল, এমন কি প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত ছিল, তাহাদের নাম এই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে যে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সোনার বাঙ্গলার সকল সন্তান তাহাদের ন্যায় রক্তদানে—প্রাণদানে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এ জীবনসংগ্রামে আমাদের জয় সুনিশ্চিত, এরূপ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের সেরূপ ভাগ্য হইবে কি? স্বদেশের জন্য আমাদের কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? স্বদেশের জন্য আমরা কয়জন রক্ত দান করিতে পারি? কয়জন প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইবার ইচ্ছা করি? "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রে কয়জন সিদ্ধিলাভে অগ্রসর হইয়াছি? সে যাহাই হউক এখন আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, এ জীবনসংগ্রামে জয়লাভের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। আমরা দেখাইয়াছি যে, আমাদের দেশের কার্পাস-শিল্প জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, একমাত্র এই কার্পাস-শিল্পের জন্য সোনার বাঙ্গলায় সোণা ফলিত, সকল জাতিই ইহার সহায়তা করিত এবং আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া লইত। আমরা যদি সেই কার্পাস-শিল্পের পুনঃপ্রবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আমরা এই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা আছে। যাঁহারা ইংরেজী অর্থনীতিতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে যে দ্রব্য অধিক পরিমাণে ও স্বল্পায়াসে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে, অবাধ বাণিজ্য প্রচলন পক্ষে তথায় তাহারই উন্নতির চেষ্টা করা আবশ্যক। এই নীতি দেশকাল বিবেচনায় সকল দেশে সকল দেশে সকল সময়ে উপযোগী কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কারণ জগতের অধিকাংশ রাজশক্তি রক্ষাশুল্কের ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশজাত সকল শিল্পের প্রচলনে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় তাহা না করিলে দেশের শ্রমজীবিগণের—শিল্পিগণের ভয়ানক অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়। তাই ইংলণ্ডেও চেম্বারলেন ও ব্যালফোর প্রমুখ মনীষিগণ ইহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। অর্থনীতির পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত যদি সকলেরই অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে আমরাও তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; কারণ কার্পাস-শিল্প আমরা যখন এককালে জগতের সমস্ত জাতিকে পরাজিত করিয়াছি, এমন কি আমরা, যে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতাম, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি স্থানে বাষ্পীয় কলের আয়োজন করিয়াও, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত না, তখন অর্থনীতিবিদ্‌গণের মত স্বীকার করিলেও আমরা কার্পাস শিল্পের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতের যে জয়যুক্ত হইব, এরূপ আশা করা যায়। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে গেলে, ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু ইহাতে পরিণামে যে আমরা জয়লাভ

করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণের যে বাষ্পীয় কল , কি তাঁতের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আলোচনা আর এস্থলে করিব না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাষ্পীয় কলের সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বটে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের শিল্পিকুলের পুনর্জীবন দানের জন্য তাঁতের বহুপ্রচলনও আবশ্যক। কেবল বাষ্পীয় কলে কতকগুলি ধনীর ধনবৃদ্ধি হইবে, সাধারণ শিল্পিগণের কোনই উপকার হইবে না। কিন্তু তাঁতের প্রচলন হইলে, শিল্পিকুল হইতে অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থেরও জীবিকার উপায় হইবে। প্রাচীনমতে সূতা কাটা প্রচলিত হইলে, অনেক গৃহস্থের অন্নসংস্থান হইবে। তবে সেই সকল যন্ত্রও বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ক্ষিপ্র ও বহুলপরিমাণে উৎপাদনক্ষম হওয়া আবশ্যক। অন্য দিকে কোন কোন বস্ত্রের জন্য বাষ্পীয় কলেরও প্রয়োজন আছে। তাহাতে শ্রমজীবিগণের উপকার সাধিত হইবে। এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে। এজন্য কার্পাসের চাষও করিতে হইবে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে কার্পাসের চাষ ছিল, চেষ্টা করিলে এখনও তাহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। তাহার পরে আমাদের দেশ হইতে বহুল পরিমাণে চিনির রপ্তানী হইত। এদেশে ইক্ষু ও খর্জ্জুর বৃক্ষ অপরিমিত রূপে জন্মিয়া থাকে। আমরা যদি এই উভয়বিধ চিনি কল ও দেশী যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি এবং সকলেই তাহা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে ইহার দ্বারাও আমাদের অনেক উপকার সাধিত হইবে। বিদেশী চিনির মূল্য কিছু অল্প বটে, কিন্তু উহা হিন্দু মুসলমানের অস্পৃশ্য। উহার পরিষ্কারের উপায় উভয় জাতির ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং কদাচ তাহা স্পর্শ করা উচিত নহে। তাহার পর লবণ—আমাদের রাজপুরুষদের সহিত তাহার সম্বন্ধ অধিক, সুতরাং লবণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু লিভারপুল প্রভৃতি স্থানের লবণ দূষিত হইয়া আসায় উহা হিন্দু মুসলমানের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে আর অনেক শিল্প আছে। যদি আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, স্বদেশের দ্রব্য পাইলে কদাচ বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না। তাহা হইলে আমাদের দেশের সকল শিল্পের অনুষ্ঠান পুনর্ব্বার আবদ্ধ হইতে পারে, এবং আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই আপনাদের জীবিকার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে, কেহই কাহারও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না; তাই বলিতেছি, হিন্দু মুসলমান সকলে একবার ভাই ভাই মিলিয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সময় ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে, আপনাদের জীবিকার উপায় ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে সকলে প্রস্তুত না হইলে, তোমাদের ধ্বংস দ্রুতগতিতে আসিবে। জগতের সকল জাতি এই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক বার তোমরাও প্রাণপণে চেষ্টা কর।

ঐ শুন, রাজপুরুষগণও আমাদের জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিবার আশা দিতেছেন। অন্ততঃ তাঁহারা মুখে ইহাই বলিতেছেন। যদিও ইংরেজবণিকের সহিত সংগ্রাম ঘোরতর আকার ধারণ করিলে, তাঁহারা আমাদিগের কতদূর সহায়তা করিবেন তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না, তথাপি তাঁহাদের ঘোষণাকে আমরা দৈববাণী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। লাট কর্জ্জন হইতে নব ছোট লাট ফুলার পর্য্যন্ত স্বদেশী শিল্পের উন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও আমাদের এক মহাসুযোগ। তাই বলিতেছি, এ সুযোগও আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। রাজপুরুষদের আশ্বাসে আমাদের ভীতি, সন্দেহ, সমস্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কেবল আশ্বাস দেন নাই, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং এই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত রাজপুরুষগণের আশ্বাসকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ রাজশক্তি সহায় থাকিলে, নির্ভয়ে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণ কতদিন আশ্বাস দিতে পারিবেন, তাহাও চিন্তনীয় বটে। সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিলে আবার রেগুলেশন লাঠি বা সঙ্গীন যে বাহির হইবে না, একথা কে বলিতে পারে?.

সহস্র লাঠি, সহস্র সঙ্গীন বাহির হউক, বন্দুকের শব্দে সমস্ত বাঙ্গলা প্রতিধ্বনিত হউক, কিন্তু আমাদিগকে আর পিছাইলে চলিবে না। লাঠি, সঙ্গীন, বন্দুকের আঘাত সহ্য করিয়াও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আর বৃথা কাল কাটাইলে চলিবে না। সময় থাকিতে একবার সকলে মিলিয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সোনার বাঙ্গলাকে জাগাইয়া তুল। আবার বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে বস্ত্রবয়নের অনুষ্ঠান হউক। তন্তুবায়কুলের মুখে হাসি দেখা দিক, প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে সূত্র প্রস্তুত ইহতে থাকুক। পুণ্যবতী মহিলাগণ আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া লউন। তাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তিতে আবার গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনিত হউক। পঙ্কিল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হউক। ম্যালেরিয়া, মহামারী দূরে পলাইয়া যাউক। অতিথি অভ্যাগত দুইমুষ্টি অন্ন পাউক। গ্রামে গ্রামে চিনির কারখানা স্থাপিত হউক। রাশি রাশি চিনি জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া যাউক। অন্যান্য শিল্পেরও অনুষ্ঠান হউক। সকলে আপন আপন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে যত্নশীল হও। পরস্পর পরস্পরের বৃত্তি লইয়া কাটাকাটি মারামারি করিও না। সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় আচার ব্যবহার পরিহার করিয়া স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান কর। বিলাসিতা পরিত্যাগ কর। সংযম অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, মহিলাদিগকেও তাহার শিক্ষা দেও। বালকবালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস করিতে শিখাও। তাহা হইলে দেখিবে সোনার বাঙ্গলা জাগিয়া উঠিবে, আবার তাঁহার সোনার চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। এক্ষণে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কার্য্যস্রোতে বঙ্গভূমিকে ভাসাইতে হইবে। আমরা জগতের কোন কার্য্যই করি না। কিন্তু ঐ দেখ মা আমাদের অজস্র কাজের দ্বারা কত কল্যাণবর্ষণ করিতেছেন! তাই বলিতেছি একবার মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া বল দেখি—

" তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণি লক্ষ্মি, হে বঙ্গজননি,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্য মুখে।
এ বিশ্ব সমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা! তুমি শুধু মা গো!
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশি দিন জাগো
নিত্যকর্ম্মে রত শুধু অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি'
রৌদ্র নিবারিছ—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক্ হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে!
শরত মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়

ধৈর্য্য শান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করে বিকিরণ!
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল!"

কবির সহিত তোমরাও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া আবার প্রার্থনা করিয়া বল—

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।"

এই নিত্যকল্যাণময়ী মাকে জাগাইবার জন্য তোমরা কি কিছুই করিবে না? মাকে ভুলিয়া আর কত দিন থাকিবে? এখন হইতে প্রতিজ্ঞা কর যে, এ জীবন মাতৃসেবায় উৎসর্গ করিবে, সোনার বাঙ্গলার সোনার চিত্র ফিরাইয়া আনিবে, সব ভুলিয়া মাকে ভালবাসিতে শিখিবে। মায়ের ধূলা স্বর্ণরেণু বলিয়া অঙ্গে মাখিবে; মায়ের জল মন্দাকিনী-বারি বলিয়া মাথায় লইবে; মার যা কিছু আছে সমস্তই পুণ্যময় বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে, আশা করা যায় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মস্তকে বিধাতার কল্যাণবর্ষণ হইবে। তাই বলিতেছি একবার প্রাণ ভরিয়া গাও—

'বাঙ্‌লার মাটী বাঙ্‌লার জল
বাঙ্‌লার বায়ু বাঙ্‌লার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্।'

৭ই আগষ্ট

মায়া-মোহের ঘোরে ডুবিয়াছিলাম— মহা-কাল-নিদ্রায় সুষুপ্তিতে মজিয়া আপন-পর ভুলিয়াছিলাম— দেহ ঢলিয়া ঢলিয়া, চক্ষু মুদিয়া মুদিয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে কে যেন মধুর বংশী-ধ্বনিতে জাগাইয়া দিল, 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'—কি এক মধুর বাণী! দিশাহারা হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বুঝিলাম—উহা ৭ই আগষ্টের সম্মোহন বাণী, —উহা মৃত জাতির জাগরণের অমোঘ প্রলেপন। ঐ দিন কি মধুর কথা শুনিয়াছিলাম!! ৭ই আগষ্ট মহা সংযমের দিন—স্থির, ধীর ও গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের দিন। এমন দিন কি আর আছে?

বাণী শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাও যেন আজ আবার স্বপ্নের ন্যায় হইয়া গিয়াছে! সময়ের উত্থান এবং সময়ের পতন, নিভৃতে বসিয়া গণিতেছেন, নিয়তি-নেমির ত্রিকালজ্ঞ এক মহাপুরুষ,—দুর্জ্জয় যাঁহার বিধান, অতুল যাঁহার শক্তি। বানরের হস্তে খন্তা দিবার ক্রটী বুঝিয়া, বুঝিবা, এখন তিনি নিভৃতে কি এক নবপঞ্জিকার অভ্যুদয় গণিতেছেন;— এদিকে মোহের স্বপ্নে আবার ভারত সুষুপ্তিতে ডুবিতেছে!

জন্ম মৃত্যু, উত্থান পতন—এ সকল কি ব্যাপার? কেন এ জগতে আসিলাম, কেন অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছি, কেহ সে প্রহেলিকার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না। মৃত্যুর পর কোথায় আবার প্রয়াণ করিব, কে জানে? বিবেকানন্দ, রমাকান্ত, আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, উপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ, শিশিরকুমার দেশের উন্নতির কথা ভুলিয়া আজ কোথায়? তাঁহারা পুণ্যদেহ ধারণ করিয়া এই পাপ-ধরায় আসিলেন যদি, মৃত জাতি জাগিতে না জাগিতে প্রয়াণ করিলেন কেন? এ মহা সমস্যা কে কে পূরণ করিবে? অবস্থা-স্মরণে দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু তবুও আমরা ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করি। মহা সংযমের দিনে—এবারকার ৭ই আগষ্টে যাত্রা বা স্বদেশীপূত (?) বায়স্কোপ তামাসা প্রভৃতিতে কেবল তাণ্ডব নৃত্যেরই পরিচয় পাই! এবারকার ৭ই আগষ্ট কেন সংযম- পূত অশ্রুপাতের জন্য আসিল না? শুধু যদি নিভৃতে বসিয়া এই দিনে সকলে কাঁদিতে পারিত, তবু প্রাণের জ্বালা অনেকটা কমিয়া যাইত! কিন্তু তাহা হইল কই? "রাঙ্গা মা-ই যদি বিসর্জ্জিত হইলেন ঢাকি রাখিয়া ফল কি?"—গিয়াছে ত সব যাক্—জাগিয়া থাক্ কেবল ৭ই আগষ্টের স্মৃতি—সংযম, ধৃতি, পুণ্যপূত কৃতি, নিষ্ঠা এবং অনাবিল প্রতিজ্ঞা;—উহা স্মরণ করিয়া মৃত জাতির জন্য আমরা কেবল অশ্রুপাত করি! অশ্রুপাতে বাধা দিতে পারে এমন কেহ ধরায় আছে কি?

আজ অনেকেই পর-পদ-লেহন বিপণিতে বিক্রীত—কেহ বা টাকার লোভে, কেহ বা উপাধি বা সম্মানের খাতিরে, কেহ বা ভয় ভ্রূকুটিতে,—অনেকেই ত্রি-তন্ত্রীতে (?) আজ বিক্রীত? এসকল কথা সকলেই জানেন। অনশনের ক্লেশ বড় তীব্র;—সহ্য করা সহজ নয়;—উপাধি বা সম্মান-সম্মোহন বড় তীক্ষ্ণ, উপেক্ষা করা কঠিন। আর ভয়? তাহার ক্ষমতা ত চিরকালই অপ্রতিদ্বন্দ্বী! "রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?"— এরূপ তেজের কথা সেকালে প্রমীলা প্রভৃতি ভারতমহিলাগণ বলিতে পারিতেন, আর এযুগে বলিতে পারেন, পুণ্যশ্লোক তিলক, লিয়াকত হোসেন এবং অম্বিকাচরণ। আমরা সময়ে সময়ে চিন্তা করি—অনেকেই বিক্রীত হইলেন যদি তবে এই মহাপুরুষেরা নির্ভয়ের কথা প্রচার করিতে এদেশে রহিলেন কেন? ইংলণ্ড বা পঁদীচারিতে স্থান না থাকিলেও, পরলোকে ত স্থানের অভাব ছিল না! তবে তাঁহারা কেন যন্ত্রণা ভোগ করিতে রহিলেন?

কিন্তু তোমরা বল, ৭ই আগষ্টের উৎসবের জমাট ভাব এবার স্বদেশীমেলা রক্ষা করিয়াছে, ইহা কি সুখের সংবাদ নয়? যখন কিছু করার আর উপায় নেই, তখন ইহা কি ভাল নয়? আমরা বলি—না, এই মহাসংযমের দিনে "স্বদেশীর" যখন জয় হয় নাই, তখন এরূপ ছেলেখেলা ভাল নয়। আমরা বলি, কোটী কোটী লোক এই পবিত্র দিনে ঘরে বসিয়া প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কাঁদিলে ভাল হইত। উহা ত স্বদেশী মেলা

নয়, বিদেশীর ভেল্কি মাত্র। স্বদেশ-প্রেমিক, অমিততেজা কৃষ্ণকুমারের নাম সদাই আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি, কিন্তু এবার তাঁহার কাজের পোষকতা করিতে পারিতেছি না। বিদেশী উপকরণে প্রস্তুত তৈল এবং এসেন্স প্রভৃতিকে কিরূপে স্বদেশী মেলায় স্থান দেওয়া হইল, বুঝি না। মোহন-মেলা দেখিয়া কোন বন্ধুকে, এক সময়ে, জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলাম, ঐ মেলার অর্থ "তৈল ও এসেন্স মাখ, চাটনি খাও ও ছবি দেখ।" বিডন স্কোয়ারে মহাসমিতির সেবারকার মেলা দেখিয়া আর একদিন বলিয়াছিলাম ঐ মেলার অর্থ—"সাবান, তৈল ও এসেন্স মাখ, চাট্‌নি খাও, কাপড় পর এবং ছবি দেখ।" এবারকার মেলারও সার চুম্বক এইরূপই, তবে সিগারেট এবং চায়ের সম্মোহনমন্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। এবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চেষ্টায় মেলার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে। জাতীয় বিদ্যালয় এদেশের অন্ধের যষ্টী, নির্ব্বাপিত আশার একটী ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ মাত্র, কিন্তু তাহাও অবাধ উদাসীনতায়, 'বিদেশী'র প্ররোচনায় যায় যায় হইয়াছে! যদিও বৃদ্ধ আত্মত্যাগী তারকনাথ আজও ইহার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু ঢালিতেছেন বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, জানি না। কেননা, ওপথে আজ কাল বড় কেহ হাঁটিতে চাহেন না, কি জানি কেন, অনেকের ছেলেদিগকে ঐ কলেজ হইতে তুলিয়া আনিতেছেন, অনেকে সাহায্য বন্ধ করিতেছেন;—ঐ নাম আর না শুনিতে হয়, তাহারও নাকি আয়োজন করিতেছেন!! কেননা জাতীয় শব্দটাই যে আপত্তিজনক! নির্ব্বাপিত আশার স্ফুলিঙ্গ ছিল, —ইণ্ডিয়ান-ষ্টোরস, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক, তাহেরপুরের চিনির কল, কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল ইত্যাদি —ইত্যাদি—ইত্যাদি, কিন্তু সে সকলেও কতরূপ স্বার্থ-জল নিক্ষিপ্ত হইতেছে, বিশেষজ্ঞগণ সকলেই তাহা জ্ঞাত আছেন। "স্বদেশী"র জয় ঘোষণার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই—বরং আমাদের অপদার্থতা ঘোষণার সময় আসিয়াছে। উপরে বিবৃত ত্রিবিধ স্বার্থের কোন স্বার্থ কোথায় কি কাজ করিতেছে, আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়া হতজ্ঞান হইতেছি, কাহারও পরিণাম আশাপূর্ণ নয়। ক্রমে ক্রমে বাজার বিদেশীতে পূর্ণগ্রাস করিয়া ফেলিতেছে! এইত দেশের অবস্থা, এই অবস্থা স্মরণে ক্রন্দন করা উচিত, না নৃত্য করা কর্ত্তব্য? এই দুঃখের দিনে, ৭ই আগষ্টের মেলায় আমাদের ব্যাপার যাত্রা হইল কেন, কিছুতেই বুঝিতেছি না? বাদ্য বাজিল কেন, তাহাও বুঝিতেছি না! আর চা সিগারেট চলিল কেন, জানি না! আর বায়স্কোপ কোন সূত্রে স্বদেশী হইল, বুঝিতেছি না। শিবাজী-উৎসবের পুতুলনাচ (?) বাদ পড়িল কেন, তাহাও জানি না। তৈল এসেন্স বড় বড় লোকের মার্কা লইয়া স্বদেশী বাজারে চলিতেছে, তাহা জ্ঞাত আছি। অনেক স্বদেশী পাণ্ডার পত্রিকায় বিদেশী কাগজ ও কালী চলিতেছে, তাহাও জানি। রসনার খাতিরে এদেশের চিনির ব্যবসা মাটী হইতেছে, তাহাও ভুলি নাই! কিন্তু ৭ই আগষ্ট যে মহা সংযমের পবিত্র দিন, এদিনের পবিত্রতা রক্ষিত হইল না কেন? হায়, গুরুদশাগ্রস্ত মদ্যপের আতপ-তণ্ডুলের মদ্য-প্রত্যাশার ন্যায় কেন গুরুদশার সংযমের পবিত্রতা রক্ষিত হইল না?

খাটী স্বদেশী ভিন্ন দেশ-রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টও একথা বুঝেন এবং "স্বদেশী" প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা এখন এই মহাগুরু "স্বদেশী"র মহামৃত্যুর কথা শুনিলে হাস্য ও নৃত্য করি! আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে আবার "বিদেশীর" প্রাধান্য সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিতেছে!—৭ই আগষ্ট মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে!! আমরা এমনই হতভাগ্য যে, এই দিনও পুণ্যভূমির দুর্গতি স্মরণে এক বিন্দু অশ্রু ফেলিতে পারিলাম না! "স্বদেশীর" মৃত্যুতে আমাদের যে মহাগুরু নিপাতের গুরুদশা উপস্থিত,—তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না এবং কি জন্য জানি না; আমরা এই গুরুদশাও সংযম-পূত পবিত্রভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। মহা শোকের দিনে গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ সাজে কি?

বড় বড় লোকের বড় বড় কাজের বিরুদ্ধে কথা বলিলে সকলের বিরক্তি উৎপন্ন হয়; কিন্তু কোন সুফল ফলে না। পরন্তু যাঁহারা "ভণ্ড স্বদেশী", তাঁহাদের আদরই এদেশে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছি। সুতরাং এমন নির্ব্বাক-নীতিই ভাল। হায়, আমরা যদি খাটী স্বদেশী হইতাম—তবে নিজেরা স্বদেশীর বিরুদ্ধে চলিতে পারিতাম না, আত্মীয় সকলকেও চলিতে দিতাম না,—কিন্তু দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়, "খাটী স্বদেশী" আজ কাল আর বড় মিলে না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র দেশ "বিদেশী" গ্রাস

করিয়া ফেলিয়াছে। মহাগুরুর মহাপতন হইয়াছে। এহেন দিনে নৃত্য আস্ফালন কিসের? এখন ঘরে ঘরে নিভৃতে বসিয়া শুধু ক্রন্দন করার সময় উপস্থিত!—

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধ করে,
তুই কি জানিবি তাহা, অন্যে কেহ জানে না,
তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা?"

কোন শক্তি নাই, জানি; কিন্তু খাটী হওয়ার শক্তিও ছিল নাকি! —পুণ্যের জোরে প্রতারণা না করিবার শক্তি ছিল নাকি!—সংযমের বলে ইন্দ্রিয় ও রিপু জয় করার ক্ষমতা ছিল নাকি?—স্বদেশের সেবা করিবার সময় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবার শক্তি ছিল নাকি? হায় যে স্বার্থ, তুই শেষে কাল হইলি? "কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা" তুই-ই শেষে সর্ব্বনাশ সাধন করিলি! হা ঈশ্বর, শিব গড়িতে বানর হইয়া গেল যে!!

বলা এবং লেখা, সবই বৃথা, ক্রন্দনও বুঝিবা বৃথা!—এখন শ্রেয়ঃ কেবল মৃত্যুর পথ! ৭ই আগষ্ট মহাযজ্ঞের হোতা আনন্দমোহন প্রভৃতি মহারথী দেশের মহাদুঃখ স্মরণ করিয়া যে পথে গিয়াছেন, আমরা এমন সেই পথে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি; এই মহা গুরুদশার পরিণাম—অবনতি, পতন,—শেষে মৃত্যু! উহাই বুঝি বা নিরুপায়ের একমাত্র উপায়। হতবুদ্ধি আমরা, আর বলিব কি, বিধাতার বিধানই জয়যুক্ত হউক।

(সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৮)

সংকলিত রচনা-পরিচিতি

সংকলিত রচনা-পরিচিতি

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এমনই একটি সমাজস্পর্শী আলোড়ন ছিল যা কেবলমাত্র ইতিহাসেরই বিষয়ীভূত হয়ে থাকেনি, সমসাময়িক সাহিত্যের প্রায় সব শাখাকেই স্পর্শ করেছিল। মননশীল প্রবন্ধ এই আন্দোলনের সমকালীন উচ্ছ্বাস ও আবেগের পাশে পাশে চিন্তাবিদেরা ভাবছিলেন এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়েও। কেউ কেউ একে ভেবেছেন 'হুজুগ', কেউ এর মধ্যে দেখেছেন পরবর্তী স্বাধীনতান্দোলনের পূর্বাভাস, কেউ ভেবেছেন এতে যে দেশপ্রেম উদ্বেলিত হয়েছিল তার ফল বিষম হয়ে উঠবে। এই সব চিন্তার ফসল আমরা বিশেষ করে লক্ষ করেছি তৎকালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই। প্রবাসী, ভারতী, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাগুলি ১৯০৫-এর আগে থেকেই আন্দোলিত হচ্ছিল, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ বা ১৩১২ বঙ্গাব্দে তা প্রবল আলোড়নের আকার প্রায় এবং এর প্রবাহ পরবর্তী সময়ের তটস্পর্শ করেছে বারংবার।

আমরা এখানে একেবারে ঠিক ১৯০৫-কে ঘিরে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল — প্রধানত সেগুলিকেই সঞ্চয়যোগ্য ভেবেছি। এতে আন্দোলনের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া — দুটিকেই পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন। সে সময়ের পত্র-পত্রিকা ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ছে গ্রন্থাগারগুলি থেকে তাদের প্রতিলিপি পাওয়া দুষ্কর এখন। আমরা বহুকষ্টে এগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এবং ভরসা করি ইতিহাসের এই দলিলগুলি এখন শুধু এখনকার পাঠকদের করায়ত্ত হল না, আগামীকালের কাছেও এগুলি প্রাপ্তব্য হয়ে রইল। সব পত্রিকার সব প্রবন্ধ সংকলন করিনি — করা উচিতও নয়, সম্ভবও নয়। উচিত নয় একারণেই — তাতে বিভ্রান্তি বাড়বে এবং ভারহীন রচনাও অকারণ গুরুত্ব পাবে। সম্ভবও নয় এ কারণেই যে জীর্ণ অনেক সাময়িকপত্র ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তবুও প্রধান সব রচনাই প্রায় সংগৃহীত হতে পেরেছে — পাঠককে এমন ভরসা দেবার মতো ভরসা আমাদের রয়েছে।

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় তৎকালীন এই আন্দোলন মেয়েদের মধ্যে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল তার এক অভিনব ব্রতপালন এতে উচ্চারিত। 'স্বদেশ' শব্দটির মূল দ্যোতনা যে যেভাবে অনুভব করেছিলেন — তা নিয়েও রচিত প্রবন্ধাবলির সিংহভাগ এখানে সংকলিত। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের যে আহ্বান 'সঞ্জীবনী'তেই একদা উচ্চারিত হয়েছিল, সেই পত্রিকাতেই তা পরে তিরস্কৃত হয়। দেশীয় বস্তুর প্রতি প্রীতির আত্যন্তিকতাও যেমন সমালোচিত হয়েছে কয়েকটি রচনায়, তেমনি বিদেশি দ্রব্য বর্জনের যে 'হুজুগ' তার যুক্তিযুক্ততা নিয়েও প্রশ্ন জেগেছিল এবং তা যে সঙ্গতই ছিল — এতকাল পরে তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বাঙালি যে শুধু আবেগসর্বস্ব জাতি নয়, মননশীল জাতিও — তা জানতে পেরে, ভাবতে পেরে — একশো বছর পরেও আমাদের গর্ব হয়। এই সংকলনে বাঙালির জাতিগত অবস্থানের একটা রেখাচিত্রও সংকলিত প্রবন্ধ নিচয় থেকে পেতে পারি।

বিষয়টি আমাদের আরও ভাবায় যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ — যিনি সাহিত্য ও সমাজে এই 'আবেগ'-এর প্রথম সার্থক 'রূপকার', 'যাঁর বাংলার মাটি বাংলার জল' এখনও সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছে স্বদেশপ্রেমিক বাঙালির ভাবজমিনে; যাঁর 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের মর্যাদামণ্ডিত হয়ে তাঁর তৎকালীন ভাবনাকে অনাগতকালের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে — তাঁর লেখা প্রবন্ধরাজি কিন্তু ১৩১২ বঙ্গাব্দকে অতিক্রম করে এই আন্দোলনকে পরবর্তীকালে প্রসারিত করে দেয়নি। শুধু প্রবন্ধাদি কেন, কবিতা বা গানের ক্ষেত্রেও এই 'সীমাবদ্ধতা' বিশেষ করে লক্ষণীয়। একথা বোধকরি

অস্বীকার করা যাবে না যে তাৎক্ষণিক আবেগ তাঁকে প্লাবিত করলেও এর দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন। গিরিডিতে বসেই তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মুখর হয়ে চারণকবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এ সময়ের স্বদেশি গানগুলি বাঙালির স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার গাথা হয়ে উঠেছে। এগুলি রচনামাত্রই তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন — যদিও মাঝখানে একবার কলকাতা আসেন। কবি গিরিডিতে থাকলেও সুর-সহ গানগুলি কলকাতার গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে চলেছিল। এই গানগুলি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, পাঠকেরা অবশ্য তাদের অনেকগুলির সঙ্গে পরিচিত আছেন।

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা সবগুলি গ্রহণ করিনি। 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ', 'শোক-চিহ্ন', 'করতালি', 'পার্টিশনের শিক্ষা', 'উদ্বোধন' প্রভৃতি প্রবন্ধ আমরা গ্রহণ না করে তাঁর বক্তব্য জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে যেগুলিতে, সেই প্রবন্ধগুলি গ্রহণ করেছি। ততদিনে কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বিতীয় তথা জঙ্গি পর্যায় শুরু হয়ে গেছিল। স্বদেশি আন্দোলনে মেয়েদের ইতিকর্তব্য নির্দেশ করে তিনি 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধটি লেখেন জনৈকা মহিলার জবানীতে। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধের পুনরুল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধে 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবকে তিনি ক্ষতির দিক থেকে না দেখে লাভের দিক থেকে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। বয়কট আন্দোলনকেও তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন। 'বঙ্গবিভাগ'-এর মতো এটিতেও ঐক্য এবং আত্মশক্তির উপর কবি জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমি যেটি বলতে চাইছি তা হল্ কবি দ্রুত এই সাময়িক আবেগমুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর বড়ো প্রমাণ, বেশ কিছুকাল পরে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস রচনা। সন্দীপের চরিত্র অঙ্কন নিয়ে তাঁকে কম কথা শুনতে হয়নি। সে যদি দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে থাকে -- এই ভেবে নিন্দা-সমালোচনার পাহাড় জমে উঠেছিল। এর সত্যাসত্য নির্ণয়ের স্থান এটি নয়, কিন্তু এমন চরিত্র রচনার পিছনে তথাকথিত দেশপ্রেমিকের অন্তঃসারশূন্যতাকে রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। চাননিও। সেকারণেই আমরা প্রকাশকের পরামর্শ মেনে নিয়ে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি এই সংকলনের মধ্যে গ্রহণ করে সাহিত্যে এই আন্দোলনের সর্বশাখাশ্রয়ী চরিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছি। ঘরে-বাইরে উপন্যাসের পশ্চাৎপট যে ১৯০৫-এর আন্দোলন সে-বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। যে-সময়ে 'সবুজপত্রে' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল — তার ঠিক আগে আগেই 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র একটি সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন — 'একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না।' স্বীকার করেছেন, 'ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা হচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে'। কবুল করেছেন 'আমিও দেশকে ভালোবাসি'। তবে সাবধান করে দিয়েছেন — 'ইহা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নহে।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও কয়েকটি সমকালে-রচিত প্রবন্ধ আমরা সংকলন করে দিলাম। এগুলিতে সমকালীন মনোভাব নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে আছে। প্রবল দেশপ্রেমে উদ্বেলিত জনমানসকে কিছু স্থিতধী মানুষ নিরপেক্ষভাবে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন এ সব রচনায়। 'বন্দেমাতরম' শব্দবন্ধ শুধু আবেগের প্রতীক ছিল না — ছিল একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে দেশবোধের উজ্জীবন এবং সেই সঙ্গে সংহতির একটা বন্ধন। কিন্তু স্বদেশির নামে বিলিতি-ধ্বংসের সঙ্গে যে দেশীয় অর্থনীতি — উৎপাদন ও জোগান — প্রয়োজন এবং নির্মাণের মধ্যে যে ফাঁক ও ফাঁকি — তা কিছু চিন্তাবিদ্ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সংকলিত প্রবন্ধনিচয়ে সেই উদ্বেলিত দেশপ্রেম এবং তার চরিত্র-নির্ধারণে পাঠকের কাছে সত্যাসত্যকে তুলে ধরতে পারবে। নিখিলনাথ রায়ের রচনাটি তাঁর 'সোনার বাংলা' (১৯০৯) গ্রন্থের একটি অংশ। এটির উৎসর্গপত্রে লেখক লিখেছিলেন — 'সোনার বাংলার এই শ্মশান-আগারে/উড়াইয়া চিতা-ভস্ম ক্ষুদ্রশক্তিভরে,/জ্বালে

আশা-দীপ যারা নিবিড় আঁধারে,/সমর্পিনু গ্রন্থ সেই ছাত্রগণ করে।' — বস্তুত এই ছাত্ররাই ছিলেন সে সময়ের দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক।

খুব লক্ষ করার বিষয়, গঙ্গাচরণ নাগের 'রাখীকঙ্কণ' প্রভৃতি দু-একটি অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস ছাড়া তেমন কোনও উপন্যাস যেমন বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে পটভূমি করে লিখিত হয়নি, তেমনি 'ছোটোগল্প'ও ভূরি পরিমাণে লেখা হয়নি। সে সময়ে এইচ বোসের বিখ্যাত 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বার্ষিক খণ্ডগুলি প্রচারিত হয়ে চলেছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শরৎকালে যে খণ্ডটি প্রকাশিত হয় — তারমধ্যে সে সময়ের কয়েকজন লেখক-লেখিকা এই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তাঁদের গল্পের পটভূমি হিসেবে রচনা করেছিলেন। এমনটি আমরা 'প্রবাসী' পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র দেখিনি। মেয়েরাও জাগছিলেন — তার সাক্ষ্য এই গল্পগুলি দেবে। অন্য লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একাই তিনটি গল্প লিখেছিলেন — এটাও একটা উদাহরণ হয়ে রইবে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারও শতবর্ষ পরে দেশপ্রেমিক পাঠকের প্রণতি পাবেন — এই ভরসা আমার আছেই।

বাংলা নাটকের ইতিহাস এই আন্দোলনের উল্লেখসহ বেশ কয়েকটি নাটকের নাম আমরা পাই। কিন্তু পুরোপুরি এই বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক আমরা কমই পেয়েছি। সোজাসুজি বিষয়টি নিয়ে দুজন নাটক লিখেছিলেন — অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) — 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা Partition of Bengal' (১৩১২) এবং কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় — 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ' (১৩১৪)। আমরা ঠিক ১৯০৫-এই রচিত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাটকটি হুবহু এখানে উদ্ধার করে দিলাম। জীর্ণ এই নাটিকাটি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে সৌভাগ্যক্রমে। অশেষ ক্লেশস্বীকার করে এটি আমরা যথাযথভাবে নাটকটিকে একালের পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে যথার্থই তৃপ্তি অনুভব করছি। এই নাটকেও ছদ্মদেশপ্রেমিক এবং সত্য-স্বাদেশিকের চরিত্র স্বল্প পরিসরে হলেও অনিবার্যভাবে ফুটে উঠে যুগচিত্রটিকে সত্যাকারে তুলে ধরতে পেরেছে।

প্রকৃতপক্ষে সেকালের বাঙালি সমকালীন কবিতা ও গানে যতটা জেগেছিল — ততটা সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে অবশ্যই নয়। ভূমিকায় আমরা তার সবিশেষ উল্লেখ করে এসেছি। সংকলিত গান ও কবিতাগুলি তারই নজির হিসেবে গৃহীত হবে। গান ও কবিতা আলাদাভাবে সংকলনের কারণে একই রচয়িতা অনেক সময় দু'টি জায়গায় স্থান পেয়ে গেছেন। একটি গীতি সংকলনের কথা ভূমিকাতে বলা হয়নি, সেটি এই অবকাশে বলে নিই। এটির আখ্যাপত্র থেকেই এর মূল্য অনুধাবিত হবে : 'জাতীয়/রাখী-সঙ্গীত (৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কালিন গীত)/১৪/৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট/নব্যভারত সমিতি হইতে/ প্রকাশিত।/কলিকাতা,/ ১০৮ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট "পেট্রিয়ট প্রেসে"/শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল দ্বারা/ মুদ্রিত।/' — এই নব্যভারত সমিতির কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ বসু। সম্ভবতই তিনি এর প্রকাশক ছিলেন। প্রকাশক 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন —

১৩১২ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকালীন বঙ্গবাসী, ইংরাজ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে কৃপালাভে বঞ্চিত হইলেন যে, গভীর মর্মবেদনায় কাতর হইয়াছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বিপন্ন শোক-সন্তপ্ত বঙ্গভ্রাতাগণের কাতর মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ দিনে শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃস্টান ভ্রাতাগণ পরস্পরে হস্তে ভ্রাতৃসম্মিলন সূচক রাখী-বন্ধন করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিতে যে সকল জাতীয় সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশভক্ত ভ্রাতৃগণের (Sic) নিত্য আলোচনা করিবার নিমিত্ত এই স্মরণীয় গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিলাম। এবং এই পুস্তিকার মূল্যের স্বরূপ যে এক আনা লওয়া হইবে, তাহা অবৈতনিক সারস্বত বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে।

প্রকাশক

এই গীতসংগ্রহ গ্রন্থটির সূচনা হয়েছে 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে। এতে যে-সব গান আছে — তা সর্বত্র সংকলিতও হয়নি। ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, জগৎমোহন রায়চৌধুরি প্রভৃতি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ', 'আমার সোনার বাংলা' প্রমুখ গান এখানে মুদ্রিত হয়েছে।' ভাগ্যহীন ভারতসন্তান অথবা স্বদেশসেবক রচিত (আড়ালে কে লিখেছেন জানি না) গানও রয়েছে। একটি দুর্লভ 'ব্রজবুলি' ভাষায় লেখা গান আমরা নমুনা হিসাবে সংকলন করেছি। তবে লক্ষ করেছি বেশ কিছু গানে ইংরেজকে বারবার 'রাজা' বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে, অথবা কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে। এগুলিতে তৎকালীন বাঙালির মনোভাব ধরা পড়ে গেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বানান মূলানাযায়ী রাখা হয়েছে নথির প্রামাণিকতার কারণে।

বারিদবরণ ঘোষ



বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে বড়াগ্রামে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন বারিদবরণ ঘোষের জন্ম। বড়া, বোলপুর হাইস্কুল, বোলপুর কলেজ, বর্ধমান রাজকলেজে পড়াশুনোর পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের বৃত্তি পেয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণান্তে পি এইচ ডি উপাধি লাভ। শ্রীগোপাল ব্যানার্জি মহাবিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। নিত্যানন্দ বিষয়ে গবেষণার জন্য ডি লিট উপাধি অর্জন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের 'সিনিয়র ফেলোশিপ ফর আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট'-বৃত্তি পেয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা বিষয়ে গবেষণা। তিরিশটি বইয়ের লেখক অধ্যাপক ঘোষ প্রায় সত্তরটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশ, আনন্দবাজার, কথাসাহিত্য, কলেজ স্ট্রিট সহ বহু পত্রিকার লেখক।